সৈয়্যদা ফাত্তেমা বতুল বিনতে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম

PDF By Mohammad Albi Reza

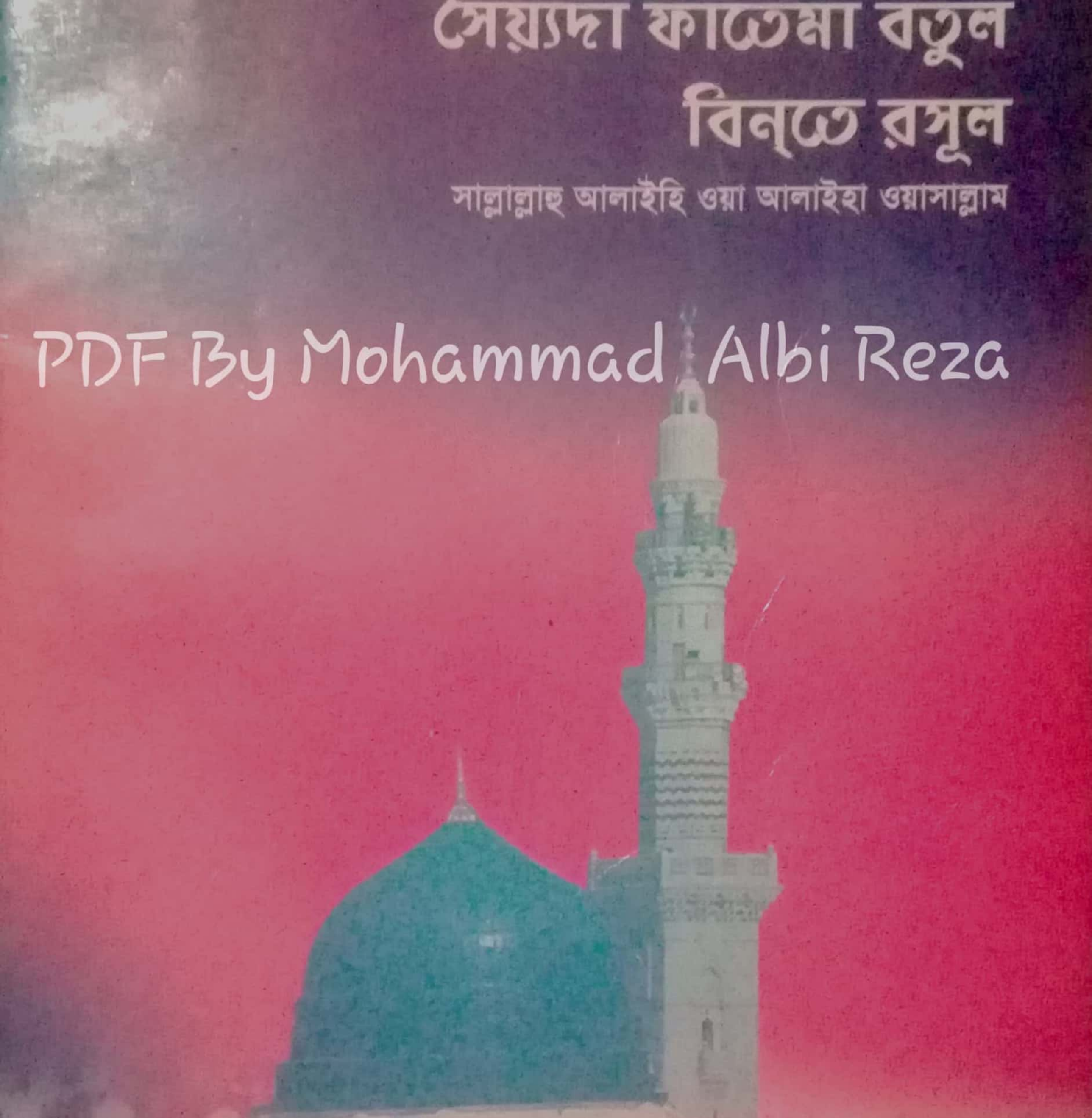

আল্লামা মুফ্‌তী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম

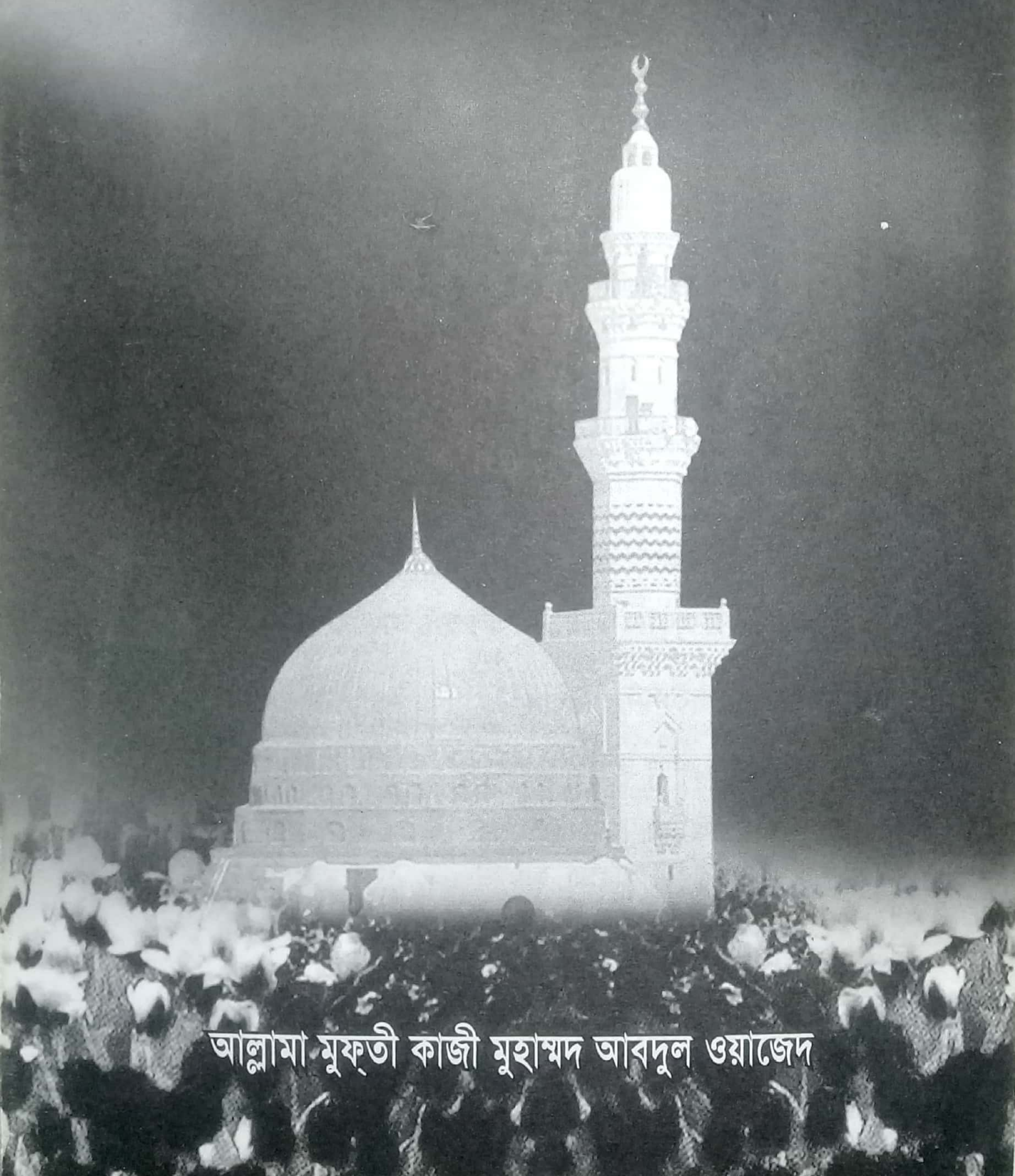

আল্লামা মুফ্‌তী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

Pdf
Created By
Mohammad
Albi Reza

WhatsApp: +8801839545196

FaceBook: www.fb.com/AlbiRezaBD

সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম

প্রকাশকালঃ ২৬ রমজান ১৪২৪ হিজরী
২২ নভেম্বর ২০০৩ খৃষ্টাব্দ
৮ অগ্রহায়ণ ১৪১০ বাংলা
শনিবার লাইলাতুল ক্বদর রাতে উদ্বোধন

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়ঃ
হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
এম. এম, এম.এফ, এম.তফ (প্রথম শ্রেণী)
অধ্যাপক, ফিক্বহ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম
খতিব, হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া জামে মসজিদ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

বদান্যতায়ঃ
আলহাজা বেগম রুনূ সিদ্দিকী
৬নং মহিলা মাহ্‌ফিল, ১৫নং বাড়ী, ৬নং রোড
মুরাদপুর হাউজিং সোসাইটি, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
ও মাসুদা মোমেন
এবং ৬নং মহিলা মাহ্‌ফিলের সদস্যবৃন্দ

তত্ত্বাবধানেঃ গাউসিয়া একাডেমী এণ্ড পাবলিশার্স, বাংলাদেশ

প্রকাশনায়ঃ গাউসিয়া প্রকাশনী, চট্টগ্রাম

যোগাযোগঃ
* আল-গোরফাতুল গাউসিয়া, দারুল ইফ্‌তা
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম
* ৬নং মহিলা মাহ্‌ফিল, ১৫নং বাড়ী, ৬নং রোড
মুরাদপুর হাউজিং সোসাইটি, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা মূল্য ৭০.০০ (সত্তর) টাকা মাত্র

সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম -

উৎসর্গ

সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত,
রাহমাতুল্লীল আলামীন হুজুর পুরনূর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার
খেদমতে

উপহার
Presentation

'সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিনতে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম'

জীবনী গ্রন্থ

প্রকাশনা পর্ষদের কলাম

স্মৃতির পাতা থেকে

প্রারম্ভিকা ঃ

করুণাময়ের অপার কৃপা, মাহবুবে খোদা সরকারে দু'জাহা হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মেহেরবাণী, খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার রূহানী ফয়জে করম, হুজুর গাউসুল আযম দস্তগীর শাইখ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, খাজা শাইখ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হুজুর ক্বেবলা গাউছে যমান রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হুজুর কেবলা মুর্শেদে বরহক রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, ও হুজুর কেবলা আল্লামা পীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ ছাবের শাহ মাদ্দাজিল্লুহুল আলীর নেগাহে করমে সৈয়্যদাতু নেসায়িল আলামীন সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লামার পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নে এশিয়াখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার ফিক্বহ বিভাগের অধ্যাপক, শাইখুল মাশায়েখ, ওস্তাজুল ওলামা, মুফতিয়ে আহলে সুন্নত, মুনাযেরে দ্বীন ও মিল্লাত, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিক, কলম সম্রাট, বাতিলের আতঙ্ক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন; তা জাতি-মাযহাব ও মিল্লাতের জন্য মহা নেয়ামত সমতুল্য।

এ জীবনী গন্থটি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনের দর্পনঃ

যাঁর অনুপম আদর্শে আদর্শিত হওয়া নারী জাতির ভূষণ;সেই নবী নন্দিনী সৈয়্যদা তাহেরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার পরিপূর্ণ জীবন চরিত্র এ প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত। যাতে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য ভাষায়ও এরকম তারতীবপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ পাওয়া বড়ই মুশকিল।

তাই খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জীবনী গ্রন্থের মধ্যে এটাই সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ রাখে।

এ জীবনী গ্রন্থটা পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম হবার এটাও একটি কারণ যে, গ্রন্থখানা সম্পন্ন হয় মাত্র ২২ দিনে। এটা ২২শে অক্টোবর '০৩ বুধবার লেখা আরম্ভ হয়ে ১২ নভেম্বর '০৩ বুধবার লেখা সমাপ্ত হয়। যা খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বয়সের সাথে অলৌকিক ভাবে সদৃশ্য রাখে। কেননা বিশুদ্ধ মতে, হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ২২ বছর জীবিত ছিলেন।

রমজান মাসে এ গ্রন্থ রচনার স্বকীয়তা ঃ

এ জীবনী গ্রন্থ রচনার লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে-

প্রথমতঃ এ কিতাবটা রমজানের ৬ দিন পূর্বে আরম্ভ হয়ে রমজান মাসের ১৬ তারিখ সমাপ্ত হয়। এটা এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ৩রা রমজান দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন; ফলে রমজান মাসে তাঁর জীবনী নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখা তাঁরই স্মরনের বহিঃপ্রকাশ। তাই ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনী গ্রন্থখানা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতার অনন্য সোপান।

দ্বিতীয়তঃ এ রমজান মাসের ২১ তারিখে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেছেন। কেননা তিনি খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এমন প্রিয় পাত্র ছিলেন, যে মাসে ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ওফাত হয়েছেন সেই মাসে তিনিও শাহাদত বরণকে আলিঙ্গন করেছেন। তাই রমজান মাসে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) জীবনী গ্রন্থ রচনা হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেক নজরেরই শুভ সূচনা।

তৃতীয়তঃ এ রমজান মাসে পীরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়ার বুকে তশরীফ এনেছেন। আর তিনিই তো ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নয়নের মণি প্রিয় বংশধর। সেহেতু রমজান মাসে সৈয়্যদা যাহ্‌রা বতুল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জীবনীগ্রন্থ রচনায় গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রূহানী ফয়েজ নসীব হয়েছে বিধায় লেখার উদ্যোগ সহজতর হয়েছে।

চতুর্থতঃ বিশুদ্ধ মতে রমজান মাসে খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শাদী মোবারক হয়েছে। এসব ফয়জে করমের উসিলায় আল্লাহর মেহেরবাণীতে পবিত্র রমজান মাসেই এ গ্রন্থটি রচিত।

এ জীবনী গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ-উদ্দীপনা স্মরণীয় ঃ

এ জীবনী গ্রন্থটি লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা যারা খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম, দিনরাত এ গ্রন্থের কাজ সমাধা করতে আমাদের কোন কষ্ট অনুভব হয়নি; বরং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে এ কাজে যেন রূহানী শক্তির ফয়জে করমের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। যার বদৌলতে লেখা ছাপা প্রভৃতি কাজে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। যা আল্লাহর দরবারে খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার এ জীবনী গ্রন্থটি মকবুল হবারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাকে ফাতেমা বতুল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কারামতও বলা যেতে পারে।

এ মহান কাজ করতে পারা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় নয়। বরং আমরা যে একাজে সহযোগিতা করে খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জীবনী গ্রন্থ রচনায় নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছি ; এটাই বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ আমাদের খেদমতকে কবুল করুন।

যে বা যারা এ কাজে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করে খাটো করতে চায় না। কিন্তু তাঁরা যে মহা মর্যাদাময় কাজে তাঁদের লেখনী, মেধাশক্তি, সুবুদ্ধি, আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করে এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমাদেরকে ধন্য করেছেন; এটাই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। আর এটা শুধু দুনিয়াতে নয়, পরকালীন সওয়াবের জন্য এ কথা যথেষ্ট যে, আহলে বাইতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার মুহব্বতে যে এক দিন সময় দেবে সেটা শত বছরের এবাদতের চেয়েও উত্তম সময় বলে বিবেচিত। যা আল্লাহ্ তায়ালা আহলে বাইতের মুহব্বতে প্রদান করবেন। এটা যদি হয়, তাহলে তো এ গ্রন্থ রচনায় যাঁরা সহযোগী ছিলেন, সবাই যে অনন্য মর্যাদার অধিকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি যারা এ মহান জীবনী গ্রন্থ সংগ্রহ করে খেদমতগার হবেন তারাও পূণ্য সওয়াবের ভাগী হবেন এবং আহলে বাইতের মুহব্বতকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সৎ ও পূণ্যময় কাজের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এ জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ঃ

নারী সমাজের অবক্ষয়রোধে হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার অনুপম আদর্শই মুক্তির সোপান। এ আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবনী সম্পর্কে সমকজ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু চাহিদানুপাতে এ জীবন চরিত্র খুবই বিরল। ফলে জ্ঞান পিপাসু নারী-সমাজ আদর্শ চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার পূর্ণাঙ্গ আদর্শজ্ঞানের অভাবে দিশাহারা। এমনি এক মুহূর্তে নারী জাতির আদর্শের

মডেল খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর 'জীবন চরিত' রচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এমন এক দূর্লভ কাজে দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে সুন্দরতম আদর্শের নমূনা সমাজের কাছে উপহার দেয়া সৌভাগ্যশীল ও পূণ্যবান মণীষীর গভীর জ্ঞান ভাবনারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁর সুচিন্তিত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত লেখায় পরিবার- সমাজ-রাষ্ট্র, মাযহাব ও মিল্লাত, বিশেষতঃ নারী সমাজ সুপথের পথিক হবার পথ নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

সৈয়্যদ ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নারী সমাজের ভূষণ ঃ

যার মহান চরিত্রের অনুপম আদর্শে দিশেহারা নারী সমাজ পথের দিশা পেয়ে থাকেন, এমনই একজন মহা মহিয়সী সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি তাঁর জীবনকে যেভাবে প্রস্ফুটিত করে ইসলামী আদর্শের সমুজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন- যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যাঁর অতুলণীয় আদর্শের সোপানে আরোহন করা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কেনই-বা সৌভাগ্যের অধিকার হবেন না (!) যাঁর মর্যাদা সমগ্র নারী জগতের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন, সেই নবী নন্দিনীর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারাটাই খোশ নসিব।

তিনি পারিবারিক, সামাজিক, ইসলামিক ও আধ্যাত্মিকতার পরিমন্ডলে যে সব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সে আদর্শই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য উপমা। তাঁর সেই আদর্শ সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কর্মস্পৃহার স্নায়ুকে শাণিত করা প্রত্যেক আদর্শ নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সৎ ও সুন্দর পথে জীবন গড়ার তাওফিক দিন।

যবনিকা ঃ

এ গ্রন্থ থেকে বিশেষতঃ এদেশের নারী সমাজ উপকৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু নারী সমাজ নয় পুরুষের জন্যও আহলে বাইতের কিশতীতে আরোহনকারীর জন্য এ জীবনী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ যাতে খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার এ অনন্য জীবনী গ্রন্থ উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার গুনাহগার নর-নারীর জন্য নাজাতের উসিলা হিসেবে ইহ ও পরকালীন জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়; এটাই প্রত্যাশা। আমিন। বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম।

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের অভিমত

বিষয় ঃ — পৃষ্ঠা

অবতরণিকা ২০
নবী বংশের বিস্তৃতি ২০
আহলে বাইত-ই আলোকবর্তিকা ২০
আহলে বাইতের শানে অবমাননা অপনোদনের প্রয়াস ২০
'সৈয়দ্যা ফাতেমা বতুল বিনতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম' জীবনী গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ ২১
কর্মস্পৃহায় উদ্দীপনা সৃষ্টি ২১
আহলে বাইতের শানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দলীল উপস্থাপন ২১
প্রয়োজনীয় মাসায়েল সংযোজন ২১
হাদীস সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা ২১
হাদীস সহীহ-জয়ীফ সংক্রান্ত সমালোচনা করা কাদের জন্য বৈধ
বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতার মরণ ফাঁদ ২২
সংস্করণে সংশোধন ও সংযোজনের আশ্বাস ২৩
সমাপিকা ২৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ২৪
আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বাণী ২৪
পীর সৈয়্যদ খিজির হোসাইন চিশতির বাণী ২৫
আল্লামা কবি ইকবাল এর বাণী ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম মোবারক ২৭
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নামকরণের রহস্য ২৮
প্রসিদ্ধ উপাধিসমূহের স্বকীয়তাঃ ২৮
প্রথম উপাধি সৈয়্যদাতু নেসায়িল আলামীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ২৮
দ্বিতীয় উপাধি যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ২৯
তৃতীয় উপাধি বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৩১
চতুর্থ উপাধি তাহেরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৩২
পঞ্চম উপাধি যাকিয়্যা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৩২

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা

উপাধিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৩২
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম মোবারক প্রসঙ্গঃ ৩২

তৃতীয় অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নসব মোবারক

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা পিতার দিক দিয়ে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশনামা ৩৮
মায়ের দিকে দিয়ে বংশনামা ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্ম মোবারক

জন্মসাল প্রসঙ্গঃ ৪২
জন্ম মোবারকের অলৌকিকত্ব ৪২
বেহেশত থেকে মহিয়সীদের আগমন ৪২
সমগ্র বিশ্বে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ ৪৩
বেহেশতের সম্মানিত হুর ও পবিত্র পানি দ্বারা গোসল প্রদান ৪৩
অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৪৪
উম্মতে মুহাম্মদীর নাজাত ও মুক্তির দিশারী ৪৪
হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বেহেশতী আপেল ভক্ষণই ৪৫
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্মের সূচনা - ৪৫
জন্মের পর সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রার্থনা ৪৫
সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্মের সুসংবাদ ৪৫
গর্ভাবস্থায় সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গায়েবী সংবাদ ৪৬
বেহেশতে আদম ও হাওয়া (আলাইহিমুস সালাম) কর্তৃক তাঁর দর্শন লাভ ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শৈশব জীবন

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর লালন-পালন ৪৯
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অনুপম আদর্শ ৪৯
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দৈহিক গঠন ৪৯
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রখরতা ৫০
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)অতুলনীয় চারিত্রিক গুণের অধিকারী ৫১
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সম্মানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ - ৫১
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বেহেশতের সুঘ্রাণ আত্মপ্রকাশ ৫২
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মর্যাদার প্রতি হুজুর (দঃ) মুহব্বত ৫৩
বেহেশতী পোশাক ও অলৌকিক কারামত ৫৪
কোরাইশদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রদান ৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদী মোবারক

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের পয়গাম ৫৭
সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের ব্যাপারে আসমানী ফয়সালা ৫৭
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের উপহার বেহেশতে কিয়ামত পর্যন্ত বন্টনযোগ্য ৫৮
জমিনে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের বাস্তবায়ন ৫৯
বিবাহ্ অনুষ্ঠানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খোতবা প্রদান ৫৯
বিবাহের মোহরানা নির্ধারণ ও দোয়া মাহ্‌ফিল ৬০
বেহেশতে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহ অনুষ্ঠানের মোহরানা ৬২
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহে বেহেশতী পোশাক উপহার ৬৫
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহে সরসায়িল ফেরেশতার আগমন ৬৬
চতুর্থ আসমান বায়তুল মামুরে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদী মোবারক ৬৮
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র শাদী মোবারকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপঢৌকন ৬৯
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহোত্তর বিদায়লগ্নের শুভ মুহূর্তে অলৌকিক দৃশ্য ৭০
বিদায়কালে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক সান্ত্বনা ৭২
বিদায়োত্তর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমন ৭৩
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহোত্তর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক অলিমার আয়োজন ৭৫

সপ্তম অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পারিবারিক জীবনঃ

পারিবারিক কাজে নবী নন্দিনী সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৭৬
হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ঘরে খাদেম আনার কৌশিষ ৭৬
হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খাদেমের পরিবর্তে তদবীর প্রদান ৭৭
খাদেমের ব্যাপারে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাসবীহে ফাতেমী ৭৮

অষ্টম অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ইবাদত বন্দেগীঃ

রান্নার কাজের সময় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কুরআন তিলাওয়াত- ৮৪

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রাত্রি জাগরন ৮৪
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ইবাদত বন্দেগীর বৈশিষ্ট্য ৮৪
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাজে ফেরেশতাদের সহযোগিতা ৮৫
কাজের মধ্যেও সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল ৮৬
অভাব অনটনে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ধৈর্য্য ৮৭
দুনিয়ার ধন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হস্তগত, তবুও নবী পরিবার বিমুখ ৮৮
ক্ষুধার কারণে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চেহারা
মোবারক ফ্যাকাশে হওয়া ও নবীজির দোয়া ৮৮
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ক্ষুধার্ত থেকে ভিক্ষুককে আহার দান ৮৯
নবী পরিবারের অলৌকিকত্ব ভোগ নয় ত্যাগই সুখ ৯০
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর পরিবারের ইফতার অভাবীদেরকে প্রদান ৯৩
হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)
কে বরকত ও গায়েবী রিযিকের দোয়া শিক্ষা দান - ৯৪
হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর নন্দিনী খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খাদেমা ৯৫

নবম অধ্যায়

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দাঃ

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দা ও বর্তমান নারী সমাজ ৯৮
লজ্জা ও পরদাকরণের মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অবদান ১০০
পর্দা করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান ১০০
পুরুষ-মহিলা একে অপরকে না দেখার পর্দা ১০১
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দা ১০১
কিয়ামত দিবসে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দা- ১০১

দশম অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের আলোকে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ফযায়েলঃ

প্রথম আয়াতে তাতহীর ঃ সূরা আহযাব,আয়াত-৩৩ পারা-১১
আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পুতঃপবিত্র ১০৪
দ্বিতীয় আয়াতে মুবাহেলা ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২১ পারা-৩
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের কথা সত্য এবং তাঁদের দোয়া মকবুল - ১০৮
তৃতীয় আয়াতে মুয়াদ্দাতঃ সূরা শূরা, আয়াত-৬ পারা-২৫
আহলে বাইত তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতই ঈমান - ১০৮
চতুর্থ আয়াতে দরূদ ঃ সূরা আহযাব, আয়াত-২৬ পারা-২২
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের উপর দরুদ সালাম পড়া ওয়াজিব- ১০৯

পঞ্চম আয়াতে সালাম ঃ সূরা সফ্‌ফাত, আয়াত ১৩০, পারা-২৩
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর উপর আল্লাহর সালাম, ...১১০
ষষ্ঠ আয়াতে সওয়াল ঃ সূরা সাফফাত, আয়াত-২৪ পারা-২৩
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতই কিয়ামতে মুক্তির উসিলা ১১১
সপ্তম আয়াতে এতেছাম ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩ পারা-৪
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীরা সুন্নি হিসাবে সাব্যস্ত ১১১
অষ্টম আয়াতে ফযলঃ সূরা নিসা, আয়াত-৫৪ পারা-৫
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর উপর হিংসা বিদ্বেষকারীরা জাহান্নামী ১১২
নবম আয়াতে আমান ঃ সূরা আনফাল, আয়াত-৩৩ পারা-৯
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কান্ডারী ১১৪
দশম আয়াতে হেদায়েত ঃ সূরা ত্বহা, আয়াত-৮২ পারা-১৬
হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীরা আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত ১১৫
একাদশ আয়াতে রেদ্বা ঃ সূরা দোহা, আয়াত-৫ পারা-৩০
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দুনিয়াবী কষ্টই আখেরাতের সোপান ১১৬
দ্বাদশ আয়াতে মুহাব্বত ঃ সূরা দাহর, আয়াত-৮ পারা-২৯
সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ত্যাগের শিক্ষাই ভক্তদের দীক্ষা ১১৭
ত্রয়োদশ আয়াতে মনযেলাত ঃ সূরা আর-রহমান, আয়াত-১৯-২২ পারা-২৭
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরগণ আল্লাহর মনোনীত ১১৮
চতুর্থশ আয়াতে নাসেলা ঃ সূরা কাউসার, আয়াত-১ পারা-৩০
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে বংশধারা প্রবাহিত ১১৯
পঞ্চদশ আয়াতে যিকির বা তসকীন ঃ সূরা রা'দ, আয়াত-২৮ পারা-২৩
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর স্মরণই আল্লাহর জিকির ১২০
ষোড়শ আয়াতে বায়্যেনাহঃ সূরা বাইয়্যেনাহ , আয়াত-৪ পারা-৩০
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ই ইসলামের সত্যতার অনন্য দলীল ১২১
সপ্তদশ আয়াতে রিফায়তঃ সূরা নূর, আয়াত-৩১ পারা-২৮
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের প্রশংসা ১২১
অষ্টাদশ আয়াতে নিয়ামত ঃ সূরা তাকাসুর, আয়াত-৮ পারা-৩০
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইত-ই নিয়ামত সমতূল্য অনুসরণীয় আদর্শ ২১৩
উনবিংশ আয়াতে নিসবতঃ সূরা ফোরকার, আয়াত-৫৪ পারা-১৯
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশ বিস্তার ২১৩
বিংশতম আয়াতে রেফাকতঃ সূরা হাজর, আয়াত-৪৭, পারা-১৯
আহলে বাইত তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চরিত্রের প্রসংশা ২১৪

একবিংশ আয়াতে সেরাতঃ সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫ পারা-১
আহলে বাইত তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হেদায়তের আলোকবর্তিকা ২১৫
দ্বাদবিংশ আয়াতে নূরঃ সূরা নূর, আয়াত-৩৫ পারা-১৮
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী বংশ ২১৫

একাদশ অধ্যায়

হাদিসের আলোকে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ফযায়েল ঃ
প্রথম হাদিসে বিদয়াঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে শত্রুতা কুফরী ১২৩
দ্বিতীয় হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর উপস্থিতি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অন্য বিবাহ হারাম ১২৪
তৃতীয় হাদিসঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বেহেশতে সর্বপ্রথম ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আগমন ১২৫
চতুর্থ হাদিসঃ যাহ্‌রা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে মুহব্বতকারীরা কিয়ামতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে একত্রিত হবেন ১২৬
পঞ্চম হাদিসঃ কিয়ামতের দিন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অবস্থা ১২৬
ষষ্ঠ হাদিসঃ হাশর দিবসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গুম্বুজের নিচে ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর স্থান ১২৭
সপ্তম হাদিসঃ কিয়ামত দিবসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)ও সুপারিশকারী ১২৭
অষ্টম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসরণই মুক্তির উসিলা ১২৮
নবম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীরা বেহেশতী ১২৮
দশম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বত ঈমানদারীর পরিচায়ক ১২৯
একাদশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আদর্শ নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কিশতী সমতূল্য ১৩০
দ্বাদশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সত্যের মাপকাঠি ১৩০
ত্রয়োদশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের মধ্যমণি ১৩০
চতুর্দশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীদের জন্য সুপারিশ অবধারিত- ১৩২
পঞ্চদশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বত আল্লাহর সন্তুষ্টির সোপান - ১৩২
ষোড়শ হাদিসঃ হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি ভালবাসা পুলসিরাতের সংকট মুক্তির উসিলা ১৩৩
সপ্তদশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তুলনাহীনা ১৩৩
অষ্টদশ হাদিসঃ এর আদর্শের শিক্ষার্জন আবশ্যক ১৩৩

উনবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাহায্যকারীদের বিনিময় অবধারিত ১৩৪
বিংশ হাদিসঃ খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বত এবাদত সমতূল্য ১৩৫
একবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতকারীদের মৃত্যুকালীন কয়েকটি সুসংবাদ ১৩৫
দ্বাদবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি বিদ্বেষীরা জাহান্নামী ১৩৭
ত্রয়োবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর ফয়সালা - ১৩৮
চতুর্বিংশ হাদিসঃ জীবন চলার পথে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে অনুসরণ করার নির্দেশ - ১৩৯
পঞ্চবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে শত্রুতাই আল্লাহর শাস্তির উপযোগী - ১৩৯
ষোড়বিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব বেঈমানের লক্ষণ ১৪০
সপ্তবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি হেয়প্রতিপন্নকারীর জন্য বেহেশত হারাম- ১৪০
অষ্টবিংশ হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরা মুনাফেক - ১৪১
ঊনত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরা হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত- ১৪১
ত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের প্রতি অবিচার হারাম - ১৪২
একত্রিশতম হাদিসঃ আহলে বাইতের জন্য সদকা গ্রহণ হারাম এবং তাঁদেরকে সদকা দেয়াও হারাম - ১৪২
বত্রিশতম হাদিসঃ আহলে বাইতের জন্য সদকা নিষিদ্ধ ১৪৩
তেত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য - ১৪৪
চৌত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর আউলাদের উপর দরূদ পাঠই নামাযের পরিপূর্ণতা ১৪৪
পঁয়ত্রিশতম হাদিসঃ নামাযে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের স্মরণে দরূদ পাঠ আবশ্যক ১৪৫
ছত্রিশতম হাদিসঃ দোয়া কবুল হবার জন্য হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর স্মরনে দরুদ পাঠ শর্ত ১৪৫
সাঁইত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতকে মুহব্বতকারীদের হাউজে কাউসারে অবস্থান ১৪৫
আটত্রিশতম হাদিসঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সন্তুষ্টিই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াত ১৪৬
ঊনচল্লিশতম হাদীসঃ ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের শানে দুশমনি করা ইহুদীদের সভাব ১৪৬
চল্লিশতম হাদিসঃ আহলে বাইতের শান-মানের অবজ্ঞাকারীরা জারজ সন্তান ১৪৭
শানে আহলে বাইত ও চল্লিশ হাদিস প্রসঙ্গঃ ১৪৭

দ্বাদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কারামতঃ

ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য আসমানী খাদ্য অবতরণ ১৪৮

আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্যে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ফয়সালা ১৪৯

টিড্ডী পতঙ্গ কর্তৃক ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য স্বর্ণের দুলী প্রেরণ - ১৪৯

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হুদায়বিয়ার আহবান

মদিনা পাকে বসে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) শ্রবণ - ১৪৯

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উটনীর সাথে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কথা- ১৫০

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দোয়ায় আল্লামা গাজী শেরে বাংলা

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পুনঃজীবন লাভ ১৫১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরদের পরিচয় ১৫২

চতুর্থদশ অধ্যায়

ফাতেমা (রাঃ) এর বিশেষ আমল

ফাতেমা (রাঃ) এর বিশেষ আমলের শিক্ষা ১৫২

একটি বিশেষ নামাযের শিক্ষা ১৫৩

হাজত পূরণে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নামায ১৫৩

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফাতেমা (রাঃ) কর্তৃক পঠিত দরূদ শরীফ ১৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাত মোবারকঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) কর্তৃক ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)

এর ওফাত মোবারকের সুসংবাদ - ১৫৪

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিদায়ে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) শোকাহত - ১৫৬

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এর সাথে কবরের জগতে সাক্ষাতের আরাধনা - ১৫৭

সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শান্তনা হযরত হিন্দা বিনতে

আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শোকগাঁথা - ১৫৮

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিদায়ের পর

সৈয়্যদা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিচ্ছেদ সময়কাল - ১৫৮

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রোগাক্রান্তাবস্থায়

সিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সাক্ষাত প্রদান ১৫৯

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের অন্তিম সময়ের হৃদয় বিদারক ঘটনা ১৬০

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক ওফাতের প্রস্তুতি ১৬১

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অন্তিম সময়ের গোসল মোবারক ১৬২

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অন্তিম শয্যা ১৬২

সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অন্তিম শয্যায় নামায ও দোয়া ১৬৩

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক ওফাতের পূর্বে পরদার বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য অসিয়ত- ১৬৩

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও ওফাতের পূর্বে গোসল সংক্রান্ত প্রথম অসিয়ত - ১৬৪

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও গোসল সংক্রান্ত দ্বিতীয় অসিয়ত- ১৬৪

সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গোসল সংক্রান্ত তৃতীয় অসিয়ত- ১৬৪

সপ্তদশ অধ্যায়

আল্লাহ জাল্লাশানুহু কর্তৃক খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জান কবজঃ ১৬৫

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রূহ কবজ করার সংক্রান্ত শরয়ী বিধান ১৬৫

অষ্টদশ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের তারিখ মোবারক ১৬৬

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ৩ রা রমজান ওরশ ও ফাতেহা ১৬৬

উনবিংশ অধ্যায়

ওফাতের সময় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স মোবারক ১৬৭

বিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের পর কাফন-দাফন ও গোসল

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নামাজে জানাযা ১৬৭

ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দাফন কাজে যাঁরা নিয়োজিত ১৬৮

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের পর গোসল সংক্রান্ত ফয়সালা ১৬৮

গোসল সংক্রান্ত আলোচনার সমাধান ১৬৯

একবিংশ অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কবর মোবারকের রহস্য ১৭১

দাফন সংক্রান্ত মতামত ১৭১

দাফন সংক্রান্ত আলোচনার সমাধান ১৭১

সমাধান সংক্রান্ত অভিমত ১৭২

সমাধান সংক্রান্ত গ্রন্থকারের অভিমত ১৭২

দ্বাদবিংশ অধ্যায়

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস বর্ণনা ১৭৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ফেদকের ঘটনাঃ
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও সিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মিথ্যা অভিযোগের বর্ণনা ১৭৫
মিথ্যার অপনোদন ১৭৫
শিয়া রাফেজীদের কারসাজী ১৭৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আহলে বাইত সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

ال (আল্) ও اهل بيت (আহলে বাইত) এর আলোচনা ১৭৭
ال (আল্) এর প্রকরণ ১৭৭
আল ও আহলে বাইত সংক্রান্ত মতামত ১৭৮
আহলে বাইত থেকে পাক পাঞ্জাতন উদ্দেশ্য ১৭৮
পাক পাঞ্জাতন ছাড়াও অন্যান্যরা উদ্দেশ্য ১৮০
মতামত সংক্রান্ত আলোচনা ১৮১
আহলে বাইতের প্রকারভেদ ১৮১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আহলে বাইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানঃ

সাহাবায়ে কেরামের নিকট আহলে বাইতের মর্যাদা ১৮২
চার মাযহাবের ইমামগনের নিকট আহলে বাইতের মর্যাদা ১৮৫
ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক আহলে বাইতের তাজিম ১৮৬

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদ বংশ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সৈয়্যদ শব্দের বিশ্লেষন ১৯০
সৈয়্যদ এর প্রকরণ ১৯২
বর্তমান সৈয়দ বংশের ধারা অব্যাহত ১৯৩
সৈয়্যদ না হয়ে সৈয়্যদ দাবীকারীদের উপর অভিসম্পাত ১৯৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদজাদাদের ফযায়েল তথা মর্যাদা বর্ণনা

তকিবিন ফাহাদ হাশেমীর বর্ণনা ১৯৪
আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের বর্ণনা ১৯৪
আবু মুহাম্মদ ফাছীর বর্ণনা ১৯৫
মুস্তাফা খাঁ রেজার (রাঃ) এর বর্ণনা ১৯৬
আল্লামা ইবনে হাজর এর বর্ণনা ১৯৬
ইমাম নিবহানীর বর্ণনা ১৯৬

অষ্টবিংশ অধ্যায়

শানে আহলে বাইতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঃ

প্রথম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ১৯৭
খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরদের সাহায্যকারীরা বেহেস্তী
দ্বিতীয় কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ১৯৮
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরের খেদমতে ঈমান নসীব
তৃতীয় কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ১৯৮
হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)) এর বংশধরের সাহায্যকারীর জন্য মহা পুরস্কার
চতুর্থ কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ১৯৯
সৈয়্যদা যাহরা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরের সম্মানার্থে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব করার মহান সৌভাগ্য অর্জন
পঞ্চম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ২০০
আউলাদে ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কলেমা নসিব
ষষ্ঠ কাহিনী বা উপদেশূলক ঘটনা ২০২
আউলাদে ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র খেদমতে বেলায়ত নসিব
সপ্তম কাহিনী বা উপদেশূলক ঘটনা ২০৩
আহলে বাইতের শানে কবিতা রচনায় ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র উসিলায় রোগমুক্তি -
অষ্টম কাহিনী বা উপদেশূলক ঘটনা ২০৪
ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র কাহিনী শুনার শর্তে ছেলের জান ফেরত
নবম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ২০৬
মছিবতে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র সাহায্য আর কাহিনী না শুনার প্রতিফল ও প্রতিকার -

উনত্রিতম অধ্যায়

পাক পাঞ্জাতন এর নামে আমল সমূহ

পাক পাঞ্জাতনের নামে পাকের বরকত হাসিলের বিশেষ আমল ২০৯
পাক পাঞ্জাতনের নামে পবিত্র নামে ফাতেহা শরীফ ২১২

ত্রিশতম অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)এর প্রতি সালামী ঃ

বাংলা উচ্চারণ (উদু কবিতা) ২১৭

গ্রন্থ অধ্যায়

তথ্যসূত্র ঃগ্রন্থাবলী ২১৯

বিস্‌মিল্লাহি রাহ্‌মানির রাহীম

গ্রন্থকারের অভিমত

অবতরণিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা মহামহিম রাব্বুল আলামীনের, যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নূর মোবারক হতে সমগ্র কুল-কায়েনাত সৃষ্টি করেন। সেই নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সুন্দরতম আকৃতিতে এই ধরনীতে প্রেরণের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে। সেই আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই সৃষ্টির সেরা জীব মানব জাতির বিস্তার ঘটান। পর্যায়ক্রমে আদম আলাইহিস সালাম হতে পঞ্চাশ জোড়া নর-নারী নির্বাচন করে মানবাকৃতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বিশ্বমানে প্রেরণ করেন আর তাঁরই নুরানী বংশে আবির্ভাব হয় খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয্ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

নবী বংশের বিস্তৃতিঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী বংশধারা বিশ্ব মাঝে বিস্তারের ক্ষেত্রে মধ্যমনি সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)। যাঁকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য মানবজাতি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ আহলে বাইতের একটি ধারা সূচনা করে বিশ্ববাসীর জন্য উপহার দেন। এই আহলে বাইত-ই পরবর্তীতে দিকভ্রান্ত প্রজন্মের জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হিসেবে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিশ্‌তী সমতুল্য।

আহলে বাইত-ই আলোকবর্তিকাঃ

মানবজাতির আদর্শ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর নারী জাতির আদর্শ নবী তনয়া খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

আহলে বাইতের শানে অবমাননা অপনোদনের প্রয়াসঃ

ইসলামের নামে কলংঙ্ক লেপনকারী শিয়া মতাবলম্বী বর্ণচোরা তথাকথিত লেখক সত্যকে আঁড়াল করে সাহাবাদের মানক্ষুন্ন করার ষড়যন্ত্রে খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কিছু জীবনী গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করে মূলতঃ মৌলিকতা

বিবর্জিত কতেক কথাবার্তা বলে ইসলামী আক্বায়েদে বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপচেষ্টার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে সৈয়্যদা যাহ্‌রা বতুল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বর্ণাঢ্য জীবন, অনুপম আদর্শ, চরিত্র সমৃদ্ধ কারামত ও মর্যাদা সম্বলিত বর্ণনার আলোকে মাতৃভাষায় প্রামাণ্য ও গবেষণালব্ধ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়।

সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনীগ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগঃ

হৃদয় মানসপটের কাঙিখত বাসনাকে হাতেকড়ি হিসেবে নবী নন্দিনী সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বর্ণাঢ্য ও অলৌকিকত্ব পূর্ণ জীবন আদর্শ চরিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও সঠিক ইতিহাসের নিরিখে একটা গবেষণালব্ধ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকার হাতে অর্পণ করার মহান প্রয়াসে 'রমজান মাস'কেই মোক্ষম সময় হিসেবে নির্বাচন করলাম।

কর্মস্পৃহায় উদ্দীপনা সৃষ্টিঃ

খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার জীবনী নিয়ে গবেষণা শুরু করতেই আমার হাতে এসে পৌঁছতে লাগল একের পর এক নতুন নতুন তথ্য, দূর্লভ রহস্য, সর্বোপরি প্রত্যেকটি তত্ত্ব ও অংশের পেছনে তথ্য রেফারেন্স সহজভাবেই হস্তগত হলো। মনে হচ্ছে যেন সৈয়্যদা যাহ্‌রা বাতুল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আধ্যাত্মিকভাবে আমাকে স্বীয় কর্মে এগিয়ে দিচ্ছেন। এটাকে আমি তাঁরই এক কারামত বলে আখ্যায়িত করব।

আহলে বাইতের শানে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে দলীল উপস্থাপনঃ

সম্প্রতি আমাদের দেশে আহলে বাইতের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের তেমন শ্রদ্ধাবোধ নেই বললেই চলে। তাই বিষয়টি গুরুত্বানুধাবন করে আহলে বাইতের মর্যাদা কোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রয়োজনীয় মাসায়েল সংযোজনঃ

জীবনীগ্রন্থ হলেও প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও উপদেশ সংযোজন করে বিষয় বস্তুকে আরো মজবুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে; যাতে সহজেই অনুসরণীয় আদর্শ গ্রহণে দ্বিমত পোষণের অবকাশ না থাকে।

হাদীস সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনাঃ

প্রথমতঃ এখানে এমন কতগুলো হাদীস সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো মুহাদ্দেসীনের পরিভাষায় পূণাঙ্গ সহীহ না হলেও জয়ীফ হিসেবে সাব্যস্থ।

দ্বিতীয়তঃ তাই একথা সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত যে, পূর্ণাঙ্গ ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়।

তৃতীয়তঃ হাদীস বর্ণনাকারী (বাহক)দের মধ্যে হাদীস বর্ণনার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে তাদের বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলা হয়। আর বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার শর্তাবলী হতে কয়েকটি কমতি থাকলে তখনই ঐ হাদীসের বাহককে জয়ীফ বলা হয়। হাদীসে পাকের মূল এবারত কিন্তু জয়ীফ নয়।

চতুর্থতঃ হাদীস শরীফ যখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষে থেকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করা হয়েছে, তখন কিন্তু হাদীস সহীহ,-জয়ীফ এর প্রশ্নই ছিল না। কেবল মাত্র বাহকের কারণে এ পার্থক্যটা বিদ্যমান।

পঞ্চমতঃ মুহাদ্দেসীনরা ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস সহীহ হবার কোন শর্তারোপ করেন নি। তবে শরীয়তের আহকামের ব্যাপারে সহীহ-জয়ীফের শর্তারোপ করেছেন।

ষষ্ঠতঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন-

وَاِذَا رَوَيْنَا فِى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا
وَاِذَا رَوَيْنَا عَنِ الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.

অর্থাৎ- আমরা যখন হালাল-হারামের বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করি তখন কঠোরতা বিষয়ে অবলম্বন করি। আর যখন ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনা করি, তখন সেক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করে থাকি।

হাদীস সহীহ-জয়ীফ সংক্রান্ত সমালোচনা করা কাদের জন্য বৈধ ঃ

প্রথমতঃ হাদীস সহীহ-জয়ীফ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা করার যোগ্যতা রাখেন এ কথাও ইসলামের মূল রূপরেখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যোগ্য ওলামায়ে কেরাম।

দ্বিতীয়তঃ আহলে সুন্নত বিরোধী-বাতিল ফিরকা যেমন- খারেজী, রাফেজী, জবরিয়া, কদরীয়া, মুরজিয়া, শিয়া, কাদিয়ানী, তাবলীগি, আহলে হাদীস, নজদী, ওহাবী, মওদূদী-জামাত পন্থীদের কোন বক্তব্য এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা ইসলামের মৌলিক আদর্শ (সুন্নী আক্বিদা) হতে বিচ্যুত হবার কারণে বদ আক্বীদাপন্থী বিধায় তাদের কথা ইসলামী শরীয়তে গৃহীত নয়।

তৃতীয়ত ঃ অপর দিকে তারা (বাতিলপন্থীরা) যেসব বড় বড় ইমামদের রেফারেন্স প্রদান করে, তাদের কাছে ঐসব ইমামদের সনদ নাই বিধায় তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতার মরণ ফাঁদঃ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সমাজে বদ আক্বীদাপন্থী এক শ্রেণীর

লোকের এটা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে যে, নবী-অলি, আহলে বাইতের শানে কোন ফযিলত বর্ণিত হলেই বলে উঠে, এসব জয়ীফ হাদীস, বেশি বাড়াবাড়ি, শিরক, বিদআত ইত্যাদি।

তাই প্রত্যেকটি কথার পেছনে সমাদৃত প্রামান্য গ্রন্থের বরাত সহকারে এ জীবনী গ্রন্থটি সাজিয়েছি বিধায় এ গ্রন্থটি তাদের জন্য কবর রচনাকারী।

সংস্করণে, সংশোধন ও সংযোজনের আশ্বাসঃ

আমি একথা দাবী করছি না যে, এতে সমস্ত তথ্য সংযোজন করতে পেরেছি। বরং সচেতন পাঠক মহল যদি আরো কিছু নতুন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেন তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজনের আশ্বাস দিচ্ছি।

সমাপিকাঃ

খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিনতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লামার রূহানী ফয়ূজাত কামনা করে এটাই আরজ করি যে- যদি গ্রন্থটির পাঠক-পাঠিকা, নবী-প্রেমিক আশেকানদের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি মুহব্বত এবং নবী নন্দিনীর আদর্শে আদর্শবান হবার নূন্যতম অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাহলে আমার এ প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় মুহব্বত কবুল করুন। আমীন।

الٰهی بحق بنی فاطمة
که بر قول ایمان کنی خاتمه
اگر دعوتم ردکنی ورقبول
من و دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم

আলহাজ্ব মুফতী কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
গ্রন্থকার
অধ্যাপক
ফিক্বহ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম
২২ নভেম্বর '০৩, ২৬ রমজান ১৪১৪ হিঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিন্‌তে রসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলাইহা ওয়াসাল্লাম

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ সায়্যিদুল আম্বিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থতম পবিত্র নন্দিনী, সায়্যিদুল আউলিয়া শেরে খোদা আলী মরতুজা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর পবিত্রতম স্ত্রী, উম্মুল মুমেনীন খাদিজাতুল কোবরা আত-তাহেরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) বিন্‌তে খোয়াইলাদ এর আদরের কন্যা সায়্যিদুশ শাবাবি আহ্‌লীল জান্নাত হযরত ইমাম হাসান মুজতবা ও সায়্যিদুশ শোহাদা ইমাম আলী মক্বাম হযরত ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা আলাইহিমুস্ সালামের সম্মানিত আম্মাজান হযরত খাতুনে জান্নাত 'সায়্যিদাতু নেসায়িল আলামীন' (নারী জগতের সরদারনী) হযরত ফাতেমা আয্-যাহ্‌রা আল্ -বতুল সালামুল্লাহি আলাইহা।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) **এর বাণীঃ**[১]

خون خير الرسل سے هے جن كا خمر
ان كي بے لوث طينت پہ لاكھوں سلام

উচ্চারণঃ খুনে খাইরুর রসূলছে হে জিনকা খমর,
উন কি বে লুছে তীনত্ পেলাখো সালাম।

অনুবাদঃ রাসূল এর রক্ত যাঁর শরীরের গঠন প্রকৃতি
তাঁর পঙ্কিলতামুক্ত সৃষ্টি উৎসে লাখো সালাম।

اس بتول جگر پارۂ مصطفے
حجله آرائے عفّت پہ لاكھوں سلام

টীকা- ১ ঃ حدائق بخشيش اعلحضرت امام احمد رضا بريلوى رحمة الله عليه

উচ্চারণঃ উস্ বতুল জিগর পারা মুস্তফা,
হজলা আরায়ে ইফফত পেলাখো সালাম।

অনুবাদঃ তিনি সেই বতুল যিনি নবী মোস্তফার কলিজার টুকরা
পূতঃ পবিত্রতা আর মহান চরিত্রের উপর লাখো সালাম।

جس كا آنچل نہ ديكھا مہ ومهرنے
اس ردائے نزاهت پہ لاكھوں سلام

উচ্চারণঃ জিস্ কা আঁচল নাহ্ দেখা মাহ্ ও মুহরনে
উস্ রেদায়ে নযাহত পেলাখো সালাম।

অনুবাদঃ যার কাপড়ের আঁচল কভু দেখেনি চন্দ্র-সূর্য
সেই পবিত্র চাদরের উপর লাখো সালাম।

سيده زاهده طيبه طاهره
جان احمد كي راحت پہ لاكھوں سلام

উচ্চারণঃ সায়্যেদা যাহেদা তায়্যেবা তাহেরা
জানে আহমদ কী রাহত পেলাখো সালাম

অনুবাদঃ তিনি সৈয়্যদা, ইবাদত গুজারিনী, পূণ্যাত্মা-পবিত্র
নবী আহমদের প্রাণস্পন্দনের উপর লাখো সালাম।

পীর সৈয়্যদ খিজির হোসাইন চিশ্‌তী (পাকিস্তান) এর বাণী ঃ

اونچاهے سب سے مرتبه بنت رسول كا
پايا نهيں كسي نے بهي پايه بتول كا

উচ্চারণঃ উঁচাহে সবছে মরতবা বিন্‌তে রসূলকা
পায়া নেহী কেছিনে বীহ্ পায়া বতুল কা।

অনুবাদঃ নবী নন্দীনির মর্যাদা সবার উপরে
ফাতেমার বতুলের সমমর্যাদা কেউই পায়নি।

حوروں نے خضرشوق سےغازه بناليا
امّ حسين زهرا كے قدموں كي دهول كا

উচ্চারণঃ হুরোনে খিজিরে শৌকছে গাযা বানা লিয়া
উম্মে হুসাইন যাহ্‌রা কী কদমো কী দুলো কা।

অনুবাদঃ হে খিজির (কবি)! বেহেশ্‌তী হুরেরা ইমাম হোসাইন জননী ফাতেমার কাদমের ধূলাকে প্রসাধনী বানিয়ে নিলেন।

আল্লামা কবি ইকবাল এর বাণী ঃ

مریم ازیك نسبت عیسا عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

উচ্চারণঃ মরিয়ম আয্ এক নিসবত ঈসা আযিয
আয়ছে নিসবত হযরত যাহ্‌রা আযিয।

نور چشم رحمة للعالمین آں امام اوّلین وآخرین

উচ্চারণঃ নূরে ছশমে রাহমাতুল্লীল আলামীন
আঁ ইমামে আউয়্যালিন ওয়া আখেরীন।

بانوے آں تاجدار هل اتي مرتضے مشکلکشا، شیرخدا

উচ্চারণঃ বা নূরে আঁ তাজাদারে হাল আতা
মরতুদ্বায়ে মুশকিল কোশা শেরে খোদা।

مادرآں مرکز پر کارعشق مادار آں قافله سالار عشق

উচ্চারণঃ মাদর আঁ মরকজে পুর কারে এশক্
মাদর আঁ কাফেলা সালারে এশক্।

অনুবাদঃ হযরত মরিয়ম (আলাইহাস সালাম) এক দিক দিয়ে তথা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর আম্মাজান হবার প্রেক্ষিতে জগতবাসীর নিকট সম্মানিত ও পরিচিত হয়েছেন। আর হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তিন দিক দিয়ে সম্পর্কের কারণে অধিকতর সম্মানিতা হয়েছেন।

প্রথমতঃ তিনি ইমামুল আওয়্যালীন ওয়াল আখেরীন হুজুর রাহমাতুল্লীল আলামীন এর কলিজার টুকরা নয়নমনি।

দ্বিতীয়তঃ 'তাজেদারে হাল আতা আলাল ইনসানে দাহ্‌রুন' (কোরআন শরীফের এ আয়াত) যাঁর শানে নাযিল হয়েছে, তিনি সেই হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পবিত্রতম স্ত্রী।

তৃতীয়তঃ ইশ্‌ক এবং মুহব্বতের মধ্যমনি হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইশ্‌ক ও মুহব্বতের সেনাপতি হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)এর আম্মাজান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম মোবারক ঃ

তাঁর পবিত্র নাম ফাতেমা (فاطمه)। এর অর্থ উদ্ধারকারিনী, পৃথককারিনী । ইবনে দরীদ বলেন,

وَالْفَاطِمَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفَطْمِ وَهُوَ الْقَطْعُ اَيِ الْمَنْعُ يُقَالُ فَطَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ اِذَا قَطَعَتْ عَنْهُ اللَّبَنَ.

অর্থাৎ- فاطمة শব্দটি فطم শব্দ হতে গঠিত, অর্থ পৃথককারিনী। কোন মহিলা (সময়ের পূর্বে) যখন তাঁর সন্তানকে দুগ্ধপান হতে ছাড়িয়ে নেয় তখন উক্ত কথা ব্যক্ত করে।

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নামকরণের রহস্য ঃ

হযরত ফাতেমাকে এই নামে নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে-

প্রথমতঃ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَطَمَهَا عَنِ النَّارِ

অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে পৃথক করেছেন।[১]

দ্বিতীয়তঃ হযরত দাইলামী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا عَنِ النَّارِ.

অর্থাৎ- হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে এনামে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে; কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর ভক্তদেরকে জাহান্নাম হতে পৃথক করেছেন।[২]

তৃতীয়তঃ বয্যার, আবু ইয়ালা, তাবরানী ও হাকেম সকলই হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

টীকা- ১ ঃ এস্‌কাবুর রাগেবীন ৮৪ পৃষ্ঠা
টীকা- ২ ঃ মুসতাদারাক হাকেম ১৫২ পৃষ্ঠা, আস্-সাওয়ায়েকুল মুহরেকা ১৮৮ পৃষ্ঠা

اِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَافَحَرَّمَهَا اللّٰهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ

অর্থাৎ- নিশ্চয় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর চরিত্রের আঁচল পবিত্র রেখেছেন, ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর বংশধরদেরকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিলেন।[১]

চতুর্থতঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করেন যে, হুজুর আপনার সাহেবজাদীর নাম ফাতেমা কেন রাখা হয়েছে? প্রদুত্তরে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর আওলাদ হতে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনকে দূরীভুত করেছেন। এজন্য তাঁর নাম ফাতেমা রাখা হল।[২]

ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রসিদ্ধ উপাধিসমূহের স্বকীয়তাঃ

প্রথম উপাধি সৈয়্যাদাতু নেসায়িল আলামীনঃ

সৈয়্যাদাতু নেসায়িল আলামীন তথা জগত রমনীদের সরদারনী। যদিও বিভিন্ন হাদিসে হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত মরিয়ম (আলাইহাস সালাম), হযরত আছিয়া (আলাইহাস সালাম) এর ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে যে, তাঁরাই রমনী জগতের সরদারনী। ঐ বর্ণনাসমূহের মধ্যে বিবি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সহ উপরোল্লেখিত তিন জনের নাম মোট চার জনের নাম পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত-

سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ :مَرْيَمُ وفَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ

(رواه حاكم واحمد)

দ্বিতীয়তঃ হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে-

خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰسِيَةُ إِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ

(رواه حاكم وابو نعيم والطبرى والطحاوى والترمذى)

টীকা-১ ঃ মুস্‌তাদারাক হাকেম ১৫২ পৃষ্ঠা, আস্‌সাওয়ায়েকুল মুহরেকা ১৮৮ পৃষ্ঠা
টীকা-২ঃ যখায়েরুল উক্‌বা-ইমাম তবরী ২৬ পৃষ্ঠা

তৃতীয়তঃ হযরত উরওয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসে বর্ণনায় এসেছে-

خَدِيْجَةُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَمَرْيَمُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَفَاطِمَةُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا

(فيض القدير- مسند فاطمة الزهراء للامام السيوطى)

অর্থাৎ হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সমকালীন জগতের রমনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সমকালীন রমনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জগতের রমনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ- কিয়ামত পর্যন্ত কোন নারী তাঁর সমতুল্য হবে না। তিনিই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন আছেন। আর বেহেস্তের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব আপন আপন স্তর ও মর্যাদা অনুযায়ী।

চতুর্থতঃ এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসালাম) এরশাদ করেন,

يَافَاطِمَةُ الَا تَرْضِيْنَ أَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (مسند فاطمة ص ١٤٠)

অর্থাৎ- ওগো আমার কন্যা ফাতেমা! তুমি কি সন্তুষ্ট হবে না যে, তুমি জগতরমনীদের সরদারনী হিসেবে মনোনীত হয়েছ।

এরপরেও হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা নেই। এ জন্য তাঁর উপাধি সায়্যিদাতু নেসায়ি আলাল আলামীন।

দ্বিতীয় উপাধি যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু) ঃ

زهرا (যাহ্‌রা) এর অর্থ ফুলের কলি। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বেহেস্তের ফুলের কলি ছিলেন। যেহেতু তাঁর পবিত্র শরীর মোবারক হতে বেহেস্তের খোশবু পাওয়া যেত। যার কারণে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লাম) তাঁর শরীর মোবারক থেকে বেহেস্তের খোশবু নিতেন। এনামে পাকের হাকিকত জ্ঞাতার্থে নিম্নোক্ত প্রমান্য দলীলগুলো প্রনিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ ইমাম সূয়ূতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর রচিত কিতাব খাছায়েসুল কোবরার মধ্যে বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটাই যে,

أبْنَتُهُ فَاطِمَةُ اَنَّهَا كَانَتْ لاَ تَحِيْضُ وَكَانَتْ اذا وَلَدَتْ طَهُرَتْ مِنْ نفاسها بَعْدَ سَاعَةٍ حَتّٰى لاَ تَفُوْتَهَا صَلاَةٌ وَكَذَالِكَ سُمِّيَتْ الزَّهْرَاءَ

(الشرف المؤبّد ص ٧٥ ـ ٧٤)

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নুরানী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মহিলাদের ঋতু (মাসিক) থেকে পবিত্র ছিলেন এবং তাঁর সন্তান হবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে নেফাস হতে পাক হয়ে যেতেন। ফলে তাঁর কোন এক ওয়াক্ত নামায ছুটে যেত না। একারণে তাঁর পবিত্র নাম যাহ্‌রা রাখা হয়েছে।[১]

দ্বিতীয়তঃ ইমাম নাসায়ী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَّ اِبْنَتِيْ فَاطِمَةَ حُوْرَاءُ أَدَمِيَّةٌ لَمْ تَحِضْ وَلَمْ تَطْمُثْ

(الشرف المؤيد ص ٧٤ مسند فاطمة ص ١٣٧)

অর্থাৎ আমার এ কন্যা মানবীয় হুর, যিনি হায়েয (মাসিক ঋতু) ও নেফাস (সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয়) থেকে পবিত্র।[২]

একারণে তাঁকে খাতুনে জান্নাত বা স্বর্গীয় রমনী বলা হয়। যেহেতু স্বর্গীয় রমনীরা হায়েয ও নেফাস হতে পুতঃপবিত্র।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে ব্রেরলভী (রাঃ) বলেন-

کیا بات اس چمنستان کرم کي

زهرا هے کلي جس مي حسين اور حسن پهول

উচ্চারণঃ কিয়া বাত উস ছমনছ তানে করম কী
যাহ্‌রা হে কলী জিস্‌মে হোসাইন আউর হাসানো ফুল।

অনুবাদঃ এ বখ্‌শীষের বাগানের সম্পর্কে আর কি কথা বলবে, যে বাগানের ফুলের কলি হলেন, হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আর ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঐ বাগানেরই ফুল।

টীকা-১ঃ আশ্ শরফুল মুয়াইয়েদ ৭৪, ৭৫ পৃঃ
টীকা-২ঃ আশ্ শরফুল মুয়াইয়েদ ৭৪ পৃঃ, মসনদে ফাতেমা ১৩৭ পৃঃ

তৃতীয়তঃ 'যাহ্‌রা' এর অর্থ অত্যন্ত সুন্দর, যা ফুলের ন্যায় সৌন্দর্য্যমন্ডিত। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে একারণে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে যে, হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর আম্মাজান উম্মে সুলাইম থেকে জিজ্ঞাসা করেন, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে যাহ্‌রা উপাধিতে কেন ডাকা হয়? প্রদুত্তরে হযরত উম্মে সুলাইম বলেন,

كَانَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ছিলেন, তাই।[১]

তৃতীয় উপাধি বতুল(রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) ঃ

بتول শব্দের অর্থ قَطَعَ الشَّيَ وَاَبَانَهُ عَنْ غَيْرِهِ

অর্থাৎ- কোন বস্তুকে অন্যবস্তু থেকে পৃথক করা অথবা পৃথক হওয়া। যেমন, কোরআনে করীমে আছে-

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً

অর্থাৎ দুনিয়া হতে পৃথক হয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে মিলিত হয়ে যাও।

এ নাম মোবারকের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হলো-

প্রথমতঃ যেহেতু হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সমসাময়িক মহিলাদের থেকে জ্ঞানে-গুনে, ধর্মে-বংশে, মর্যাদায় ও সম্মানে এবং ক্ষমতায় পৃথক ও অনন্যময়ী হয়েছেন; এ কারণে তাঁকে বতুল উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ এছাড়া তিনি দুনিয়ার মোহ, শান-শওকত ইত্যাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র রেজামন্দির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন; এজন্য তাঁকে বতুল বলা হয়।

তৃতীয়তঃ বতুল অর্থ অতুলনীয়, উপমা ও নজিরবিহীন। যেমন ওবাইদাতুল হারবী ও ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন-

سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ بَتُوْلاً لِاَنَّهَا بَتَلَتْ عَنِ النَّظْرِ

অর্থাৎ যেহেতু হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কোন তুলনা নেই বিধায় তাঁর নাম বতুল রাখা হয়েছে।[২]

টীকা-১ঃ মুসতাদারিক হাকেম ৩য় খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা, সফিনায়ে নূহ ১৫০ পৃঃ
টীকা-২ঃ আলে রসূল ২৭০ পৃষ্ঠা

চতুর্থ উপাধি তাহেরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা)ঃ

طاهرة অর্থ শারীরিকভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীনি। যেহেতু তিনি শরীরিকভাবে নারীদের প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন মাসিক (ঋতু), নিফাস (সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত প্রবাহিত হয়) ইত্যাদি এবং পাশাপাশি চরিত্র, উজ্জত, সম্মানহানিকর কর্মকান্ড থেকে পুতঃপবিত্র। এজন্য তাহেরা নামে তিনি ভূষিত। উপরন্তু 'আয়াতে তাতহীর' [১] এর মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অন্তর্ভূক্ত বিধায় তাঁর নাম তাহেরা হয়েছে।

পঞ্চম উপাধী যাকিয়্যা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) ঃ

زكية যাকিয়্যা। এর অর্থ আত্মিক দিক দিয়ে পবিত্রতা অর্জনকারিনী। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী কন্যা হবার কারণে ফয়জানে নবুয়তের বদৌলতে আত্মার দিক দিয়ে তিনি পুতঃপবিত্র। এজন্য তাকে যাকিয়্যা বলা হয়।

উপাধি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরনীঃ[২]

১। ফাতেমা (فاطمة) - উদ্ধারকারীনি, পৃথককারীনি।[৩]

২। যাহ্‌রা (زهراء) - ফুলের কলি, অত্যন্ত সুন্দর।

৩। বতুল (بتول) - অতুলনীয়, নজির বিহীন, পৃথক হওয়া।

৪। সৈয়্যদা (سيدة) - সরদারনী।

৫। মসতুরা (مستورة) - পর্দানসিনী।

৬। মা'সুমা (معصومة) - গুনাহ বা পাপ হতে পবিত্র।

৭। মরহুমা (مرحومة) - আল্লাহ-রাসূলের পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া প্রাপ্তা।

টীকা-১ ঃ কোরআনের বাণী

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(সূরা আহযাব ২১ পারা)

টীকা-২ ঃ মজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রসূল (দঃ) ৩০ পারা ১২/১৩ পৃষ্ঠা

টীকা-৩ ঃ এটা তাঁর মুলনাম।

৮। রাকেয়া (راكعة)- আল্লাহর দরবারে নামাযের মাধ্যমে অধিক রুকূকারী।

৯। সাজেদা (ساجدة) - আল্লাহর দরবারে নামাযে সিজদার মাধ্যমে বন্দনাকারী।

১০। সায়েমা (صائمة) - ফরয রোযা সহ সর্বাধিক নফল রোযা পালনকারী।

১১। ছানেয়া (صانيه) - ইসলাম ও দ্বীনের জন্য খেদমতকারী।

১২। দামেয়া (داميه) - ইসলামের জন্য পবিত্র রক্ত দানকারীনি।[১]

১৩। মুখাদ্দারা (مخدرة) - পর্দানসিনী, যাঁকে পর্দার মধ্যে রাখা হয়েছে।[২]

১৪। যাহেদা (زاهدة) - দুনিয়ার চাকচিক্য ও মোহ হতে বিরাগভাজিনী।

১৫। আবেদা (عابدة) - আল্লাহর দরবারে এবাদতকারীনি।

১৬। অলিয়্যা (وليـة) - আল্লাহর নেক বন্দিনী-যাদের কাছে বেলায়তী ক্ষমতা আছে।[৩]

১৭। ওফিয়া (وفيه) - ওয়াদা পূর্ণকারী।

১৮। বকিয়্যা (بقـيـة) - স্থায়ীভাবে ধারণকারীনি,[৪] বংশ মোবারক স্থাপনকারীনি।

১৯। আদ্‌ফিয়্যা (ادفية) - আল্লাহর ঐশ্বী বাণী ও সত্য কথা শ্রবণকারীনি।

২০। তকিয়্যা (تقية) - পরহেযকারীনি।

২১। যাকিয়্যা (زاكية) - আত্মার দিক দিয়ে পুতঃপবিত্র।

২২। রাজিয়া, রাদ্বিয়া (راضية) - আল্লাহ-রাসূলের কর্মকান্ডে এবং ফয়সালাতে সন্তুষ্টময়ী।

টীকা-১: যা সরাসরিভাবে বা সন্তানদের শাহাদাতের মাধ্যমেও হয়ে থাকে।

টীকা-২: কুদরতীভাবে যার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা এবং শান আল্লাহ তায়ালা লুকায়িত রেখেছেন।

টীকা-৩: এটা ولى শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ।

টীকা-৪: নাম-কর্ম, বংশ মর্যাদা, সম্মান উভয় জগতে স্থায়ীভাবে ধারণকারী। অথবা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশ মোবারক স্থাপনকারীনি।

২৩। মরজিয়া, মরদ্বিয়া (مرضية) - যাঁকে বিভিন্ন নেয়ামত ও মর্যাদা দিয়ে রাজি করা হয়েছে।

২৪। হুলিয়্যা (حلية) - সৎকর্ম অর্জনকারীনি, বদলা গ্রহণকারীনি, মিষ্টভাষিনী, বেহেস্তের অলংকার সজ্জিতা, তক্বওয়া ও পরহেযগারীর সৌন্দর্য অর্জনকারীনি।

২৫। আলিয়্যা (علية) - উঁচু মর্যাদাময়ী, মহিয়সী, মহিমাময়ী।[১]

২৬। ছফিয়্যা (صفية) - পূতঃ পবিত্রময়ী।[২]

২৭। সলিমা (سليمة) - শান্তি প্রাপ্তা, সালাম প্রাপ্তা।[৩]

২৮। হালিমা (حليمة) - ধৈর্য্যশীলা ও গাম্ভীর্যময়ী।

২৯। রক্বিয়্যা (رقـــية) - সর্বদিক দিয়ে উন্নীতা, উন্নয়নশীলা, উত্তীর্ণতা অর্জনকারীনি।

৩০। হাসিবা (حسيبة) - স্বজ্ঞান, হিসাবকারীনি, ধারণাকারীনি, সওয়াবের উদ্দেশ্যকারীনি।

৩১। নসিবা (نسيبة) - সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সম্পর্ককারীনি।

৩২। জমিলা (جميلة) - রূপে-গুনে-আমলে ও আদর্শে সব দিক দিয়ে সুন্দরী।

৩৩। হাবিবা (حبيبة) - আল্লাহ্ -রাসূল ও জগতের আদর্শের মধ্যে প্রিয়া।

৩৪। হাসানিয়্যা (حسنية) - হাসনী বংশের মধ্যমনি, ভাল ও তক্বওয়ার উৎস।

৩৫। মুশফেক্বা (مشفقة) - আদবকারীনি (আওলাদদের ও গুনাগার উম্মতদের), গরীব মিসকিন ও সৃষ্টি জগতকে।

৩৬। সালিহা (صالحة) - সৎ- পূণ্যবতী বন্দিনী, সঠিক-সচ্ছ কর্ম সম্পাদনকারীনি, দৈহিক ও আত্মিক কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদনকারীনি।

টীকা-১: যা সর্বদিক দিয়ে প্রযোজ্য।

টীকা-২: জাহের ও বাতেনের দিক দিয়ে, চরিত্র ও আমলের দিক দিয়ে, ব্যবহার ও সম্পর্কের দিক দিয়ে পাক পবিত্রময়ী।

টীকা-৩: সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে সহি-ছালামত প্রাপ্তা।

৩৭। সলিহা (صلحة) - অধিক সৎ কর্মকারীনি।

৩৮। সবিহা (صبيحة) - প্রত্যুষে আল্লাহর ইবাদত ও বন্দনাকারীনি, উজ্জ্বল ও সুন্দর আদর্শময়ী।

৩৯। মুসাব্বিহা (مسبحة) - তাস্বীহ্ পাঠকারীনি।

৪০। মুজাদ্দেদা (مجددة) - সংস্কারকারীনি।

৪১। মুহাম্মদদা (محمددة) - সর্ব দিক দিয়ে অনেক প্রশংসিতা।

৪২। মুহাচ্ছেলা (مـحـصـلة) - আল্লাহ্ -রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনকারীনি, অধিক সওয়াব অর্জনকারীনি।

৪৩। মুকাব্বেরা (مكبـــرة) - আল্লাহর নামের অনেক মহত্ব বর্ণনাকারীনি, ইবাদত-বন্দেগী ও নামাজের মধ্যে আল্লাহর নামে তক্বীর পাঠকারীনি।

৪৪। ক্বারেয়া (قارية) - কুরআন ও যিকির আয্কার পাঠকারীনি।

৪৫। জারেয়া (جارية) - আল্লাহ তা'য়ালার অনন্য বন্দিনী।

৪৬। ফযিলা, ফদ্বিলা (فضيلة) - অনেক মর্যাদার অধিকারী, মর্যাদাময়ী।

৪৭। ওসিলা (وسيلة) - উম্মতে মুহাম্মদীর মুক্তির জন্য অনন্য মাধ্যম।

৪৮। নসিবা (نصيبة) - পদ মর্যাদাশীল, নেয়ামতশালীনি।

৪৯। নজিবা (نجيبة) - সম্ভ্রান্ত।

৫০। শরিফা (شريفة) - ভদ্র, সম্মানিতা ও মর্যাদাময়ী।

৫১। করিমা (كريمة) - সম্মানিতা, দানশীলা।

৫২। মুকাররমা (مكرمة) - মহা মর্যাদাময়ী (আল্লাহ- রাসূলের পক্ষ থেকে)।

৫৩। আলেমা (عالمة) - জ্ঞানময়ী।

৫৪। ফাতেহা (فـاتحـة) - উদ্বোধনকারীনি, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরানী বংশের এবং নবূয়তের পরে বেলায়তের দ্বার উন্মোচনকারীনি।

৫৫। মুহ্নাযামা (محنزمة) - সর্ব দিক দিয়ে সম্মানিতা।

৫৬। মুয়াম্মা (معمة) - ধাঁ ধাঁ যুক্ত, যার মূল ও গভীরতা ধাঁধাঁর ন্যায় অস্পষ্ট।

৫৭। মুয়াল্লামা (معلمة) - শিক্ষিতা, শিক্ষয়িত্রি (জাহের ও বাতেনীভাবে)।

৫৮। দা'য়েয়া (داعـــيـــة) - আহ্বানকারীনি, আদর্শ ও বুজুর্গীর মাধ্যমে আহ্বানকারীনি।

৫৯। শাফেয়া (شافعة) - সূপারিশকারীনি (উম্মতে মুহাম্মদীকে সুপারিশ করে পার করে নিবেন)।

৬০। শফিয়া (شفيعة) - যাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য।

৬১। আমিয়্যা (أمية) - মুসলিম জাহানের মাতৃত্বের অধিকারীনি।
৬২। তাহিয়্যা (تحية) - সম্মানিতা।
৬৩। নাছেহা (ناصحة) - উপদেশ দানকারীনি।
৬৪। রাহেজা (راجحة) - প্রাধান্য বিস্তারকারীনি।
৬৫। অহিয়্যা (وحية) - সম্রাজ্ঞী, আখিরাতের পাথে সহসা গমনকারীনি।
৬৬। শহিয়্যা (شهية) - পছন্দীদা (আল্লাহ- রাসূল ও ঈমানদারের অথবা আল্লাহ- রাসূলের রেজামন্দি অন্বেষণী), কষ্টের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগী করার আগ্রহ প্রকাশকারীনি।
৬৭। জাহেদা (جاهدة) - ইবাদত বন্দেগীতে অনেক কষ্ট স্বীকারকারীনি।
৬৮। মুহ্‌তাহেদা (محتهدة) - অধিক গবেষণাকারীনি।
৬৯। রাক্বেয়া (راقية) - উন্নতি অর্জনকারীনি।
৭০। নাছেয়া (ناصية) - অধিক ভাগ্যবর্তী, সৌভাগ্যশালীময়ী।
৭১। আউছেয়া (اوصية) - অসিয়তকারীনি- যাঁর জন্য অসিয়ত করা হয়েছিল।
৭২। খাবেরা (حاورة) - শারিরিক দিক দিয়ে দূর্বল, (অনেক রোজা ও অনাহারের কারণে)।
৭৩। খাযেরা, খাদ্বেরা (خاضرة) - উপস্থিত, হাজির (আল্লাহর ডাকে সদা সর্বদা হাজির অর্থাৎ ঠিক সময়ে নামাজ আদায়কারীনি)।
৭৪। ওয়াকেয়া (واقية) - রক্ষা কারীনি, (আউলাদ ও উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে দুনিয়া -আখিরাতের সকল ধ্বংসাত্মক পথ থেকে রক্ষাকারীনি)।
৭৫। দাফেয়া (دافية) - গরম পোশাক পরিধানকারীনি (বুজুর্গীর ও বেহেশ্‌তের)
৭৬। ছাহেবা (صاحبة) - মহান বুজুর্গীর কারণে দুনিয়া আখিরাতের মহিলাদের নেতৃত্বের অধিকারীনি।
৭৭। খাবেরা (خاورة) - সর্বদা আল্লাহ-রাসূল সম্পর্কে আলোচনাকারীনি।
৭৮। ওয়াজেদা (واجدة) - আল্লাহর মহান নেয়ামতের অধিকারীনি।
৭৯। আক্বেবা (عاقبة) - কনিষ্ঠা (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরানী ছাহেবজাদীদের মধ্যে), হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আখিরাতে পদার্পনকারীনি।
৮০। সামেয়া (صامية) - দুঃখে-সুখে-ভোগে ধর্য্য ধারনের মাধ্যমে নিশ্চুপকারীনি।

নাম মোবারক প্রসঙ্গ

হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ৮০টি নাম রয়েছে। এ নাম মোবারকের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলে পাঠক সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার আশংকার দিকে দৃষ্টিপাত করে সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সামগ্রীক জীবনের কিছু ইতিবৃত্ত প্রকাশের প্রয়াস রেখে নাম মোবারক সমূহের ব্যাখ্যার দিকে বেশি যাইনি। শুধুমাত্র সকলের জ্ঞাতার্থে ৮০টি নামের সংক্ষিপ্ত অর্থ উপস্থাপিত হলো। যাতে সংক্ষেপে সৈয়্যদা যাহ্‌রা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শান-মান, মর্যাদা-মহিমা সম্পর্কে সমক ধারনা লাভ করা যায়। আর হযরত যাহ্‌রা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ৮০টি নাম মানে ৮০টি জীবন। তাঁর এ ৮০টি নাম মোবারকের ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হলে ৮০টি নামের জন্য ৮০টি জীবনী গ্রন্থ হবে। বর্তমান সমাজে কিন্তু এটার মূল্যায়ন খুব কমই হবে বলে আমার ধারণা। কেননা দ্বীন-ধর্মের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ মায়া-মুহব্বত শুধুমাত্র প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে পালনীয় কর্তব্যাদি আদায়ে কসুর বা অবহলো করা হচ্ছে সেখানে আর কিবা নফলের মর্যাদা। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রত্যেককে হেদায়ত নসিব করুন। আমীন। এখানে শুধু পাঠকদের সামনে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় মর্যাদা সমূহের মহামহীম মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে জ্ঞাত হবার জন্য এ কথাগুলো পেশ করলাম।

সুতরাং আমাদের উচিত হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শান-মান সম্বলিত কিতাব, প্রবন্ধ, রচনার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও তাঁর নূরানী তাওয়াজ্জুহ হাসিল করে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতে সম্মানিত ও সৌভাগ্যশীল হই এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কামিয়াব হাসিলে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীন ও মাযহাবের খেদমতে আত্মনিয়োগ করি । আমিন।

তৃতীয় অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর নসব মোবারক
পিতার দিক দিয়ে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশনামা ঃ

(١) حضرت فاطمة رضي الله عنها

(٢) بنت حضرت محمّد صلّى الله عليه وسلم

(٣) ابن حضرت عبد الله عليه السلام

(٤) ابن حضرت عبد المطلب عليه السلام

(٥) ابن حضرت هاشم عليه السلام

(٦) ابن حضرت عبد مناف عليه السلام

(٧) ابن حضرت قصى عليه السلام

(٨) ا بن حضرت كلاب عليه السلام

(٩) ابن حضرت مرّه عليه السلام

(١٠) ابن حضرت كعب عليه السلام

(١١) ابن حضرت لؤى عليه السلام

(١٢) ابن حضرت غالب عليه السلام

(١٣) ابن حضرت فهر عليه السلام

(١٤) ابن حضرت مالك عليه السلام

(١٥) ابن حضرت النضر عليه السلام

(١٦) ابن حضرت كنانة عليه السلام

(١٧) ابن حضرت خزيمة عليه السلام

(١٨) ابن حضرت مدركة عليه السلام

(١٩) ابن حضرت الياس عليه السلام

(٢٠) ابن حضرت مضر عليه السلام

(٢١) ابن حضرت نزار عليه السلام

(٢٢) ابن حضرت معدّ عليه السلام

(٢٣) ابن حضرت عدنان عليه السلام

(٢٤) ابن حضرت ادد عليه السلام

(٢٥) ابن حضرت هميسع عليه السلام

(٢٦) ابن حضرت سلامن عليه السلام

(٢٧) ابن حضرت نابت عليه السلام

(٢٨) ابن حضرت حمل عليه السلام

(٢٩) ابن حضرت قيذار عليه السلام

(٣٠) ابن حضرت إسماعيل عليه السلام

(٣١) ابن حضرت إبراهيم عليه السلام

(٣٢) ابن حضرت تارح عليه السلام

(٣٣) ابن حضرت ناحور عليه السلام

(٣٤) ابن حضرت شالخ عليه السلام

(٣٥) ابن حضرت أرغو عليه السلام

(٣٦) ابن حضرت فالغ عليه السلام

(٣٧) ابن حضرت غابر عليه السلام

(٣٨) ابن حضرت راعو عليه السلام

(٣٩) ابن حضرت أرفخشد عليه السلام

(٤٠) ابن حضرت سام عليه السلام

(٤١) ابن حضرت نوح عليه السلام

(٤٢) ابن حضرت لامك عليه السلام

(٤٣) ابن حضرت متوشلح عليه السلام

(٤٤) ابن حضرت اخنوخ (آدريس) عليه السلام

(٤٥) ابن حضرت يارد (يرد) عليه السلام

(٤٦) ابن حضرت مهلائيل عليه السلام

(٤٧) ابن قحضرت ينان عليه السلام

(٤٨) ابن حضرت أنوش عليه السلام

(٤٩) ابن حضرت شيث عليه السلام

(٥٠) ابن حضرت أدم عليم السلام.

পিতার দিক দিয়ে বংশনামা ঃ

বাংলা উচ্চারণঃ হযরত ফাতেমা বিন্‌তে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইব্‌নে হাশেম ইব্‌নে আবদে মনাফ ইব্‌নে কুসাই ইব্‌নে কেলাব ইব্‌নে মুররাহ ইব্‌নে কা'ব ইব্‌নে গালিব ইব্‌নে ফিহ্‌র, ইব্‌নে মালেক ইব্‌নে নছর ইব্‌নে কেনানাহ ইব্‌নে খুযাইমা ইব্‌নে মুদরেক ইব্‌নে ইলিয়াছ ইব্‌নে মুযর ইব্‌নে নযার ইব্‌নে মা'দ ইব্‌নে আদ্‌নান ইব্‌নে উদাদ ইব্‌নে হামিসা ইবনে সালামান ইব্‌নে নাবত ইব্‌নে হামল ইব্‌নে ক্বায়যার ইব্‌নে ইসমাইল ইব্‌নে ইব্রাহিম ইব্‌নে তারেহ ইব্‌নে নাখুর ইব্‌নে শালাখ্‌, ইব্‌নে আরগু ইব্‌নে ফালেগ ইব্‌নে গাবার ইব্‌নে রা'উ ইব্‌নে আরফাখশাদ ইব্‌নে সাম ইব্‌নে নূহ ইব্‌নে লামাক, ইব্‌নে মুতাওশশিলাহ্‌ ইব্‌নে আখ্‌নুখ (ইদ্রিস) ইব্‌নে ইয়ারিদ (ইয়ারদ) ইব্‌নে মাহলায়িল ইব্‌নে ক্বায়নান ইব্‌নে আনূশ ইব্‌নে শীষ ইব্‌নে আদম আলাইহিমুস সালাম।[১]

মায়ের দিক দিয়ে বংশনামা ঃ

ফাতেমা বিন্‌তে খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বিন্‌তে খোয়াইলাদ ইব্‌নে আসদ ইব্‌নে আবদুল উজ্জা ইব্‌নে কুসাই ইব্‌নে কেলাব ইব্‌নে মুররাহ ইব্‌নে কা'ব ইব্‌নে গালিব ইব্‌নে ফিহ্‌র ইব্‌নে মালেক ইব্‌নে নছর ইব্‌নে কেনানাহ ইব্‌নে খুযাইমা ইব্‌নে মুদরেক ইব্‌নে ইলিয়াছ ইব্‌নে মুযর ইব্‌নে নফর ইব্‌নে মা'দ ইব্‌নে আদ্‌নান ইব্‌নে উদাদ ইব্‌নে হামিসা ইব্‌নে সালামান ইব্‌নে নাবত ইব্‌নে হামল ইব্‌নে ক্বায়যার ইব্‌নে ইসমাইল ইব্‌নে ইবরাহিম ইব্‌নে তারেহ ইব্‌নে নাখুর ইব্‌নে শালাখ ইব্‌নে আরগু ইবনে ফালেগ ইব্‌নে গাবার ইব্‌নে রা'উ ইব্‌নে লামাক ইব্‌নে মুতাওশশিলাহ্‌ ইব্‌নে আখ্‌নুখ(ইদ্রিস) ইব্‌নে ইয়ারিদ(ইয়ারদ) ইব্‌নে মাহ্‌লায়িল ইব্‌নে ক্বায়নান ইব্‌নে আনূশ ইব্‌নে শীষ ইব্‌নে আদম আলাইহিমুস সালাম।

টীকা ১ ঃ বাছায়েরে যাবিত তামিয, ২য় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা, মজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্ম মোবারক জন্মসাল প্রসঙ্গ ঃ[১]

প্রথমতঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুয়ত প্রকাশের এক বছর পূর্বে,
দ্বিতীয়তঃ নবুয়ত প্রকাশের এক বছর পর ৪১তম বছরে,
তৃতীয়তঃ নবুয়ত প্রকাশের ৫ বছর পূর্বে,[২] হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শুভাগমন হয়।
বিশুদ্ধমতে, নবুয়তের ৪১তম বছরে সৈয়্যদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্ম হওয়াটা সাব্যস্থ।

জন্ম মোবারকের অলৌকিকত্ব ঃ

বেহেস্ত থেকে মহিয়সীদের আগমনঃ

হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শুভ জন্ম মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে আসল তখন আম্মাজান খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে জানালেন যে, তাঁর প্রসবকালীন সময় অত্যাসন্ন; তাদের রমনীরা যেন তাঁর (খাদিজা) এই প্রসবকালীন মুহূর্তে সেবার জন্য চলে আসে। কোরাইশ রমনীরা প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, হে খদিজা! আপনি তো আমাদের কথা না শুনে আব্দুল্লাহ্‌র এক এতিমের বিবি হয়েছ (?); তাঁকে আমিরদের[৩] উপরে প্রধান দিয়েছ। এজন্য আমরা তোমার সহযোগিতার জন্য আসতে পারি না। তাদের এহেন বক্তব্য শুনে আম্মাজান খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ভীষণ দুঃখ পেলেন এবং চিন্তিত অবস্থায় কঠিন সময়ের মুখোমুখে হচ্ছেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে তিনি দেখতে পেলেন যে, সুন্দরতম দীর্ঘদেহী চার আলোকজ্জ্বল রমনী প্রফুল্ল চিত্তে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন এবং বনী হাশেমের ললনাদের[৪] ন্যায় তাঁর সাথে হাস্যোজ্জ্বল আলাপ চারিতায় মিলত হলেন।

টীকা-১ ঃ সূত্রঃ ইস্তিয়াব, হাশিয়ায়ে বুখারী, খুতবাতে মুহররম, যখায়েরুল উক্‌বা।
টীকা-২ ঃ যে বছর খানায়ে কাবা কোরাইশ কর্তৃক পূনঃনির্মিত হয়।
টীকা-৩ ঃ এখানে আমির বলতে কোরাইশের অন্যান্য যুবক বা সরদার উদ্দেশ্য।
টীকা-৪ ঃ ললনা অর্থ- মহিলা, রমনী।

এতে হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে তন্মধ্যে একজন বললেন, হে খদিজা! আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপনার সাহায্যে বেহেস্ত থেকে প্রেরণ করেছেন। আমরা হলাম আপনার বোন। আমাদের পরিচয় হলো, তন্মধ্যে একজন করে বললেন, আমি বিবি সারা (হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর স্ত্রী), আমি বিবি মরিয়ম (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আম্মাজান), আমি কুলসুম (হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর বোন), আমি আছিয়া (ফেরআউনের স্ত্রী যিনি ঈমানদার ছিলেন)। আর অন্যান্যরা এসেছেন বেহেস্ত থেকে; তাঁরা হচ্ছেন বেহেস্তের আপনার সাথীরা। এদের মধ্যে চার জন হযরত খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চার পার্শ্বে বসে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হলেন এবং অন্যরা বিভিন্ন জিকির আজকার করতে লাগলেন। এই শুভ মুহূর্তের মধ্যে হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এ ধরায় শুভাগমন হল।[১]

সমগ্র বিশ্বে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরনঃ

এ ধরাপৃষ্ঠে তাঁর নূরানী অস্তিত্ব মোবারকের আগমনের সাথে সাথে তাঁর নূরে পাকের জ্বলকে ঘর আলোকিত হয়ে গেল এবং তাঁর নূরের আলোক রশ্মি মক্কায়ে মোয়াজ্জমার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছল। এমনকি পৃথিবীর চতুর্দিকে তাঁর নূরের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল; যেন রেসালতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গগনে নয়া চাঁদ উদিত হল এবং নবুয়তে আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফুল বাগিছায় নতুন ফুল প্রস্ফুটিত হল।[২]

বেহেস্তের সম্মানিত হুর ও পবিত্র পানি দ্বারা গোসল প্রদানঃ

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হুজরা মোবারকে বেহেস্তের ১০ জন হুর প্রেরন করেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিকট একটি করে তিনশত বা গোসল দেয়ার বড় বাটি এবং উজ্জ্বল, সৌন্দর্য মন্ডিত চাকচিক্য পানির মশক ছিল। প্রত্যেক মশক বেহেস্তের পানি দ্বারা ভর্তি ছিল। এরাই প্রত্যেকে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সম্মুখেই রেখে স্নান করিয়ে দিলেন। এরপর একটি শ্বেত বা সাদা কাপড়ে উত্তম খুশবু মিশ্রন করে এটা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে পরিধান করিয়ে দিলেন।

টীকা - ১, ২ ঃ রওজাতুশ শোহাদা, আলে রসূল, আর রওজুল ফায়েক ২৭৪ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মজালেস-২২৭ পৃষ্ঠা ২য় খন্ড

এরপর আরো একটি পবিত্র খোশবুদার রুমাল হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাথায় জড়িয়ে দিলেন। এভাবে পুতঃ পবিত্র অবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কোলে তুলে দিলেন। এবং বললেন, হে খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! আপনি এ পবিত্রা কন্যাকে গ্রহণ করুন এবং একথা বলে দোয়া করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকেও তাঁর আউলাদগণকে পুতঃপবিত্র রাখেন।

এভাবে অন্যান্য বিবিরাও খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শুভাগমনে মোবারবাদ জ্ঞাপন করেন। হযরত মা খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ নবাগতা পবিত্রময়ী স্বর্গীয়া পূর্ণাত্মা শিশু কন্যাকে তাঁর আপন খোলে স্বাদরে বরণ করে নিলেন।[১]

অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)ঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই স্বর্গীয়া চরিত্রময়ী অলৌকিক সম্পন্না কন্যা সন্তান পেয়ে অত্যধিক আনন্দিত হলেন। হবেন না বা কেন (?) যাঁর নবুয়তের গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন যে, এ সাহেবজাদী স্বীয় মর্যাদা ও মহত্বে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং ভবিষ্যতে দ্বীন ও ইসলামের জন্য অতুলনীয় কোরবানী দানকারী; এমনকি নারী জগতের আদর্শের প্রতীক হবেন। শহীদ জননী, বেলায়তের ঝর্ণা ধারার প্রস্রবন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধারার একমাত্র মাধ্যম, আহলে বাইতে রাসুলের মূল উৎস, পাক পাঞ্জাতনের উজ্জ্বল শশীরূপে পৃথিবীতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পদার্পন করেছেন।[২]

উম্মতে মুহাম্মদীর নাজাত ও মুক্তির দিশারীঃ

যাঁর মুহরানা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুক্তি ও নাজাত হিসেবে সাব্যস্থ।[৩] যাঁর মাধ্যমে নবুয়ত ও রেসালত এ দু'দরিয়ার মিলনের মাধ্যমে নূরানী দুই মনিমুক্তা লূ লূ-মারজান (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) আত্মপ্রকাশ করবেন।[৪] এজন্য হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাথে তাঁর নাম মোবারক রাখেন- 'ফাতেমা যাহ্‌রা।'[৫]

টীকা- ১. ২ ঃ রওজাতুশ শোহাদা-মোল্লা হোসাইন কাশেফী।
টীকাঃ-৩ হাদিসে কুদসী - جعلت شفاعت امة محمد صدا ق فاطمة সূত্রঃ আলে রসূল-১৭৭ পৃঃ,
টীকাঃ-৪ একথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان فبأى الاء ربكما تكذبان يخرج منها اللولو والمرجان -الرحمن ১৯-২২
তাফসীরে দূররে মনছুর-ইমাম সূয়ুতী (রাঃ)
টীকা- ৫ ঃ এ নামের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বেহেস্তী আপেল ভক্ষণই সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিাল্লাহু আনহা) এর জন্মের সূচনাঃ

ইমাম তবরী বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, জিব্রিল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট বেহেস্তের একটি সেফ নিয়ে আসল। এটা ভক্ষণ করার পর হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গর্ভে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আগমন হয়। হযরত খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, আমি যে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে গর্ভ ধারণ করি এটার কোন বাহ্যিক অনুমান, আলামত বা কষ্ট আমার অনুভব হয়নি।[১]

জন্মের পর ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রার্থনাঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) জমিনে শুভাগমনের পর পর সিজদায় পড়লেন এবং আঙ্গুল মোবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করেন; যেমনিভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন। এটা থেকে বুঝা যায় যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ায় এসে উম্মতকে স্মরণ করে 'রাব্বি হাবলী উম্মতি' বলেছেন এবং আল্লাহর শাহাদাতের সাক্ষী দিয়ে উম্মতের গুনাহ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তেমনিভাবে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আব্বাজানের সুন্নাত আদায়ে গুনাহগার উম্মতের শাফায়াতের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের স্বাক্ষী প্রদান করেছেন। যা উম্মতে মুহাম্মদীর নর-নারীর মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। আর পাশাপাশি আল্লাহর বন্দেগীর সর্বোচ্চ স্তর আল্লাহর দরবারে সিজদারত হওয়া। এই কর্মটি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এভবে এসে প্রথমেই আদায় করেন। যা তাঁর পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দরবারে মৌলিক এবাদত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[২]

সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্মের সুসংবাদ ঃ

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে বেহেস্তের কোন একটি ফল দেখার জন্য মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎক্ষণাৎ কুদরতীভাবে হযরত জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে বেহেস্ত থেকে দু'টি আপেল বা সেফ নিয়ে তাশরিফ এনে বললেন,

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উক্‌বা ৪৫ পৃষ্ঠা। টীকা-২ ঃ মাদারেজুন নবুয়ত

ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাকের এরশাদ- একটি ফল আপনি খাবেন এবং আরেকটি ফল হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে খাওয়াবেন। এতে আল্লাহ তায়ালা 'ফাতেমা যাহ্‌রা' নামে একজন নূরানী কন্যা সন্তান সৃষ্টি করবেন।[১]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা' (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম মোবারক হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত আর ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হচ্ছে বেহেস্তী ফলের মাধ্যমে সৃষ্ট, পুতঃপবিত্র। তিনি কোন সাধারণ মানব-মানবীর ন্যায় আসেননি; বরং তাঁর রুহ মোবারক হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গর্ভে আসার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বেহেস্তী ফল। এটাই সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্মের অনন্য অলৌকিক নিদর্শন।

গর্ভাবস্থায় সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গায়েবী সংবাদঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন হযরত মা খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র গর্ভে শুভাগমন করলেন, এ সময়ে আরবের কাফেরেরা বিশেষ করে আবু জাহেল এবং তার দলেরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে তাঁর অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করার আহবান জানান। একথা শুনে হযরত খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) চিন্তিত হয়ে পড়লে গর্ভাবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গায়েবীভাবে সুসংবাদ দিলেন যে, আম্মাজান! আপনি চিন্তিত হবেন না(!) এবং ভয় করবেন না। কেননা আমার সম্মানিত পিতাজান হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আল্লাহর তায়ালাই আছেন। এতে হযরত খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর মোজেজা প্রকাশের ঘটনা সত্যিই রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায় আশ্বস্থ ছিলেন।

পরিশেষে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার মোজেজা প্রকাশ পেল। এতে আরবের কাফেরদের সকল দূরভীসন্ধি ধূলিস্যাৎ হয়ে তাদের মুখে চুনকালি পড়ল। আর ইসলাম ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মোজেজা দেখে সকলে বিস্মিত হলো এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শান-মান ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেল।[২]

টীকা -১, ২ ঃ আর রাউজুল ফায়েক ২৭৪ পৃষ্ঠা, মৃত্যু ৮১০ হিঃ

বেহেস্তে আদম ও হাওয়া (আলাইহিমুস সালাম) কর্তৃক তাঁর দর্শন লাভঃ

ইমাম কসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত হাওয়া (আলাইহিস সালাম) কে যখন বেহেস্তের মধ্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর বাম পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃজন করে হযরত হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) এর মধ্যে ৭০জন হুরের সৌন্দর্য্য দেয়া হলো। "তখন হযরত হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) বেহেস্তের হুরদের মধ্যে তারাকারাজির সম্মুখে চন্দ্রের সমতুল্য" অর্থাৎ রূপে-গুনে অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁর মাঝে বিরাজ করছিল। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) নিদ্রাবস্থায় ছিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) অপরূপ এক সুন্দরী রমনী দেখে বিমোহিত হয়ে তাঁর দিকে মুহব্বতের হাত বাড়ালে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসল, মোহরানা আদায় করা ব্যতীত এটা হালাল হবে না। তখন মোহরানা কি জিজ্ঞাসা করা হলে ৩ বার বা ১০ বার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ আসল। অতঃপর হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর ডান চোয়ালের মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হলো, ফলে এটা সূর্য্যের থেকেও বেশি আলোকজ্জ্বল প্রতীয়মান হতে লাগল, যা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর তাঁর মধ্যে দেয়া হলো। আর বাম চোয়ালের মধ্যে এমন নূর আসলো যা চন্দ্রের থেকে সমুজ্জ্বল, সেটা হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর নূর ছিলো।

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) হযরত হাওয়া (আলাইহিস সালাম) এর চেহারার দিকে নজর করেন আর হযরত হাওয়া (আলাইহিস সালাম) হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর চেহেরার দিকে নজর দিতে লাগল। তখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে হাওয়া! আল্লাহ তায়ালা তোমার এবং আমার চেয়ে আর কাউকে এত সৌন্দর্য্য প্রদান করেননি।

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রীল (আলাইহিস সালাম)কে নির্দেশ দিলেন, আদম ও হাওয়াকে 'ফেরদৌসে আলা' ভ্রমণ করাও এবং সেখানে লাল ইয়াকুতী পাথরে নির্মিত কক্ষ খুলে দেখাও। যখন হযরত জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) এটা দেখালেন, দেখলেন সেখানে স্বর্ণের খাট যার পায়া মনিমুক্তা খচিত। আর সেখানে একজন সুন্দরী রমনী দেখতে পেলেন, যাঁর মধ্যে নূরের আলোকজ্জ্বল রশ্মি চমকাচ্ছে এবং তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে মনিমুক্তা খচিত মালার বাহার। তখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আল্লাহ! ইনি কে? উত্তর

আসলো, ইনি হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর স্বামী কে হবেন? তখন জিব্রীল (আলাইহিস সালাম)কে আল্লাহ ইয়াকুত পাথরের কক্ষটি খোলার নির্দেশ দিলেন। দেখলেন, সেখানে একজন সুন্দর যুবক, যিনি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর সৌন্দর্য্যের মত। বললেন, ইনি কে? উত্তর আসলে, ইনি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যিনি হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর স্বামী। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! তাঁদের কোন আউলাদ আছে? আল্লাহ তায়ালা জিব্রীল (আলাইহিস সালাম)কে আরেকটি মুক্তার পাথর খচিত কক্ষ খোলার নির্দেশ দিলেন। সেখানে দুইজন সুদর্শন যুবক দেখলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

এরপর জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আদম (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, আপনি এ পাক পাঞ্জাতনের নাম[১] স্মরণ করে রাখেন। একদিন আপনার কাজে আসবে।

পরিশেষে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত হাওয়া (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতে এসে ৩০০ বা ৩৫০ বছর আরাফাতের ময়দানে জবলে রহমতে উভয়ে এ পাক পাঞ্জাতনের উসিলা ধরে দোয়া করেছেন।[২]

টীকাঃ-১ কোরআনের বাণী

فتلقى ادم من ربه بكلمات

(সূরা বাকারা, তাফসীরে দূররে মনসুর)

টীকাঃ-২ নাজাহাতুল মাজালেস ২২৪ পৃষ্ঠা ২য় খন্ড।

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়াদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শৈশব জীবন

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর লালন-পালনঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পার্থিব জীবনের প্রারম্ভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত পুতঃপবিত্র হিসেবে অতিবাহিত হতে থাকে। কেননা যার সম্মানিত পিতাজান সৈয়্যদুল মুরসালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যাঁর সম্মানিত আম্মাজান খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)। যাঁর আম্মাজানকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সালাম প্রেরন করেছেন। এমন অতুলনীয় পরিবেশের মধ্যে যেই শিশুর লালন-পালন হয়, সেই শিশুর শৈশব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কতই না মূল্যবান(!) এবং এই পরিবেশের উপর ভিত্তি হবে ভবিষ্যৎ নূরানী জীবন। এটা কতই না সুন্দর ও সৌভাগ্যময় মুহূর্ত! মানব জগত বিশেষ করে রমনী জগতে অন্য কোন রমনীর বেলায় তা আছে কিনা জানি না! যে মুহূর্তের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কৈশোরের সময় অতিবাহিত করেছেন এবং রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী কোলে থাকতেন, সে সময় আল্লাহ্‌র কোরআন নাযিল হত। ঐশ্বীবাণীর ফয়েজ ও বরকতের ভাগী হতেন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এবং নবুয়তী পরিবেশে স্নেহ-মায়া-মমতা পেতে থাকতেন। পরবর্তী নূরানী জীবনের জন্য তাঁর এ কৈশোর অবস্থাটাই ভিত্তি ছিল।

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অনুপম আদর্শঃ

মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বুজুর্গী ও সৎ চরিত্রের জন্য নারী সমাজে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনুপম আদর্শ। আমাদের নারী সমাজ যদি হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে নারীদের কোলে যুগের মহামনিষী আসবে এবং মানব ও সৃষ্টির ত্রানকর্তা জন্ম নেবে আর পৃথিবীতে সততা প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটবে নিঃসন্দেহে।

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)এর দৈহিক গঠন ঃ

হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দৈহিক গঠন মোবারক প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ন্যায় ছিল। তাঁর দেহ মোবারক চাঁদের

ন্যায় প্রস্ফুটিত ছিলো। তাঁর মুখমন্ডল সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকত, তবে চেহেরায় গাম্ভীর্য ভাব পরিলক্ষিত হত। তাঁর ওষ্ঠ মোবারক ছিল রক্তিম। তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

প্রথমতঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত-

قالت ما رأيت احداً شبه سمتاً ودلاً وهدياً (وفى رواية كلاماً وحديثاً) برسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

অনুবাদঃ তিনি বলেন, দৈহিক গঠন, চরিত্র এবং আলাপ-আলোচনা, উঠা-বসা ইত্যাদির মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে অধিকতর মিল হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত অন্য কারো কাছে দেখিনি।[১]

দ্বিতীয়তঃ হযরত মিসওয়ার ইবনে মুখরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة منى الخ

অর্থাৎ নিশ্চয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আমার শরীরের একটি টুকরা।[২]

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রখরতাঃ

হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সর্বদা গাম্ভির্যভাব নিয়ে কি যেন ভাবতেন। একদা মা খদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা তোমার এত ভাবনা কিসের(?), প্রদুত্তরে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর একটি ভাবের কথা জানালেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়াতে এক এক করে প্রেরণ না করে এক সাথে তো সকলকে প্রেরণ করতে পারতেন এবং এক সাথে সকলকে মৃত্যুও দিতে পারতেন। কিন্তু সে রকম না করার হেতুটা কি(?), সেটাই আমার চিন্তার বিষয়। বলুন তো! এটার রহস্য কি?

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র জবানে এরকম উত্তম চিন্তা-ভাবনার কথা শ্রবণ করে হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে সেটার উত্তর প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

টীকা-১ ঃ সূত্রঃ তিরমিযি শরীফ, হাকেম মুস্তাদারাক ২য় খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা।
টীকা-২ ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি শরীফ।

তখন শিশু বয়সে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সবাই এক সাথে দুনিয়াতে এসে আবার সবাই এক সাথে বিদায় নিলে পৃথিবীতে মায়া-মমতার সৃষ্টি হতো না এবং কেউ কারো দুঃখ-সুখের ভাগী হতো না। তাঁর এই সুন্দর ও চমৎকার জবাবে মা খদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মহীয়ান স্রষ্টার দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করেন।

শিশু অবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাময় প্রশ্নোত্তরে সত্যিই তাঁর তাত্ত্বিক বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রখরতার সাক্ষর বহন করে।

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অতুলনীয় চারিত্রিক গুণের অধিকারীঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন অতুলনীয় অনুপম আদর্শের ধারক ও বাহক। শিশু বয়সেই তিনি সদা সত্য কথা বলতেন। সত্যবাদিতা, মিষ্টভাষী, ধীরস্থিরতা, নমনীয়তা, শান্ত-শিষ্ট প্রভৃতি গুণের অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁর বাল্য জীবনে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি রূপে-গুণে অনন্যা ছিলেন। তাঁর সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। নারী জগতের জন্য তিনি অতুলনীয় উপমা ও আদর্শের প্রতীক। নারী হিসেবে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়; আল্লাহর নেক বন্দেনী হিসেবে স্বীয় জীবন গঠন করা যায়। এসব আদর্শ সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়, মানব জাতির মধ্যে আদর্শের প্রতীক হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আর নারী জগতের মধ্যে আদর্শের প্রতীক তাঁরই সাহেবজাদী সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)। নবুয়তের নমুনা মহিলা জাতির জন্য বিবি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সম্মানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ঃ

সাধারণত শিশুদেরকে মাতা-পিতা আদর-যত্ন করে, সম্মানের প্রশ্নই উঠে না! কিন্তু হযরত হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাপারে ভিন্নতর। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণনায় এসেছে-

وكانت اذا دخلت النبّى صلّى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها واجلسها فى مجلسه وكان النبى صلّى الله عليه وسلم اذا ادخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في محلها.

অনুবাদঃ আর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন হুজর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আসতেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে মুহব্বত করে বসাতেন এবং যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট যেতেন তখন তিনি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তাজিমের (সম্মান) জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।[১]

এতে বুঝা যায়, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অন্যান্য সাহেবজাদী ও সাহেবজাদাদের তুলনায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে অত্যন্ত আদর ও অধিক সম্মান করতেন। কেননা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নবুয়তী দৃষ্টিতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর প্রদত্ত যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তা অবলোকন করেছেন এবং তাঁরই বংশ দিয়ে নূরানী আউলাদগণ দুনিয়ার বুকে তাশরীফ আনবেন; যাঁদের মাধ্যমে এ দুনিয়াতে ইসলামের মিশন জারি থাকবে।

আর এটা ছাড়াও হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর দরবারে কত যে মর্যাদাবান তা অনুধাবন করা যায়। তাই যারা তাঁর সম্মান ও মর্যাদায় বিমোহিত হয়ে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে, যা সমাজ ও জাতির কাছে অনুপম আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা লাভ করবে নিঃসন্দেহে। নিশ্চয় এসব ভাল কাজের প্রতিদান সে পাবে। যার বদৌলতে আল্লাহ তার মর্যাদা ও সম্মানকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সৎ পথে অনুপ্রাণিত করে দ্বীন ও মাযহাবের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বেহেস্তের সুঘ্রাণ আত্মপ্রকাশঃ

প্রিয় নবী হুজুর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যখন বেহেস্তের সুগন্ধী নেয়ার বাসনা হতো তখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গলায় চুমু দিতেন এবং সুগন্ধী নিতেন।

عن عائشة رضى الله عنها أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قبل يومًا نحر فاطمة خرجه الحربى وخرجه الملافى سيرته وزاد فقلت له يارسول الله فعلت شيئا فقال يا عائشة أنى إذا اشتفت إلى الجنّة قبلت نحر فاطمة.

টীকা- ১ ঃ সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ, মুস্তাদারাক হাকেম ২য় খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গলায় চুমু খেলেন, আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা অন্য দিন করেননি, তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বেহেস্তের খোশবু পাওয়া যখন আমার ইচ্ছা হয় তখন আমি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গলায় চুমু দিয়ে থাকি।[১]

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মর্যাদার প্রতি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুহব্বতঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন সফরে বের হতেন তখন সর্বশেষ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে সাক্ষাত করে যেতেন এবং যখন সফর শেষে ফিরতেন তখন সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে সাক্ষাত করতেন।

প্রথমতঃ হযরত সওবান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ اٰخِرَ عَهْدِهٖ اِتْيَانُ فَاطِمَةَ وَاَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

অনুবাদঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে যাবার সময় সর্বশেষ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে দেখা করে বের হতেন, আর সফর থেকে আসার সময় সর্বপ্রথম ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে দেখা করতেন।[২]

দ্বিতীয় ঃ হযরত আবু ছালেবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন যুদ্ধ বা সফর হতে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়তেন, এরপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে সাক্ষাত করতেন, এরপর উম্মহাতুল মুমেনীনদের সাথে সাক্ষাত করতেন।[৩]

টীকা- ১ ঃ সূত্রঃ যখায়েরুল উক্ববা ইমাম তবরানী ৩৬ পৃষ্ঠা
টীকা- ২ ঃ যখায়েরুল উক্ববা- ইমাম তবরানী ৩৭ পৃষ্ঠা
টীকা- ৩ ঃ যখায়েরুল উক্ববা ৩৭ পৃষ্ঠা, মুস্তাদারাক হাকেম ১৫১ পৃষ্ঠা

বেহেস্তী পোশাক ও অলৌকিক কারামতঃ

বর্ণিত আছে যে, একদা মদীনা শরীফে এক ধনাঢ্য ইহুদীর মেয়ের শাদী হচ্ছিল এবং এ ইহুদী পরিবার মদীনা শরীফের অনেক ধনাঢ্য মহিলাকে আমন্ত্রণ জানাল। ফলে বিত্তশালী মহিলারা অত্যন্ত নামী-দামী পোশাক পড়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলো এবং তারা পরামর্শ করল, আজকে আমরা আমাদের এ অনুষ্ঠানে নবীর সাহেবজাদীকে আমন্ত্রণ জানাব। আর আমাদের সামনে তিনি তাঁর গরীবি বা দারিদ্রময় বা কমদামী পোশাক নিয়ে আসবেন এবং আমরা তা দেখব। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট দাওয়াতে উপস্থিত হবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করল।

এমতাবস্থায় হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য একজোড়া বেহেস্তী পোশাক আনলেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ আপনার প্রতি সালাম আরজ করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আপনার কন্যা সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সমীপে সালাম পেশ করি এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁকে এ বেহেস্তী পোশাক প্রদান করি; সেটা নিয়ে তিনি ইহুদীদের অনুষ্ঠানে যাবেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কাপড়ের হাদিয়া গ্রহণ করে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে আহবান করলেন এবং হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক তাঁর খেদমতে সালামের কথা জানালেন। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ঐ বেহেস্তী কাপড় পরিধান করে ইহুদী ধনাঢ্য মহিলার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। ইহুদী মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন তশরীফ আনেন তখন গায়েব থেকে আহবান আসলো! যারা মজলিসে উপস্থিত ছিলো সকলে স্পষ্ট শুনতে পেলো যে, হে উপস্থিত মহিলাবর্গ! তোমরা সকলে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খেদমতে দাঁড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন কর। সাথে সাথে উপস্থিত সকল মহিলাবর্গ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করল। ইহুদী মেয়েরা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এই অনন্য সুন্দর ও উন্নতমানের পোশাক দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পোশাকের সামনে তাদের

পোশাক নিতান্তই নগন্য। সুতরাং ঐ বেহেস্তী পোশাকের সুগন্ধী অনুষ্ঠানের চতুর্দিকে সুভাষিত হয়ে অপূর্ব ঘ্রাণের সৃষ্টি করল। আর তারা সবাই বলতে লাগল, এ সুগন্ধী কোথা থেকে আসছে। যে সুগন্ধীর সুভাষে তারা বিমোহিত হতে লাগল। ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানের চেয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পোশাকের আকর্ষণ এবং সুগন্ধীর সুঘ্রাণে চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি হল। এতে সবাই বিবাহের আনন্দ-আমেজ থেকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ফিরিয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দিকে অনুপ্রাণিত হলো এবং তাঁরা সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অপরূপ সৌন্দর্য্য, পোশাকের স্বকীয়তা ও সুগন্ধীর সুভাষে বিমোহিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে নবী নন্দিনী সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! আপনি এ নয়নাভিরাম রাজকীয় পোশাক কোথা থেকে পেলেন? প্রদুত্তরে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার আব্বাজান সৈয়্যদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবার থেকে। তারা পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, আপনার আব্বাজান কোথা থেকে পেলেন? তিনি বললেন, হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) থেকে। তারা আবার জিজ্ঞাসা করল, হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) কোথা থেকে পেলেন? তিনি উত্তরে বললেন, বেহেস্ত থেকে।

এতে মহিলারা সমস্বরে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সবাই কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। আর ঐ মহিলাদের মধ্যে যার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, ঐ মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে গেল এবং যাদের স্বামী ঈমান গ্রহণ করেনি, তারা সাহাবীদেরকে পছন্দানুসারে স্বামীরূপে বরণ করে নিলেন।[১]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যার সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তাতে কারো কুদরত নেই যে বাধা দেয়া। আল্লাহ তায়ালা হযরত সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য বেহেস্ত থেকে বেহেস্তী পোশাক প্রেরণ করে তাঁর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর অন্যান্য মহিলাদের উপর তা প্রমাণ করলেন। পাশাপাশি যারা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলে গরিবী হাল নিয়েও এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন, আল্লাহ তাঁদেরকে অবর্ননীয় নেয়ামত, রহমত, বরকত প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেন আর তাঁদেরকে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁর রহমতের পোশাক প্রদান করেন।

টীকাঃ-১ নাজাহাতুল মাজালেস-২২৬ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড-কৃত আব্দুর রহমান সফুরী

যা সেই ব্যক্তিকে সর্বপর্যায়ে মান-সম্মান, ইজ্জত-কদর, ধন-দৌলত ও জ্ঞানে-গুণে মহিমান্বিত করেন। সর্বোপরি সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ইজ্জতের পোশাক প্রদান করেন। আল্লাহ কুরআনে পাকে এরশাদ করেন-

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

অনুবাদঃ আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তানেরা! অবশ্য আমি তোমাদের নিকট একটি পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটাই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

কোরাইশদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রদানঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন, কোরাইশদের মুশরেকেরা হাতিমের মধ্যে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকে এক সাথে তাঁর উপর হামলা করবে। তাদের এ ষড়যন্ত্র এবং পরামর্শের কথা হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অলৌকিকভাবে জানতে পারলেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে গিয়ে কোরাইশদের দূরভীসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি একটু নিরবতা পালন কর। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে তাদের পাশ দিয়ে হেরেম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করার সময় তারা মাথা উঁচু করল। অতঃপর আবার মাথা নিচু করল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরানী হাত মোবারকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে (شاهت الوجوه) "শাহাতিল উযুহ" বলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। ঐ নিক্ষিপ্ত মাটি যাদের কাছে পৌছেছে; তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হল। ফলে হযরত মাহবুবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ মোযেজাটি প্রকাশে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অবদান অনস্বীকার্য।[২]

টীকা-১ ঃ সূরা আরাফ , ২৬ নং আয়াত।

টীকা- ২ ঃ মসনদে ফাতেমাতুয যাহ্‌রা ২৩২/২৩৩ পৃষ্ঠা, মসনদে আহমদ ১ম খন্ড ৩০৩ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠা, সহীহে ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৬৫০, হাকেম মুস্তাদারাক ৩য় খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা, দলায়েলুন নবুয়ত ৬ষ্ঠ খন্ড ২৪০ পৃষ্ঠা, আবু নঈম ১ম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদী মোবারক

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের পয়গামঃ

মখদুমায়ে কায়েনাত হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন শৈশবকাল অতিক্রম করে যৌবনকালে পদার্পন করেন তখন সরওয়ারে কায়েনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের ব্যাপারে সমাজের নামী-দামী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে পয়গাম আসতে আরম্ভ করল। ইমাম নাসায়ী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদীর ব্যাপারে পয়গাম পেশ করা হয়। এরপর হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক পয়গাম পেশ করা হয়। কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনটাই মঞ্জুর করলেন না। বরং এ ব্যাপারে আসামানী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় রইলেন।[১]

সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের ব্যাপারে আসমানী ফয়সালাঃ

হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অহী আসতে লাগল। অহির ফেরেশতা (হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম) চলে যাবার পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আনাস'! তুমি কি কিছু জান? আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) একটা পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার কদমে পাকে আমার পিতা-মাতা কোরবান, হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন? এরশাদ হলো, হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) এ পয়গাম নিয়ে আসলেন-

أن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تزوج فاطمة من علّى رضى الله عنه.

টীকা-১ ঃ যখায়েরুল উকবা ২৮ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুম হলো যে, আপনি আপনার সাহেবজাদী হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট শাদী দিবেন।[১]

বেহেশতে খাতুনে জান্নাতের আক্বদানুষ্ঠানঃ

আল্লামা তবরী এবং আবদুর রহমান সফুরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার সালাম এবং আল্লাহ্র এরশাদ হলো যে, আজকে বেহেশতের মধ্যে লক্ষ্য কোটি ফেরেশতাদের মজলিসে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে তাঁর আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বেহেশতী বাঁশের তৈরী ঘরে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে শাদী দিয়েছেন। উক্ত মজলিসে খোত্বা পাঠ করেন, হযরত ইস্রাফিল (আলাইহিস্ সালাম) এবং হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত মিকাঈল (আলাইহিস্ সালাম) সাক্ষী হলেন আর স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পক্ষে অলী হলেন।[২]

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বিবাহের উপহার বেহেশতে কিয়ামত পর্যন্ত বন্টণ যোগ্যঃ

হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববী শরীফে তশরীফ ফরমায়েছেন, এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হে আলী! এক্ষুনি হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) এসে আমাকেখবর দিলেন যে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তোমার নিকট আমার কন্যা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে শাদী দিলেন এবং এই বিবাহের মধ্যে চল্লিশ হাজার ফেরেশতাকে সাক্ষী বানালেন। আর শাজরায়ে তওবা বা তওবা বৃক্ষের নিকট আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো যে, তুমি ঐ ফেরেশতাদের নিকট হাদিয়া হিসেবে মনিমুক্তা নিক্ষেপ কর। বৃক্ষ যখন মনিমুক্তা, ইয়াকুত ছিটতে শুরু করল, তখন বেহেশতের হুরেরা তা তালাশ করে নিতে লাগল এবং একটি তবকের (খাঞ্জা, বাসন) মধ্যে রেখে তা কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরকে হাদিয়া দিতে থাকবে।[৩]

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উক্ববা-৩১ পৃঃ, টীকা- ২, ৩ ঃ যখায়েরুল উক্ববা-৩২পৃষ্ঠা

জমিনে খাতুনে জান্নত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের বাস্তবায়নঃ

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট এসে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর আল্লাহর সালাম জানিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, আপনার কন্যাকে আসমানে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে শাদী দিলাম, আপনি এ শাদীকে জমিনে বাস্তবায়ন করেন। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২য় হিজরীর রমজান মাসের মধ্যে বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর, কারো মতে উহুদের যুদ্ধের পর, কারো মতে যিলহজ্জ, কারো মতে রজব মাসে, অপর এক বর্ণনায় সফর মাসের মধ্যে উক্ত শাদীটা বাস্তবায়ন করলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, ২য় হিজরীর রমজান মাসে শাদী হয়েছে। শাদীর সময় হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স ছিলো ১৫ বৎসর ৫মাস ১৫ দিন, কারো মতে ১৬ বৎসর, কারো মতে ১৮ বৎসর। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বয়স ছিলো ২১ বৎসর ৫ মাস।[১]

বিবাহ অনুষ্ঠানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খোত্বা প্রদানঃ

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত ফারুকে আযম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বিবাহের প্রস্তাব যখন মঞ্জুর হলো না তখন তাঁরা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে অনুপ্রাণিত করলেন। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের অনুরোধে আকৃষ্ট হয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, হে আলী! কি প্রয়োজনে তুমি এসেছ? তখন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে স্বাগতম জানালেন এবং আর কিছু বললেন না। এমতাবস্থায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অহি আসতে আরম্ভ করল। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, অহির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদীর কথা বলেছেন এবং তা অতি তাড়াতাড়ি করতে বললেন। আর হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উক্ববা-৩২ পৃষ্ঠা

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হে আনাস! তুমি যাও, আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা, যুবাইর এবং আনসারীদের সবাইকে বিবাহে উপস্থিত থাকার জন্য দাওয়াত দিয়ে আস। সবাই উপস্থিত হলেন। (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোন কাজের ব্যাপারে বাইরে ছিলেন) তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে একটি খোত্‌বা প্রদান করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ الْمَرْهُوْبِ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطْوَاتِهِ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِىْ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَمَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَأَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهِ وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّتِهِ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَتْ عَظْمَتُهُ جَعَلَ لِلْمُصَاهَرَةِ سَبَبًا لَاحِقًا وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا وَشَجَّ بِهِ الْأَرْحَامَ وَأَلْزَمَ بِهِ الْاَنَامَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا فَأَمْرُ اللّٰهِ يَجْرِىْ بِقَضَائِهِ وَقَضَاؤُهُ يَجْرِىْ بِقُدْرَتِهِ وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدْرٌ وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ [১]

বিবাহের মোহরানা নির্ধারন ও দোয়া মাহ্‌ফিলঃ

খোতবা প্রদানের পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে হুকুম দিলেন, আমি যেন ফাতেমা বিন্‌তে খাদিজাকে আলী ইবনে আবী তালেবের নিকট বিবাহ দিই। উপস্থিতিবর্গ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমার কন্যা ফাতেমা খাতুনে জান্নাতকে হযরত আলীর আক্বদের মধ্যে দিলাম। বিবাহের মোহরানা হচ্ছে ৪শ' মিছকাল চাদী বা ১৬০ চাদীর টাকা। যদি ইহার উপর হযরত আলী সন্তুষ্ট থাকে। এরপর কাঁচা খেজুরের একটি খাঞ্জা বা তবক হাজির করা হল এবং আমাদের সামনে মজলিসে রাখা হল।

টীকা-১ যখায়েরুল উক্‌বা-৩০ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মাজালেস- ৩য় খন্ড-২২৫ পৃষ্ঠা)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, তোমরা এখান থেকে কাড়াকাড়ি করে খেতে থাক। আমরা মজলিসে যারা উপস্থিত ছিলাম সকলে কাড়াকাড়ি করে ঐ খেজুর নিতে থাকলাম। উল্লেখ থাকে যে, অন্য ব্যাপারে কাড়াকাড়ি করা শরীয়তে নিষিদ্ধ কিন্তু বিবাহোত্তর মিষ্টি খেজুর কাড়াকাড়ি করে খাওয়া জায়েয এবং সুন্নত। হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা ঐ খেজুর কাড়াকাড়ি করে নিতে থাকি, এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়া হলে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খোত্‌বা পাঠ করে বলেন,

رضيت بذالك يا رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি এ কাজে সন্তুষ্ট আছি। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা শুনে দোয়া করলেন-

جمع الله شملكما واسعد حدكما وبارك عليكما واخرج منكما كثيراً الطيب.

অর্থাৎ "আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তোমরা দুইজনের সমুলিয়ত বা আঁচলকে একত্রিত করেন, তোমাদের উদ্দেশ্যকে শুভ বা ফলপ্রসূ করেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্ অধিক বরকত দান করেন এবং তোমাদের মাধ্যমে অনেক পবিত্র নসল আল্লাহ্ বের করেন।"

হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ দুই সম্মানিত ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ অনেক আউলাদ প্রদান করেন। সূরা কাওসারের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা এ মর্মে ইঙ্গিত করেন- انّا اعطينك الكوثر

অর্থাৎ আমি আপনাকে অধিক আউলাদ দান করেছি, যা আপনার কন্যা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে হবে।

এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, মোহর আদায়ের জন্য তোমার নিকট কি আছে? হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, একটি ঘোড়া আর একটি লোহার যুদ্ধ পোশাক বা বর্ম আছে। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, তুমি তো মুজাহিদ, ঘোড়া জিহাদের জন্য তোমার প্রয়োজন, বর্মটি বিক্রয় কর। ঐ বর্মটি হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ৪৮০ দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করলেন। পরে হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঐ বর্মটা মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট হাদিয়া হিসেবে ফেরত দিয়ে দিলেন। [১]

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উক্‌বা-৩০-৩১ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মাজালেস-৩য় খণ্ড ২২৫ পৃষ্ঠা, আশ্‌ শরফুল মুয়াইয়েদ-৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা

বেহেস্তে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহ অনুষ্ঠানের মোহরানাঃ

প্রথমতঃ আসমানের মধ্যে যখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু চল্লিশ হাজার ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট শাদী দিচ্ছেন তখন সেই শাদীর মোহরানা ধার্য্য হয়, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের শাফায়াত বা সুফারিশ।

ইমাম নসফী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহ যখন ধার্য্য হল তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করলেন, তাঁর বিবাহের মোহরানা যেন তাঁর পিতা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের জন্য শাফায়াত হিসেবে ধার্য্য হয়। আর তিনি যখন পুলসিরাতের উপর কদম রাখবেন তখন তিনি তাঁর মোহরানা দাবী করেন।

ফুসুলুল মুহিম্মাহ কিতাবের সূত্রে আল্লামা আব্দুর রহমান সফুরী নাজাহাতুল মাজালেসে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এরশাদ করেন, একদিন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্যোজ্জ্বল বদনে সাহাবায়ে কেরামের নিকট উপস্থিত হন। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আজকে আপনি এত আনন্দ উপভোগ করছেন কেন? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদুত্তরে বলেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমার চাচাত ভাই আলী এবং আমার মেয়ে ফাতেমা এর ব্যাপারে একটি সুসংবাদ এসেছে যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে শাদী দিলেন এবং বেহেস্তের রিদুয়ান ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন তুবা বৃক্ষকে নাড়া দেয়ার জন্য। তখন ঐ বৃক্ষ থেকে কাগজরূপে অনেক পাতা ঝড়ে পড়ল (আমার আহলে বাইতের মুহব্বতের ব্যক্তিদের সংখ্যানুপাতে), আর ঐ বৃক্ষের নিচে নূরের তৈরী অনেক ফেরেশতা সৃষ্টি করল। যখন কেয়ামত হবে তখন ঐ ফেরেশতারা মখলুকের মধ্যে চড়িয়ে পড়বে। ঐ মুখলুকের মধ্যে যারা আমার আহলে বাইতের মুহব্বতকারী হবেন তাদের হাতে হাতে এক একটি চেক বা ঐ কাগজটি দিয়ে দেবে। যাতে লিখা থাকবে 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি'। আমার এই কন্যা এবং আমার এই চাচাত ভাই আলী আমার উম্মতের অনেক নারী-পুরুষদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির উসিলা হবে- তাঁদের বিবাহের মোহরানার বিনিময়ে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তায়ালার এরশাদ হলো- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে জাহান্নামের সম্মুখীন হতে হবে।

এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর গুনাহগার উম্মতের ব্যাপারে চিন্তিত হলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন চিন্তিত হলেন? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতে নিরব রইলেন। সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চিন্তার কথা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে জানালেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অতিসত্তর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে তাশরিফ এনে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কেন চিন্তিত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় আছেন? তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হবার ব্যাপারে সংবাদ দিলেন। এতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) খুব বেশি কান্নাকাটি করেন। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দিকে লক্ষ্য করে বলেন, ইয়া শেখুল মুহাজেরীন! (হে মুহাজেরদের বৃদ্ধ!) আল্লাহর হাবীবের উপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে জাহান্নামের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৃদ্ধ উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য আপনার কাছে কি কোন অবলম্বন আছে? প্রত্যুত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ। এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের যুবকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য আপনার কাছে কোন উপায় আছে কি? তিনিও বললেন, হ্যাঁ। এরপর হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের শিশুদের রক্ষা করার জন্য তোমাদের নিকট কোন পন্থা আছে কি? তাঁরাও বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি স্বয়ং বলেন আমিও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের মহিলাদের রক্ষার জন্য প্রতিবন্দক হিসেবে আছি। এরপর হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহর হাবীব

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে আল্লাহর সালাম এবং আল্লাহর বাণী পেশ করেন যে, আল্লাহর এরশাদ হলো, হে ফাতেমা! আপনি চিন্তিত হবেন না, আমার বান্দিনী ফাতেমা যে রকম পছন্দ করেন আমি সেরকম করব।[১]

তৃতীয়তঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন, তখন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, আপনার কাছে আমার এই অছিয়ত যে, আপনি যখন ইন্তেকালের পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে যাবেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কদমে পাকে আমার সালাম জানাবেন এবং আমি যেন সহসা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হতে পারি। হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)ও বলেন, আপনার কাছে আমারও একটি অছিয়ত রইল, তা হল এই যে, আমার যখন ওফাত হবে তখন আমার জন্য শারগোলের মাধ্যমে কান্নাকাটি না করা এবং আমার কলিজার টুকরা হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে প্রহার না করা। হে শেরে খোদা! দেখুন ঐ যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেরেশতাদের দল নিয়ে তশরীফ নিয়ে আসতেছেন। এখন আমি চলে যাচ্ছি; আমার ইন্তেকালের পর একটা কাজ করবেন, অমুক স্থানে সংরক্ষিত একটি কাগজের টুকরা রয়েছে, তা বের করে আমার কাফনের মধ্যে দিবেন। কিন্তু সেটা আপনি পড়বেন না। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে ফাতেমা খাতুনে জান্নাত! হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দোহাই দিয়ে বলি, ঐ কাগজের মধ্যে কি লিখা আছে একটু বলুন। তখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এরশাদ করেন, আপনার সাথে যখন আমার বিবাহ হচ্ছিল তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার মোহরানা ৪০০ মিছকাল চাঁদি ধার্য্য করলেন। এতে আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই মোহরানা আমার কাছে মঞ্জুর হয়নি। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) হাজির হয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তায়ালার প্রস্তাব হল যে, বেহেস্ত ও বেহেস্তের সমুদয় নেয়ামত রাজিকে

টীকা- ১ ঃ নাজহাতুল মাজালেস, ২য় খন্ড, ২২৬ পৃঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মোহরানা নির্ধারণ করেছি। এই সংবাদ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দেয়ার পরও আমি এতে রাজি হলাম না। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, আম্মাজান! তুমি বল তোমার মোহরানা কি হবে? অতঃপর আমি আরজ করলাম, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি হলেন রাহমাতুল্লীল আলামীন। সর্বদা আপনাকে উম্মতের ব্যাপারে চিন্তিত অবস্থায় দেখি, আমি চাই আপনার গুনাহ্‌গার উম্মতের মুক্তিই আমার মোহরানা ধার্য্য হোক। এই সংবাদ নিয়ে হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) লিখিত একটা কাগজ এনে দিলেন। সেটাতে লিখা আছে-

جعلت شفاعة امّة محمّد صداق فاطمة.

অর্থাৎ আমি উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত স্বরূপ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মোহরানা নির্ধারণ করলাম।[১]

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহে বেহেস্তী পোশাক উপহার ঃ

আল্লামা ইবনে যাউযী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, যে রাত্রিতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শাদী হলো, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাতুনে জান্নাতের জন্য একটি নতুন কামিছ তৈরী করলেন। আর হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাতের নিকট একটি সাধারণ পোশাক ছিল। এমতাবস্থায় একজন ভিক্ষুক ঘরের দরজায় এসে একটি পোশাক ভিক্ষা চেয়ে বললেন,

اطلب من بيت النبوة قميصا خلقا

অর্থাৎ আমি নবী পরিবার থেকে একটি পুরানো পোশাক তালাশ করছি কিংবা ভিক্ষা চাচ্ছি।

হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) প্রথমে পুরানো পোশাক দেয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে হঠাৎ করে আল্লাহর এই নির্দেশ মনে পড়ল-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

টীকা-১ ঃ জামেউল মুজেজাত ৬৩ পৃষ্ঠা, সূত্রঃ আলে রসূল ১ম খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ "তোমরা কখনও মঙ্গল পাবে না যতক্ষণ না তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান না কর।"

ফলে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বিবাহের জন্য তৈরীকৃত ঐ নতুন জামা মোবারকটি দান করে দিলেন। যখন শাদীর পর বিদায়ী মুহূর্ত উপস্থিত হলো তখন হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) উপস্থিত হয়ে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আল্লাহর সালামী আরজ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি খাতুনে জান্নাতকে সালাম করি এবং তাঁর নিকট বেহেস্তের সবুজ রেশমী কাপড়ের তৈরী এই বিশেষ পোশাকটি উপহার হিসেবে প্রদান করি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) এর সালাম হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট পেশ করলেন এবং ঐ বেহেস্তী পোশাক মোবারকটি নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে পরিধান করিয়ে দিলেন। ঐ পোশাকটি নিয়ে যখন মহিলাদের সমাবেশে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাশরীফ আনেন, তখন ঐ সমাবেশের মধ্যে কাফের সম্প্রদায়ের অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের হাতে হাতে এক একটি মোমবাতি ছিল আর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর হাতে একটি প্রদীপ ছিল। হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর পাখা মোবারক উঠালেন এবং ঐ নূরী পোশাক উত্তোলন করলেন, তখন ঐ পোশাক থেকে এমন নূরের আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হলো, যা সমগ্র এলাকার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেলো এবং ঐ জামা মোবারকের আলোর রশ্মি কাফের মহিলাদের চোখের মধ্যে পড়ল। ফলে তাদের অন্তর থেকে কুফরীর অন্ধকার বিদূরীত হয়ে গেলে তারা ঈমান গ্রহণ করল।[১]

মাসয়ালাঃ এখান থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা নবী ও অলীদের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছেদের মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে। ঐগুলির দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক সমস্যার সমাধান হয়।

প্রথমতঃ হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) এর জুব্বা মোবারক হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্ সালাম) এর অন্ধ চক্ষুর মধ্যে রাখার সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এল। কোরআন মজিদে সূরা ইউসুফের মধ্যে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা- ১ ঃ নাজহাতুল মাজালেস, ২য় খন্ড, ২২৬ পৃঃ

اذهبوا بقمصى هذا فالقوه على وجه ابى يات بصيراً ---- فلمّا ان جاء البشير القه على وجهه فارتدّ بصيراً.

অর্থাৎ ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমার জামা নিয়ে যাও এবং ইহা আমার মহামান্য পিতা হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্ সালাম) এর চেহেরায় স্পর্শ করাও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।

যখন সুসংবাদ দাতা ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) এর ভাই ইয়াহুদা এই জামা মোবারক ইয়াকুব (আলাইহিস্ সালাম) এর চেহারা মোবারকের মধ্যে রাখলেন, সাথে সাথে তাঁর চক্ষুদৃষ্টি ফিরে আসল।[১]

দ্বিতীয়তঃ এছাড়া হাদিসে পাকের মধ্যেও বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জুব্বা মোবারক ধৌত করে শেফার জন্য পানি পান করা হতো।[২]

তৃতীয়তঃ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পোশাক মোবারকের আলোর বরকতে কাফের মহিলাদের অন্তরের চক্ষু দৃষ্টি খুলে গেল।

চতুর্থতঃ এভাবে হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জুব্বা মোবারকের উসিলায় সুলতান মাহমুদ গজনবীর সতের বার সমুনাথ মন্দির হামলায় বিজয় সাধিত হল এবং এই জুব্বা মোবারকের উসিলায় তাঁর রণকৌশলের দৃষ্টি খুলে গেল।[৩]

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহে সরসায়িল ফেরেশতার আগমন ঃ

মোল্লা মুঈন কাশেফী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব রওজাতুশ শোহাদায় আবুল মুওয়াইদ খাওয়ারেজেমের সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর হুজরা শরীফে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন ফেরশতার আগমন হল। যার ২০টি মাথা আছে। প্রত্যেক মাথায় ১ হাজার মুখ আছে। প্রত্যেক মুখে আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতেছে। তাঁর হাতদ্বয় সাত আসমান এবং সাত জমিন থেকেও প্রশস্থ। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি পরিচয় দিলেন, আমার নাম 'সরসায়িল ফেরেশতা'।

টীকা- ১ ঃ সূরা ইউসুফ, ১৩ পারা, ৯৩, ৯৬ আয়াত।

টীকা-২ ঃ বুখারী শরীফ। টীকা- ৩ ঃ তারিখে ফেরেশা

আমাকে আল্লাহ তায়ালা আপনার খেদমতে 'নূরের সাথে নূরের' শাদীর ব্যাপারে পাঠিয়েছেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাখ্যা স্বরূপ জি জ্ঞাসা করলেন, কার আক্বদ কার সাথে দিব। তখন উত্তরে বলেন, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আক্বদ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে দিবেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ গালাম) ও হযরত মিকাঈল (আলাইহিস্ সালাম)কে সাক্ষী বানিয়ে ঐ সরসায়িল ফেরেশতার উপস্থিতিতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আক্বদ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাথে পড়িয়ে দিলেন।[১]

চতুর্থ আসমানে বায়তুল মামুরে খাতুনে জান্নাতের শাদী মোবারক ঃ

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা যেন সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয় এবং বেহেস্তের হুরদেরকেও সুন্দররূপে সজ্জিত হবার জন্য হুকুম দিলেন। তুবা বৃক্ষকে হুকুম দিলেন সুন্দরভাবে সজ্জিত হবার জন্য। এরপর সমস্ত ফেরেশতাদেরকে চতুর্থ আসমান বায়তুল মামুরে উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেই বায়তুল মামুরের নূরের মিম্বর শরীফে সায়্যেদুনা আবুল বশর হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) বসে খুতবা দিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মধ্যে মিষ্টভাষী "রাহিল" ফেরেশতাকে মিম্বরে এসে আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাহিল ফেরেশতা যখন খুত্‌বা পাঠ করলেন তাঁর সুকন্ঠের সুমধুর সুরে আসমানের সমস্ত ফেরেশতারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম)কে বললেন, আমি আমার বন্দিনী ফাতেমা বিন্‌তে হাবিবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আমার প্রিয় বান্দা আলী বিন আবি তালিব এর সাথে বিবাহ দিলাম।

হে জিব্রাঈল! তুমি এই বিবাহকে ঐসব ফেরেশতাদের সমাবেশের মধ্যে সম্পাদন করে দাও। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আমি হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বিবাহের আক্বদ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে সম্পন্ন করলাম। এই আক্বদানুষ্ঠানের সমস্ত দস্তাবিজ (কার্যক্রম) বেহেস্তের রেশমী কাপড়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হলো। হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) ঐসব অহি নিয়ে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে পেশ করেন। এরপর আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার মধ্যে উপরোক্ত নিয়মে তাঁদের বিবাহ বাস্তবায়ন করেন।[২]

টীকাঃ-১ রওজাতুশ শোহাদা-২৮৬ পৃষ্ঠা, টীকাঃ-২ রওজাতুশ শোহাদা ২৮৮ পৃষ্ঠা

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র শাদী মোবারকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপঢৌকনঃ

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর লোহার বর্ম হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ৪৮০ দিরহাম দিয়ে বিক্রয় করার পর বিক্রয়লব্ধ সমুদয় দিরহাম আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত নগদ দিরহাম হতে কিছু বেলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে দিলেন, পাথর খরিদ করে আনার জন্য আর কিছু দিরহাম অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করার জন্য হযরত উম্মে সুলাইমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে দিলেন, হযরত উম্মে সুলাইমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উক্ত দিরহাম দিয়ে নিম্নোক্ত সামগ্রী ক্রয় করলেন।

(১) ২টি সাধারণ চাদর।
(২) উড়না হিসেবে দুইটি কারুখচিত চাদর।
(৩) ২টি চান্দির বাজুবন্দ।
(৪) ১টি গাদী।
(৫) মোটা কাপড়ের ১টি বালিশ।
(৬) ১টি তামার বদনা।
(৭) ২টি মাটির কলসী।
(৮) ৪টি গ্লাস।
(৯) ১টি চাক্কি- যা দিয়ে আটা খামিরা করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
(১০) ১টি পানির মশক- যা চামড়া দিয়ে তৈরী।
(১১) ১টি খেজুর পাতার তৈরী চাটাই।
(১২) ১টি লেহাফ বা তোষক।
(১৩) ১টি চামড়ার তাকিয়া যেটা খেজুর গাছের ছাল ভর্তি।
(১৪) অন্য বর্ণনানুযায়ী ২টি চাক্কি
(১৫) ২টি ঘোড়াও উপহার হিসেবে দিয়েছেন।
(১৬) এগুলো ছাড়া আরেকটি চামড়ার পাট্টা দেয়া হল। যেটাতে কোরআন মজিদের কয়েকটি সূরা লেখা আছে।[১]

টীকাঃ- ১ সিরাতে রসূল আরবী ৬৯০ পৃষ্ঠা, রওজাতুশ শোহাদা-২৯২ পৃষ্ঠা, সূত্র- তারিখে কারবালা ২০৬ পৃষ্ঠা, যখায়েরুল উক্ববা- ৩৪ পৃষ্ঠা।

তারিখ ও সিয়রের বিভিন্ন কিতাবাদিতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত আসবাবপত্রাদির ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। তবুও ঐ সমস্ত জিনিসপত্রাদি প্রদান করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

মাসয়ালাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, দান করা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া নিজের সাহেবজাদীকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তে এটা প্রথমতঃ সুন্নত সাব্যস্থ করা ও দ্বিতীয়তঃ মুসলিম নর-নারীর জন্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে যৌতুক দাবীর হিড়ীক লেগেছে। আর যৌতুকের শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ হচ্ছে, যৌতুক না দিলে বিবাহ হচ্ছে না। এসব কিছু শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা এটা মেয়ে পক্ষের উপর অত্যন্ত জোর-জবর হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষকে ধন-সম্পত্তি, জায়গা-জমি বিক্রি করে যৌতুক লোভী স্বামীর মনোবাসনা পূরনের জন্য অনেক লাঞ্চনার স্বীকার হতে হয়। শরীয় মতে, এ ধরনের যৌতুকের শর্তে বিবাহ হওয়া হারাম। ফলে ঐ বিবাহের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের শান্তিতো দূরের কথা সব সময় ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই থাকে। বিবাহের উপঢৌকনের ব্যাপারে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নতই অনুসরণীয়। এর মধ্যে রয়েছে শান্তি ও মুক্তি। যদি ইহা সমাজে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সমাজ সুন্দর ও সাবলীল হবে, হিংসা-বিদ্বেষ, বিদূরীত হবে, অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুসলিম সমাজ মুক্তি পাবে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে তখন সে সমাজে আদর্শ সন্তান জন্ম নেবে। তারাই হবে দেশ ও দশের আদর্শ মানব। তাই বলা যায়, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নতই আদর্শ মানব তৈরীর অনন্য মডেল।

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহোত্তর বিদায়লগ্নের শুভ মুহূর্ত ও অলৌকিক দৃশ্য ঃ

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট যখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমর্পনের সময় হলো, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে তাঁর

সতেজ বগলার (খচ্ছর) উপর তাঁকে আরোহন করে দিলেন, হযরত সালমান ফার্সী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দিলেন বগলার লাগাম ধরে নেয়ার জন্য আর স্বয়ং রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শাহজাদীর বগলাকে নবুয়তের নূরানী হাত মোবারকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। চলার পথে রাস্তার মাঝখানে গেলে হঠাৎ একটা জয়ধ্বনির আওয়াজ আসলো। দেখা গেলো, হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়ে হাজির।হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের আগমন কি কারণে? তাঁরা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বেলায়তের সম্রাট মওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট সমর্পন করার জন্য হাজির হয়েছি। আর হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) ও ফেরেশতা নারায়ে তাকবীর ও নারায়ে রেসালাতের শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে তুললেন এবং দুলহা-দুলহীনের প্রতি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণ জমিনের মধ্যে উষা উদিত হওয়া পর্যন্ত হযরত মাওলা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হুজরা শরীফের বাইরে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠেরত ছিলেন।[১]

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর এবং নারায়ে রেসালত ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর দুলহা-দুলহীনের নামে প্রশংসা ধ্বনি দেয়া শরীয়ত সম্মত এবং সুন্নতে মালায়েকা। আর এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হামদ-নাতের মাহফিল করা ও এ জাতীয় সবগুলিই সুন্নত। বরং আল্লাহর রহমত পাবার অন্যতম উপায়। বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানের নামে অশ্লীল গান-বাজনা, শরীয়ত বিরোধী কার্য-কলাপ, ভি.সি.আর, গায়ে হলুদ ইত্যাদির নামে বেহায়াপনা, নারী-পুরুষ একত্রিতভাবে নৃত্য করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের কার্যক্রম হওয়া উচিত নয়। মুসলমানরা মূল বিবাহের সুন্নত তরীকা বাদ দিয়ে অবৈধ তরিকা গ্রহণ করে যে বিবাহ অনুষ্ঠান করছে; এতে আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজবের ভাগী হচ্ছে। তাই এ জাতীয় বিবাহ এবং বিবাহোত্তর কাজে শান্তি নেই। অন্য দিকে আরেকদল কথায় কথায় শিরক বিদয়াত বলে মৌলিক বৈধ জিনিসকেও অস্বীকার করতেছে। তাদের কথাও সঠিক নয়। আমাদের দেশে এদের একদলকে ওহাবী বলা হয়। আর একদলকে মওদুদী বলা হয়।

টীকাঃ-১ যখায়েরুন উক্‌বা-৩২ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মাজালেস ২য় খন্ড ২২৪ পৃষ্ঠা

ইসলামী শরীয়তের সাথে এদের আক্বীদা ও আমলের কোন মিল নেই। তারা কথায় কথায় যে কাজে হারামের ফতোয়া দেয় অথচ তাদের ফতোয়া অনুযায়ী সেই কাজ তারা নিজেদের কাজে প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করে। এরাই হলো ইসলামের নামে সুবিধাবাদি দল। এদের আক্বীদা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের হালাল-হারামের ব্যাপারে এদের ফতোয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। বাস্তবিকই এদের কাছে প্রকৃত ইসলাম নেই। বরং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ন্যায় মনগড়া ও বিকৃত ধর্ম রয়েছে। যা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য ও নিগৃহীত। ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ রাখার জন্য তাদের সংশ্রব থেকে নিজে বিরত থাকা এবং আপনজনদের রক্ষা করা ঈমানদারের কাজ।

বিদায়কালে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক শান্তনাঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) শাদী হবার পর এ কারণে অশ্রুপাত করলেন যে, স্বীয় পিতা রাহমাতুললীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘর ও লালন-পালন হতে তাঁর বিদায় হতে হচ্ছে। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আমার সাহেবজাদী বেহেস্তের রমনী! তোমার কান্নার কারণ কি? এক বর্ণনানুযায়ী ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন যে, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরে সংসার চালানোর মতো কোন সম্পদও নেই। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন শান্তনার সুরে বলেন, ওগো আমার সাহেবজাদী ফাতেমা!

اما ترضين يا فاطمة انّ الله اختار من اهل الارض رجلين جعل احدهما أبك والاخر بعلك.

অর্থাৎ হে ফাতেমা! তুমি কি এতে রাজি হবে না যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু এ জমিনে দুই ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নির্বাচন করেছেন। তন্মধ্যে একজন তোমার পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী হবার কারণে আর একজন বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তোমার স্বামী হবার কারণে হাকেমের বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

اَمَا تَرْضِيْنَ اَنِّى زَوَّجْتُكِ اَقْدَمَ اُمَّتِىْ اِسْلَامًا وَاَكْثَرَ عِلْمًا وَاَعْظَمَ حِلْمًا.

অর্থাৎ হে ফাতেমা! তুমি কি এতে রাজি হবে না যে, আমি তোমাকে শাদী দিলাম এমন এক ব্যক্তিকে যিনি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন আর গাম্ভীর্যতার দিক দিয়ে মহান।[১]

বিদায়োত্তর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনঃ

বিবি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহের পর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নুরানী বাসভবনে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনেন এবং খাতুনে জান্নাত শাহাজাদী হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে এরশাদ করলেন, সামান্য পানি নাও। ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গাছের তৈরী পাত্র করে পানি নিয়ে হাজির হলেন। সেই পানির মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামান্যতম স্বীয় নুরানী থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন এবং হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, তুমি নিকটে আস। তিনি যখন নিকটে গেলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ পাত্র হতে সামান্য পানি নিয়ে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বুকের মধ্যে ও মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার এই কন্যা ফাতেমাকে এবং তাঁর ভবিষ্যত আউলাদগণকে তোমার কাছে সমর্পন করলাম, তারা যেন শয়তানের খারাবী হতে রক্ষা পায়।"

এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরো কিছু পানি নিয়ে আস। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এতে বুঝতে পারলাম যে, এখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি করবেন? তখন আমি দাঁড়িয়ে আরো কিছু পানি নিয়ে আসলাম। সেই পানিতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নুরানী থুথু মোবারক নিক্ষেপ করে আমাকে বললেন, তুমি সামনে আস।

টীকাঃ-১ যখায়েরুন উক্‌বা-৩২ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মাজালেস ২য় খন্ড ২২৪ পৃষ্ঠা

আমি দাঁড়িয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে হাজির হলাম। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ পাত্র হতে নূরানী হাত মোবারকে কিছু পানি নিয়ে আমার মাথা এবং শরীরে ছিটিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُعِيْذُهٗ بِكَ وَذُرِّيَّتَهٗ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তাকে এবং তার ভবিষ্যত আউলাদগণকে শয়তানের খারাবী থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমার আশ্রয়ের মধ্যে সমর্পন করলাম।

অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْبَرَكَاتِ

এটা পড়ে নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার বিবির নিকট যাও।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নুরানী বিবাহের দিনই এশার নামাযের পরে তাশরীফ আনলেন এবং পানির পাত্রে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করে সুরা ফালাক ও সুরা নাসসহ উক্ত দোয়া পড়ে থুথু মোবারক দিয়ে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দিলেন, এ পানি পান কর। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অযু করলেন এবং খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, এ পানিগুলি পান কর। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার অযু করলেন এবং দোয়া করলেন, 'হে খোদা! এ দুই আত্মা আমার হতে, আমিও তাদের হতে। হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি নাপাকী দূর করে পুতঃপবিত্র কর, সেভাবে এ দুইজনকে তুমি পুতঃপবিত্র করে দাও।" এরপর উভয়কে বললেন, তোমরা তোমাদের আরামগাহে যাও এবং দোয়া করলেন, হে খোদা! তাদের মধ্যে মিল মুহব্বত দান কর আর তাদের আউলাদের মধ্যে বরকত দান কর এবং তাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা দুর করে দাও এবং তাদের নেকীই তাদের অংশ করে দাও আর তাদের মধ্যে অধিক পবিত্র আউলাদ দান কর।[1]

টীকাঃ- ১ মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহোত্তর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ওয়ালিমার আয়োজনঃ

বিবাহোত্তর স্বামী কর্তৃক বিবাহকে উপলক্ষ করে যে খানা-পিনার আয়োজন করা হয় তাকে 'অলিমা' বলে। মুলতঃ এটাই সুন্নত। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি অলিমার ব্যবস্থা কর। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার নিজের লোহার পোশাকটি এক ইহুদীর নিকট বন্দক দিয়ে এর বিনিময়ে কিছু যব নিয়ে এলেন। এ ছাড়া আরো কয়েক ছা (১ ছার পরিমান ৪ কেজি) যব, খেজুর এবং হাইছ (খেজুর, পনীর, ঘি দিয়ে তৈরীকৃত হালুয়া) ছিল। এই ধরনের ওয়ালিমার আয়োজন ঐ যুগে সর্বোত্তম অলিমা হিসেবে সাব্যস্থ হল এবং ঐ যুগে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অলিমা থেকে উত্তম অলিমা আর হয়নি। হযরত যাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমরা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলাম। ঐ ঘর মোবারকটি অতুলনীয় সুগন্ধীতে ভরপুর ছিল। আমরা সেখানে খেজুর, কিসমিস নিয়ে অলিমা হিসেবে খেয়েছি। এছাড়া আনসারের পক্ষ থেকে হযরত সাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একটি মেষ বা ভেড়া দিলেন। আর অন্যান্যরা নিজেদের পক্ষ থেকে একেকটি জিনিস দিয়ে অলিমা অনুষ্ঠানের খানা-পিনার আয়োজন সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করলেন।[1]

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ আমাদের দেশে বিবাহের সময় বরপক্ষ মেয়ে পক্ষের উপর বরযাত্রী খাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, এটা মেয়ে পক্ষের উপর জবর হয়। জবর তথা অপ্রত্যাশীত চাওয়া-পাওয়ার জন্য কামনা করা উচিত নয়। বরং বর পক্ষের উচিত সুন্নতি তরীকায় অলীমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। যা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিবাহোত্তর অলীমা অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে খানা-পিনার ব্যবস্থা করে লোকদের আপ্যায়ন করা হয়েছে। এভাবে করাই হলো ইসলামী তরীকা। এ পদ্ধতি যারা অনুসরণ করবে তাদের পক্ষ থেকে ভাল বংশের সন্তান-সন্ততি আশা করা যাবে। আর যারা ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে তারা দ্বীন-দুনিয়া দু'জাহানে কামিয়াবী হাসিল করতে সক্ষম হবে। আর যারা এটার অনুসর না করে জোর জবরের মাধ্যমে মেয়ে পক্ষ থেকে যৌতুক তথা অধিক বর যাত্রীকে আপ্যায়ন করানোর দাবী আদায়ের চেষ্টা করে তাদের পারিবারিক, সামাজিক তথা সার্বিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয় না বিধায় তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

টীকাঃ-১ যখায়েরুল উক্বা ৩২ পৃষ্ঠা, মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পারিবারিক জীবন

পারিবারিক কাজে নবী নন্দিনী সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)

হুজুর শাহেন শাহে দোআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহেবজাদী সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পারিবারিক জীবনে নিজের কাজ নিজে আঞ্জাম দিতেন। তিনি নিজ হাতে ঘরে ঝাড়ু দিতেন এবং নিজ হাতে চাক্কি দ্বারা গম পিষনের দায়িত্ব পালন করতেন। যার কারণে তাঁর হাতের মধ্যে জট পড়ে যেত। তিনি নিজ হাতে রান্না করতেন, মশকের দ্বারা পানি ভর্তি করে আনতেন। যদ্দরুন হাত ও শরীর মোবারকে যখম হয়ে যেত। আর তিনি স্বয়ং আগুনের নিকটে বসে অনেক গরম বা তাপ সহ্য করার মাধ্যমে খানাপিনা তৈরী করতেন। এ সমস্ত কাজ নিজে আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি শাহেন শাহে দু'আলমের শাহ্জাদী হবার পরও স্বামী হযরত মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)এর খেদমত থেকে নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত রাখেন নি। বরং যথাযথ খেদমতে সর্বদা সচেষ্ট থেকে স্বীয় জীবনকে মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এরপরেও তিনি কখনও এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা করেননি। আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাহাজ্জুদের নামায সবসময় আদায় করতেন। আর কোরআন তিলাওয়াতে সর্বদা মশগুল ছিলেন।[১]

উপদেশঃ পারিবারিক কাজ মেয়েদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বামী, শাশুড়-শাশুড়ী, ছেলে-মেয়েদের জন্য রান্না-বান্নার কাজে গৃহকর্ত্রীকে দায়িত্ব পালন করতে হয়, এ দায়িত্ব পালন সুন্নতে ফাতেমার মধ্যে গন্য হবে। যা নারী আদর্শের মধ্যে অনন্য সোপান। যেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবী-নন্দিনী উদারহস্ত, সেই আদর্শের প্রতি অবশ্যই নারী সমাজের সচেতনতা থাকা আবশ্যক। এ সচেতনতাই নারী সমাজের দায়িত্বানুভূতির পরিচায়ক। এ দায়িত্ব পালনে যারা কুন্ঠাবোধ করবে তারা নারী সমাজের আদর্শের প্রতীক হতে পারে না।

টীকাঃ-১ সিরাতুস সাহাবীয়াত-সূত্র খুতবাতুল মুহররম ২৬৫ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা ২১১পৃষ্ঠা

কেননা যেটা নবী নন্দিনী মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মধ্যে ছিল সেটাই ইসলামী আদর্শ। এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয্ যাহ্রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অবদান অনস্বীকার্য। যারা এ আদর্শকে মানবে ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে তারা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আদর্শে আদর্শিত হবে। আর যারা মানবে না কিংবা সেটাকে লজ্জাকর বিষয় বলে হেয় প্রতিপন্ন করবে তাদের সাথে ইসলামী আদর্শের কোন মিল নেই এবং তারা কোন নারী সমাজের আদর্শের প্রতীক হতে পারে না। আর যারা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আদর্শে আদর্শিত তারা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতকারী হবে তাদের জন্য জাহান্নাম হারাম। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে-

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم انّ الله تعالى فطم ابنتى فاطمة ولدها ومن احبهم من النار

(رواه امام على ابن موسى الرضى فى مسند كذا في ذخائرا العقبى ورواه النسائى ايضًا.)

অর্থাৎ- আমার কন্যা ফাতেমার এবং তাঁর বংশধরকে এবং তাঁর ভক্ত অনুসারী এবং তাঁর আদর্শে আদর্শবান নর-নারীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।[১]

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ঘরে খাদেম আনার কৌশিষ ঃ

বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) চাক্কী পিষতে পিষতে স্বীয় হাতে জট পড়ে গেলে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এ ব্যাপারে স্বামী সুলভ কষ্টের কথা জানালে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অনেক তাগাদার পর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) একজন খাদেমের জন্য প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে একথা না বলে পুনরায় স্বামীর ঘরে চলে আসেন। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন এমতাবস্থায় যে, তারা উভয়ে একটি চাদরের মধ্যে ছিলেন। যে চাদরটা এমন ছিল যে, লম্বা করে দিলে পিঠ দেখা যায় আর প্রশস্থ করে দিলে পা ও মাথা দেখা যায়। এমনি সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আগমনের সংবাদ পেয়ে তার ঘরে এসে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আম্মাজান!

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উকবা ২৬ পৃষ্ঠা

তুমি আমার কাছে গিয়ে চলে এসেছ? আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি তদুত্তরে বললেন, না। আমার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। তখন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) চাক্কি পেষতে পেষতে হাতের জট পড়ে যায়। তজ্জন্য আমি তাঁকে আপনার কাছে একজন খাদেমের জন্য প্রেরণ করেছে।[১]

উল্লেখ থাকে যে, এ খাদেমের কথা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নিজে বলেন নি। বরং তাঁর কষ্টের কথার অনুভব করে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বারগাহে রেসালতে এ কথাটি উপস্থাপন করেন। যদিও কিছু কিছু বর্ণনাতে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন বলে বর্ণিত আছে, সেটা মূলতঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পক্ষ হয়ে বলেছেন; হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নয়।

আর প্রথমে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নবীজির দরবারে গিয়েছেন, সেটা মূলতঃ স্বামী মওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নির্দেশ পালনার্থে গিয়ে ভয় ও লজ্জার কারণে না বলে পুনরায় ফিরে এসেছেন।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খাদেমের পরিবর্তে তদবীর প্রদানঃ

প্রথমতঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে খাদেমের ব্যাপারে এমন একটি তদবীর দিলেন, যা উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর এবং যে খাদেম চাচ্ছে সেই খাদেম থেকেও তা উত্তম। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, তোমরা যখন বিছানায় আরাম করতে যাবে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' আর ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' আর ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' পড়বে। এই তাসবীহগুলো তোমাদের আকাঙ্খিত খাদেম থেকেও উত্তম।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে এই তাসবীহগুলো সব মিলে উচ্চারণ হচ্ছে ১০০ বার আর তা আমলের পরিমাপে ১০০০ বার।

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, এই ১০০ তাসবীহ তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে সব দিক দিয়ে তোমাদের জন্য উত্তম।

টীকা- ১ ঃ যখায়েরুল উক্‌বা ৪৯ পৃষ্ঠা, মসনদে ফাতেমাতুয যাহ্‌রা ২১২ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে খাদেম তলব করলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে এ দোয়াটা শিখিয়ে দিলেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَ شَيْءٍ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

অর্থাৎ-হে আল্লাহ! আপনি সাত আসামন ও সাত জমিন এবং মহান আরশের অধিপতি। হে আমাদের প্রতিপালক ও প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা! আপনি বীজ ও দানা প্রভৃতির সৃষ্টিকারী। আর আপনি হচ্ছেন (আসমানী গ্রন্থ) তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও ফুরকান (কুরআন শরীফ) অবতীর্ণকারী আমি প্রত্যেক খারাপ ও নিন্দনীয় বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি হচ্ছেন কপালের চুল ধরে পকাড়কারী আপনিই হচ্ছেন প্রথম। অতঃপর আপনার পূর্বে কোন বস্তু ছিল না এবং আপনিই হচ্ছেন শেষে। অতঃপর আপনার পরে ও কোন বস্তু থাকবে না এবং আপনিই প্রকাশকারী। অতঃপর আপনার উপরে কোন বস্তু ছিল না। আর আপনিই হচ্ছেন গোপনকারী আপনার বিপরীত কোন বস্তু নেই। আপনি আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আপনি আমাদেরকে অভাবী থেকে ধনী করে দিন।[১]

খাদেমের ব্যাপারে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাসবীহে ফাতেমাঃ

প্রথমতঃ বর্নিত আছে যে, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে খাদেম তালাশ করার জন্য পাঠালেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সন্ধ্যা বেলায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

টীকাঃ ১ মুসলিম শরীফ, তিরমিযি শরীফ, বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৪০৩ পৃষ্ঠা, যখায়েরুল উক্‌বা ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠা, মসনদে ফাতেমাতুয যাহ্‌রা ২১৩, ২১৪, ২৯২ পৃষ্ঠা।

ওগো আমার নয়নের মনি ফাতেমা! আমাকে তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে? তখন ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, না। আমি শুধু আপনাকে সালাম করার জন্য এসেছি। আর লজ্জার কারণে খাদেমের কথা প্রকাশ না করে ঘরের মধ্যে ফিরে আসলে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনাকে প্রেরন করেছি, অতঃপর আপনি কি করছেন? তখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এ ধরনের চাওয়া আমি লজ্জাবোধ করছি।

দ্বিতীয়তঃ পরদিন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে একজন খাদেমের কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। যে খাদেমের দ্বারা ঘরের কাজ সহজ হয়ে যায়। এরাত্রেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি পুনঃরায় বললেন, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। মনে মনে ঐ কথা গোপন করে লজ্জার কারণে তা না বলে চলে আসেন।

তৃতীয়তঃ এবার তৃতীয়দিন রাত্রে স্বয়ং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, চলুন, আমিও যাব। উভয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আক্বদছে হাজির হলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কি প্রয়োজনে তোমরা দু'জন এ সন্ধ্যা বেলায় আমার কাছে এসেছ? তখন মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, আমাদের উপর পারিবারিক কাজ আঞ্জাম দিতে কষ্ট হচ্ছে তাই আমাদের পারিবারিক কাজের জন্য একজন খাদেমের ব্যাপারে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন ,

هل أدلّكما على خير لكما من حمر النعم؟ قال على نعم يا رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে তোমাদের উভয়ের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য মঙ্গলময় কাজ কি দেখিয়ে দেব না? যা লাল বর্ণের উটের চেয়েও উত্তম। (যে উট বেশি কাজ করতে পারে) উভয়ের হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়া করে আপনি বলুন। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

تكبّران وتسبّحان وتحمّدان مائة حين تريدان تناما ن فتناما ن على الف حسنة ومثلها حين تصبحان فتقومان على الف حسنة.

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহু আকবর (৩৪ বার), সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার), আর আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) পড়বে যেগুলো মিলে ১০০ বার হয়। ফলে তোমরা যখন নিদ্রা যাও তখন তোমাদের নিদ্রা যাপনে ১হাজার পূণ্য হবে আর যখন তোমরা সকালে ঘুম থেকে উঠবে তোমাদের পূণ্য হবে ১ হাজার।

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি উক্ত দোয়া হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শেখার পর কখনও আর ছেড়ে দিইনি। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ছিফিফনের[১] রাত্রেও কি আপনি তা ছেড়ে দেননি? উত্তরে তিনি বলেন, সিফিফনের প্রথম রাত্রে আমি ভুলে গিয়েছি। শেষ রাত্রে মনে পড়লে তা পুনঃরায় পড়ে দিয়েছি।[২]

চতুর্থতঃ আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গর্ভাবস্থায় (সম্ভবত ইমাম হাসান এর) ছিলেন, এমতাবস্থায় রুটি তৈরী করার সময় আগুনের ফুল্কি তাঁর পেট মোবারকে লেগেছিল। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে খাদেম তালাশ করেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

لاأعطيك وأدع اهل الصفّة تطوى بطونهم من الجوع على ادلّك على خير من ذالك أذا أويت إلى فراشك تسبحين الله تعالى ثلاثًا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه أربعًا وثلاثين.

অর্থাৎ তোমাকে খাদেম দেয়ার প্রয়োজন নেই। আহলে সুফ্ফাকে[৩] ডাক, তারা ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধেছে। মা জননী! তোমাকে কি এমন দোয়া শিখিয়ে দেব না ? যেটা তুমি চাচ্ছ সেটা থেকে উত্তম। তুমি যখন বিছানায় শুইতে-যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে, ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ পাড়বে এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পড়বে।

টীকাঃ-১ সিফিফনের যুদ্ধ হচ্ছে যা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। টীকাঃ -২ মসনদে ফাতেমাতুয যাহরা ২১৩, ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা, টীকাঃ-৩ যারা নবীজির দরবারে খাদেম হিসেবে থাকতেন

পঞ্চমতঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর আরেক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন চাক্কি পেষতে পেষতে হাত মোবারকে জট এসে যায়। এমতাবস্থায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে কিছু বন্দী আসলে সেখান থেকে একজন খাদেম চাইতে এসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে না পেয়ে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে একথা বলে চলে আসেন। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়ি তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসার ধরন বুঝতে পেরে আমরা উঠে যেতে লাগলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের অবস্থায় থাক। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যখানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে পড়েন। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবীজির পায়ের শীতলতা আমি অনুভব করি। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব না (?) যা তোমাদের খাদেম থেকে উত্তম? তোমরা প্রত্যেক নামায শেষে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পড়বে। আর তোমরা যখন বিছানায় শয়ন করবে তখনও এ তাছবীহগুলো পড়বে। এটা সব মিলিয়ে ১ শত তাসবীহ।[১]

ষষ্ঠতঃ অপর এক বর্ণনার মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

اصبرى يا فاطمة بنت محمّد فإنّ خير النساء التى نفعت اهلها اوّلا ادلّكما على خير من الذي تريدان اذا اخذتما مضجعكما فكبراً الله ثلاث وثلاثين تكبيرة واحمد الله ثلاثا وثلاثين وسبحا الله ثلاثا وثلاين ثم اختماها بلا إله إلاّ الله فذلك خير لكما من الذى تريدان ومن الدينا وما فيها.

অর্থাৎ হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। অতঃপর উত্তম মহিলা হল যারা পরিবার পরিজনকে ইহকালীন ও পরকালীন উপকার করবে। তোমরা যে জিনিস (খাদেম) চাচ্ছ, এটা থেকে উত্তম জিনিসের (খাদেমের) শিক্ষা কি তোমাদেরকে দিব না? তোমরা যখন বিছানায় যাবে তখন আল্লাহু আকবর ৩৩ বার বলবে এবং আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার বলবে আর সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, এরপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ে শেষ করবে। এটা তোমরা যা চাইতেছ তা থেকে উত্তম। বিশেষ করে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল সম্পদ হতে এটা সর্বোত্তম।[২]

টীকাঃ-১ মসনদে ফাতেমাতুয যাহরা ২১৬ পৃষ্ঠা, টীকাঃ- ২ মসনদে ফাতেমাতুয যাহরা ২১৯ পৃষ্ঠা।

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ উপরোল্লেখিত বর্ণনাদি থেকে বুঝা যায়, বর্ণনার মধ্যে এসেছে রাত্রি বেলায় শয়নকালে তাসবীহগুলো পড়া আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, নামাযের পর ও শয়নকালে উভয় অবস্থায়। সুতরাং উভয়টাই ধর্তব্য। এগুলো পড়ার হেকমত হচ্ছে যে, এ তাসবীহগুলো পড়ার বিনিময়ে খাদেমের দ্বারা যে কাজ করা হবে, সেই কাজ ঐ তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে বাড়ী ওয়ালার পারিবারিক সমস্ত কাজ সহজতরভাবে আঞ্জাম পাবে। এমনও মনে হবে যে, অলৌকিকভাবে কেউ এ কাজ করে দিচ্ছে, অধিকন্তু সওয়াব তো আছেই। উপরন্তু বাস্তবে সকল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম হবে এবং ঘরের কাজ করতে কোন কষ্টবোধ হবে না। পাশাপাশি এটার মধ্যে উম্মত ও মানবজাতির জন্য শিক্ষাও রয়েছে যে, নিজের কাজ নিজে করবে চাকর-চাকরানীর মাধ্যমে নয়। আর নিজের কাজ নিজে করলে যে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দতা পাওয়া যায়, চাকর-চাকরানীর মাধ্যমে তা পাওয়া যায় না। আর নিজের কাজ নিজে করলে যেই আন্তরিকতা পাওয়া যায় চাকর-চাকরানীর মধ্যে সেই আন্তরিকতা থাকে না বিধায় তার মধ্যে সেই ফায়দা পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এটার কুফলও পরিলক্ষিত হয় বিধায় নিজের কাজ নিজে করাই শ্রেয়। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে এটা শিক্ষা দিয়ে উম্মতের নর-নারীর প্রতি আদর্শ স্থাপন করেছেন। যারা এ নিয়তে পড়বে বাস্তবিক পক্ষে তারা সেটার চাক্ষুষ ফল ভোগ করবে। ইনশাল্লাহ।

অষ্টম অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর এবাদত বন্দেগী

রান্নার কাজের সময় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কুরআন তিলাওয়াত ঃ

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) খাবার রান্না করার সময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযের জন্য হুজরা শরীফ হয়ে মসজিদে নববী শরীফে যেতেন, তখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘর মোবারকের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিতেন। আর ঘর থেকে চাক্কির আওয়াজ শুনতে পেতেন। তখন আল্লাহর দরবারে বিনয় কণ্ঠে দোয়া করতেন, ইয়া আরহামার রাহেমীন! তুমি ফাতেমাকে এই রেয়াজত এবং এই স্বল্পে তুষ্টির উত্তম বদলা বা প্রতিদান দান করুন এবং তাঁকে এই দুনিয়াবী অভাবের উপর অটল রাখুন। যা তাঁর জন্য উত্তম এবাদতের মধ্যে শামিল।[১]

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রাত্রি জাগরণ ঃ

হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একবার আমি আমার আম্মাজান খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে দেখেছি যে, তিনি সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করছেন। কিন্তু দোয়ার মধ্যে নিজের জন্য দোয়া করতে দেখিনি। বরং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য দোয়া করতেন।[২]

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এবাদত বন্দেগীর বৈশিষ্ট্য ঃ

হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি আমার ওয়ালেদায়ে মাজেদা হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে সর্বদা দেখতাম যে, তিনি বাসভবনের এক কোনায় সারা রাত নামাযরত অবস্থায় থাকতেন। এভাবে ফযর হয়ে যেত।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নামাযের সিজদার মধ্যে থাকত। এভাবে রাত কেটে ফযর হয়ে যেত। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি রাতকে আর একটু বড় করতে (!) তাহলে আমি আরো কিছুক্ষণ তোমার দরবারে সিজদা অবস্থায় থাকতাম।[৩]

টীকাঃ ১,২,৩ মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ৫৪৩ পৃষ্ঠা, সফিনায়ে নূহ ১৭১ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা ২১৫ পৃষ্ঠা।

কবির ভাষায়-

وہ شب بدار وصرف رکوع وسجدہ پیہم
وجن کي ذات پر نازاں حضور رحمت عالم.

উচ্চারণঃ ওহ্ শবে বেদার ওয়া ছরফে রুকূ ওয়া সিজদা পয়হাম
ওয়া জিনকী জাত পর নাযাঁ হুজুরে রহমতে আলম

অনুবাদঃ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক শুধু রুকু সিজদার মধ্যে ঐ রাত্রি জাগরনের উপর রাহমাতুল্লীল আলামীন ফখর করতেন।[১]

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাজে ফেরেশতাদের সহযোগিতা ঃ

বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে আয়মন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, একদা রমজান মাসের রোদ্রময় দুপুরের সময় আমি খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বাসভবনে গেলাম। এ সময়ে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। বাহির থেকে শুনতেছি আটার চাক্কি চলতেছে। আমি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম যে, হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আটার চাক্কির পার্শ্বে ঘুমাচ্ছেন আর ঐ দিকে চাক্কি নিজে নিজে চলতেছে, আর হযরত হাসনাইনে করীমাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর দোলনাও নিজে নিজে দুলতেছে। এ ঘটনা দেখে আমি আশ্চার্য্য হলাম। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে গিয়ে এ ঘটনার বিবরণ দিলাম। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন যে, অধিক গরমের অবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রোযা রাখেন। রোযার দূর্বলতা কাটার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর উপর গভীর নিদ্রা দিলেন, এদিকে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর একাজ আঞ্জাম দেয়। তাইতো কবি সুন্দরই বলেছেন-

وہ خاتون جناں معصوم حوریں باندیاں جنکی
ملك جنّت سے آکر پستے تھے چکیاں جنکي.

উচ্চারণঃ- ওয়া খাতুনে জাঁ মাছুমে হুঁরি বান্দীয়া জিনকি,
মালাক জান্নাত ছে আকর পিছতেতে ছক্কিয়া জিনকি।

টীকাঃ-২ সফিনায়ে নূহ ১৭১ পৃঃ

অনুবাদঃ তিনি ঐ খাতুনে জান্নাত যার খাদেমা হিসেবে নিয়োজিত আছেন বেহেশ্‌তের নিষ্পাপ হুরেরা। বেহেশ্‌ত থেকে ফিরিশ্‌তা এসে যার চাক্কি পিষতেছে।[১]

কাজের মধ্যেও সর্বদা কোরআন তিলাওয়াতে মশগুলঃ

হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে একদা প্রিয় নবী (দঃ) হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হাসনাইনে করীমাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে দোলনা দ্বারা পাখা করছে এমতাবস্থায় যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় জবানে পাকা দ্বারা কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটা দেখে আমার হৃদয়ে এ অনুভূতি সৃষ্টি হল যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে কতই না আগ্রহী এবং নেক বন্দিনী। আর তিনি তিলাওয়াতে কালামে পাক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত ছিলেন না।[২]

মাসয়ালাঃ এটা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছেলেদের দোলনায় কোরআন তিলাওয়াত করছেন। আর বর্তমানে আমাদের সমাজের নারীরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে গান-বাজনা, টি.ভি, ভি.সি.আর শুনে এবং তাদেরকে সেগুলোর ছবি দেখানোর মাধ্যমে শান্তনা দেয়। এটা বড়ই আফসোসের কথা যে, নাজায়েয পন্থায় সন্তানদেরকে শান্তনার বাণী শুনাচ্ছে। তাই আমাদের সমাজে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সুন্নত প্রবর্তনই সময়ের দাবী। সন্তানদেরকে কোরআন তিলাওয়াত, নাত শরীফ, হামদ, গজল প্রভৃতি শুনানোর মাধ্যমে সত্যের পথে ইসলামী তরীকায় উদ্বুদ্ধ করে শান্তনার বাণী শুনাতে হবে। কেননা কোরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে-

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরই মুমেনের অন্তরের শান্তি আনয়ন করে।

কেউ কেউ বলে, মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ গান শুনি। এ স্বভাব ভাল নয়। এটা না জায়েয। কেননা গান দুনিয়াবী আসক্তির প্রতি মানুষকে ধাবিত করে। তাই এগুলি সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। আল্লাহর জিকিরই মুমেনদের অন্তরে শান্তি দায়ক। প্রকৃত মুমেন কোন দিন গান-বাজনায় নিজেকে লিপ্ত রাখবে না। বরং কোরআন তিলাওয়াতসহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জিকিরকে নিজের অন্তরে স্থান দিবে। এটাই হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়।

টীকা-১ ঃ মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ৫৪৩ পৃষ্ঠা, সফিনায়ে নূহ ১৭১ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা ২১৫ পৃষ্ঠা।

টীকা-২ ঃ সফিনায়ে নুহ ১৭১ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা ২১৫ পৃষ্ঠা

অভাব অনটনে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ধৈর্য্য ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে ক্ষুধার্ত থাকে, কিয়ামত দিবসে কাঠিন্যতা থেকে সে রক্ষা পাবে।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমরা বেহেস্তের দ্বার বার বার কড়াঘাত করতে থাক। আমি আরজ করলাম, হুজুর বেহেস্তের দ্বার কিভাবে কড়াঘাত করব? উত্তরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার মাধ্যমে।[২]

মূলতঃ এই শিক্ষা স্বয়ং রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরই। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

الفقر فخرى ورداى

অর্থাৎ অভাব অনটন আমার গৌরব এবং আমার চাদর।

হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘর মোবারকে তিন দিন পর্যন্ত গমের রুটি (তথা কোন খাবার) কেউ খায়নি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং নবী পরিবারের কেউ কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় না খেয়ে অতিবাহিত করতেন। আর যখন আহার করতেন, তখন যবের মোটা রুটি আহার করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এরশাদ করেন, কখনও হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেট ভরে কিছু আহার করেননি। আবার অভাব অনটনের কথাও কারো নিকট প্রকাশ করেননি। কখনও এমন অবস্থা হত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভাব দেখে আমাদের কান্না আসত। স্বয়ং আমি আমার হাত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেট মোবারকের উপর মালিশ করে দিতাম এজন্য যে, ক্ষুধার কারণে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যে কষ্ট হত তা লাঘবের উদ্দেশ্যে। তখন আমি বললাম, আমার জান আপনার উপর কোরবান, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া হতে এমন কিছু গ্রহণ করতেন, যা দ্বারা আপনার শরীর স্থির থাকে; তাহলে তা যথেষ্ট হত না (?)।

উত্তরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হে আয়েশা! দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাশীল নবীগণ আমার থেকেও কঠিন অবস্থায় সম্মুখীন হয়েছেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করেছেন।[৩]

টীকাঃ-১ কানজুল উম্মাল-সূত্র সফিনায়ে নূহ ১৬৫ পৃষ্ঠা।

টীকাঃ-২ কিমিয়ায়ে সাআদত- সূত্র সফিনায়ে নূহ ১৯৫ পৃষ্ঠা

টীকাঃ-৩ শেফা শরীফ-কাজী আয়াজ (রাঃ)-সূত্র সফিনায়ে নুহ-১২৭ পৃষ্ঠা

দুনিয়ার ধন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হস্তগত, তবুও নবী পরিবার বিমুখ ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) সহ সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থান করছেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম)কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে হক নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আজকে রাত্রে খাওয়ার জন্য নবী পরিবারের মধ্যে এক মুষ্টি আটাও নেই আর এক মুষ্টি চাতুও নেই। একথা শেষ হতে না হতেই আসমান থেকে একটা বিকট আওয়াজ আসলে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! এটা কিসের আওয়াজ? উত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আরজ করলেন, হযরত ইস্রাফিল (আলাইহিস্ সালাম)এর উপর আপনার দরবারে হাজির হবার নির্দেশ হয়েছে। অতঃপর তিনি হাজির হয়ে বললেন, আপনার কথা আল্লাহ শুনেছেন এবং আমাকে প্রেরণ করে নির্দেশ দিলেন যে, জমিনে যা গুপ্তধন আছে সব আপনার খেদমতে পেশ করার জন্য এবং মক্কা নগরীর সমস্ত পাহাড় গুলিকে জমরত, ইয়াকুত, চান্দি, স্বর্ণ বানিয়ে দেয়ার জন্য। যদি আপনি এটার উপর রাজি হন তাহলে এক্ষুনি আমি একাজ করে দিব। আর আপনার উপর আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, আপনি যদি দুনিয়ায় বাদশা নবী হতে চান, তাহলে সেটাও হতে পারেন অথবা বান্দা নবী হতে চান, সেটাও হতে পারেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আমি বান্দা নবী হতে চাই।

মাসয়ালাঃ এতে বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভাব অনটনকে স্বয়ং নিজেই গ্রহণ করে নিলেন এবং এটাকে দুনিয়ার বাদশাহীর উপর প্রাধান্য দিলেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সেই আদর্শ তাঁর বিবিগণ ও আউলাদগণের মধ্যে বিস্তৃতি ছিল। যার উপমা দুনিয়ার আর কোন পরিবারের মধ্যে নেই।

ক্ষুধার কারণে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চেহারা মোবারক ফ্যাকাসে হওয়া ও নবীজির দোয়া ঃ

হযরত ইমরান বিন হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাশরীফ নিয়ে আসলেন। তাঁর চেহারা মোবারক ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চেহারা মোবারক দেখে চিনতে পারেন যে, ক্ষুধার কারণে তাঁর এরকম হয়েছে। তখন

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আঙ্গুল মোবারককে তাঁর কণ্ঠ মোবারকে রেখে আঙ্গুল সমূহকে প্রশস্ত করে এ দোয়া করলেন-

اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وسلم قال عمران فنظرن اليها وقد ذهبت الصفرة من وجهها فلقيتها بعد فسألتها فقالت ما جعت بعد يا عمران.

অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে পূর্ণরূপে আহার দানকারী, নিম্নকে বুলন্দকারী হে আল্লাহ! তুমি ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুলন্দ কর। হযরত ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চেহারা মোবারক থেকে সেই ফ্যাকাসে ভাব চলে গেল। এরপর আমি হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে সাক্ষাত করে ক্ষুধার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দোয়ার পর আমি আর কখনো ক্ষুধা অনুভব করিনি।[১]

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ক্ষুধার্ত থেকে ভিক্ষুককে আহার দান ঃ

হযরত ইমাম আলী মকাম শাহজাদায়ে কাউনাইন ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমাদের ঘরে পূর্ণ খাদ্যের আহারের ব্যবস্থা হল। পিতা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) , আমি এবং ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আহার গ্রহণ করেছি। আম্মাজান খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এখনো খেতে বসেন নি। এমতাবস্থায় ঘরের দরজায় এক ভিক্ষুক এসে কিছু চেয়ে বলল, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদরের কন্যার উপর সালাম প্রেরণ করি, আমি দুই ওয়াক্তের ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক, আমাকে আহার দেন। এ কথা শুনে আম্মাজান আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, এ খাবারগুলি ঐ ভিক্ষুককে দিয়ে আস, আমিতো এক ওয়াক্তের ক্ষুধার্ত হলাম আর এ ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের ক্ষুধার্ত।[২]

টীকাঃ-১ বায়হাকী, খাছায়েছে কুবরা-সূত্র সফিনায়ে নূহ ১৯৮ পৃষ্ঠা

টীকাঃ ২ সিরাতে ফাতেমা-সূত্রঃ সফিনায়ে নূহ ১৬৮ পৃষ্ঠা

নবী পরিবারের অলৌকিক্ব ভোগ নয় ত্যাগেই সূখ ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, বনী সুলাইমের এক ব্যক্তি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হয়ে বেয়াদবীমূলক এই ব্যবহার করল যে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি ঐ জাদুকর! যার সম্পর্কে আমার গোত্রের লোকেরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে এই কথা আমার মনে না আসলে আমি এ তরবারী দিয়ে আপনার শীর মোবারক উঠিয়ে দিতাম। হযরত ফারুকে আযম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অগ্রসর হলেন যে, এই বেয়াদবের বেয়াদবীমূলক উক্তির শাস্তি দিতে। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বারন করে দিলেন। আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আখেরাতের শাস্তি ও দোযখের আযাবকে ভয় কর? মুর্তিপূজা ছেড়ে দাও, এক আল্লাহর এবাদত কর। আমি জাদুকর নই বরং আল্লাহর একজন প্রেরিত রাসূল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর কথা ঐ ব্যক্তির অন্তরে তীরের ন্যায় আঘাত করল। ফলে ঐ ব্যক্তি হতে হত্যাজনিত ক্রোধ পশমিত হয়ে মুর্তি পুজারীর অন্ধ আক্বীদা দূরীভূত হয়ে গেলো এবং আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে নূরানী হাত মোবারকে ঈমান গ্রহণে ধন্য হল। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)কে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে কিছু কোরআনের আয়াত শিক্ষা দাও। যখন ঐ ব্যক্তি কিছু কোরআনের আয়াত শিখে নিলেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি পরিমাণ মাল আছে? প্রদুত্তরে নব মুসলিম লোকটি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বনী সুলাইম গোত্রের মধ্যে ৪ হাজার লোক আছে তন্মধ্যে আমার ন্যায় গরীব আর কেউ নেই। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম (আলাইহিস সালাম) এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তাঁকে ১টি উট ক্রয় করে দিবে? যার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা দাতাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। হযরত সাদ বিন ওবাদাহ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার নিকট একটি উষ্ট্রী আছে আমি তাঁকে তা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আর কে আছ? যে এ ব্যক্তির মাথা ঢেকে দেবে এবং আল্লাহকে রাজী করবে? এতে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু) স্বীয় পাগড়ী মোবারক খুলে তার মাথার উপর অর্পণ করলেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আর কে আছ? যে এ ব্যক্তির জন্য এ ওয়াক্তের খাবারের আয়োজন করবে? একথা শুনে হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উঠে কয়েক ঘরে কিছু খাবার তালাশ করলেন। অবশেষে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের দরজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে কড়াঘাত করলে আন্দরমহল থেকে তিনি বললেন, দরজায় কে হাজির হয়েছে? হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, শাহজাদী আমি সালমান ফারসী আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আপনার কিভাবে আগমন হল? তখন সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, একথা শুনে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কান্নাভাব চলে আসল এবং বললেন, হে সালমান ফারসী! আল্লাহর শপথ! যিনি আমার পিতাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আজ তিন দিন যাবত আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছি। আপনি যখন নবী পরিবারের কাছে এসেছেন কিভাবে খালি হাতে যাবেন। এই নেন আমার এ চাদর মোবারকটি নিয়ে শামুন ইহুদীর কাছে গিয়ে বলবেন, এ চাদর শরীফটি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর, এটা রেখে কিছু কর্জ প্রদান করুন। হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ চাদর শরীফটি নিয়ে শামুন ইহুদীর নিকট গিয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে শামুন ইহুদী এ চাদর শরীফটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবলোকন করতে ছিলেন। দেখতে দেখতে তার মধ্যে একভাব সৃষ্টি হলে তিনি বললেন, হে সালমান ফারসী! এরা ঐ পবিত্র পরিবার, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) এর তাওরাত কিতাবের মধ্যে বর্ণনা দিয়েছেন। আমি সৎ অন্তরে পরিস্কার মন নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আব্বার উপর ঈমান আনয়ন করলাম। একথা বলে তিনি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে যা দেওয়ার প্রয়োজন তা দিলেন। আর তাঁকে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চাদর মোবারকটিও ফেরত দিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) শামুনের জন্য দোয়া করলেন এবং তার থেকে সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যে সব আনলেন হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তা পিষে রুটি তৈরী করে সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট অর্পণ করে দিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরজ

করলেন, শাহজাদী এখান থেকে ছেলেদের জন্য কিছু রাখেন। হযরত সৈয়্যদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, আল্লাহর রাস্তার মধ্যে যখন এটা দেয়ার জন্য নিয়ত করেছি রান্না করেছি, এখান থেকে নেয়া প্রযোজ্য হবে না বিধায় আপনি তা নিয়ে যান। হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঐ রুটিগুলো হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ নতুন মুসলমানকে রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নূরানী ঘর মোবারকে তাশরীফ নিয়ে এসে দেখলেন যে, হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর চেহারা ক্ষুধার কারণে ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং তার শরীর মোবারকে দূর্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হল। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শাহজাদীকে নিজের নিকটে রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! ফাতেমা তোমার বান্দিনী তুমি তাঁর প্রতি রাজি থাক।[১]

মাসয়ালাঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ হতে শিক্ষা নেয়া যায় যে, ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। যেহেতু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী সুলাইমানের সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে তার হৃদয় জয় করেন। ফলে তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান। উপরন্তু হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তিন দিনের উপবাস থেকেও তৈরীকৃত যবের রুটি থেকে একটিও গ্রহণ না করে ত্যাগের যে মহিমা দুনিয়ার বুকে রেখে যান তা নজীর বিহীন ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে বুঝা যায় যে, ত্যাগের মধ্যেই সুখ, ভোগের মধ্যে কোন সুখ নেই। যে যত বেশি ত্যাগী মনোভাব নিয়ে দ্বীন ইসলাম ও গরীব দুঃখীর সেবা করবে এবং এবাদত-বন্দেগী রেযাজত-সাধনায় নিমগ্ন হবে মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও সম্মান তত বেশি উন্নীত হবে। এবং বেহেস্তের সর্বোচ্চ মকাম তার জন্য অপেক্ষমান থাকবে। আর যারা গরীব, দুঃস্থ, অসহায় লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করবে মহান আল্লাহ তাঁদের জিম্মাদার হয়ে যাবেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যাবে। যা দেখে অন্যান্যরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে যাবে।

টীকাঃ-১ সিরাতে ফাতেমা সূত্র-সফিনায়ে নূহ ১৬৯,১৭০ পৃষ্ঠা

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর পরিবারের ইফতার অভাবীদেরকে প্রদান ঃ

একদা হযরত হাসনাইনে করিমাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) রোগাক্রান্ত হলে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হযরত আলী মরতুজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁদের বাঁদী হযরত ফিদ্দা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মান্নত করলেন যে, আল্লাহ যদি এই দুই শাহজাদাকে আরোগ্যদান করেন, তাহলে তাঁরা তিন দিন রোযা রাখবেন। এতে হযরাত হাসনাইনে করিমাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরোগ্য লাভ করলেন। এখন তারা মান্নত পুরনের জন্য রোযা রাখলেন। ইফতারের জন্য ঘরে কিছুই ছিল না। তখন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক দিলেন। বন্ধক দিয়ে কিছু যব নিয়ে আসলেন। ঐ যব পিষিয়ে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ৫টি রুটি তৈরী করলেন। ঠিক ইফতারের সময় এক মিসকিন আসে। তখন ঐ মিসকিনকে রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিনেও আর কিছু যব পিষিয়ে রুটি তৈরী করলেন। এমতাবস্থায় ইফতারের সময় একজন এতিম আসলেন এবং কিছু খাবার চাইলেন। তাঁকেও সেই রুটিগুলো দিয়ে দিলেন।

তৃতীয় দিনেও আর কিছু যব পিষিয়ে রুটি তৈরী করলে ইফতারের সময় একজন বন্ধী এসে কিছু খাবার চাইলে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সেই রুটিগুলো দিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সবাই পানি দিয়ে ইফতার করলেন।

চতুর্থ দিন সকালে যখন উঠলেন, তখন ক্ষুধার কারণে সকলে চলাফেরা করার সক্ষম হল না। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুই নয়ন মনি হযরত হাসনাইন করীমাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে দেখার জন্য ঘরে তশরীফ নিয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে নামাযরত অবস্থায় দেখেন। আর সকলের কাছে এমন দুর্বলতা ভাব দেখে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অস্বস্থিভাব এসে গেল। তখন জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে এসে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সহ আহলে বাইতের শানে এ আয়াতে করীমা নাযিল করেন-

وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

অর্থাৎ তারা তাদের মান্নত পুরণ করতেছে এবং ঐদিনকে ভয় করতেছে, যে দিনের ভয়াবহতা খারাবী বিস্তৃত হবে এবং তারা আহার দান করে খাবারের উপর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এখাবার খাওয়ায় এতিম, মিসকিন ও বন্ধিকে এবং একথা বলে যে, আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে খাবার দিচ্ছি। ইহার বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন বদলা, বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা চাচ্ছি না।[১]

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বরকত ও গায়েবী রিযিকের দোয়া শিক্ষা দানঃ

রওজুল আরুকার কিতাবের সূত্রে আব্দুর রহমান সুফূবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নাজাহাতুল মাজালিসে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে গিয়ে কিছু চাইলেন, হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আজ ৩০দিন পর্যন্ত নবী পরিবার আগুন স্পর্শ করেনি, অর্থাৎ, কিছু রান্না করেনি। অতঃপর আমি কি তোমাকে এমন পাঁচটি তাসবীহ শিখিয়ে দেব না (?) যা হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। উত্তরে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হ্যাঁ। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি সর্বদা এই ৫টি দোয়া পড়বে-

يَااَوَّلَ الاَوَّلِيْنَ وَيَا اٰخِرَ الأٰخِرِيْنَ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ وَيَارَاحِمَ الْمَسَاكِيْنَ وَيَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অথাৎ- হে প্রথমের প্রথম এবং শেষের শেষ, হে মহান শক্তিওয়ালা, হে মিসকিনদের দয়াকারী এবং হে উত্তম রহমকারী।

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তা বাকী জিন্দেগীতে পড়তেন, ফলে তাঁরা কোন সময় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে তা তাঁদের অনুভব হত না এবং তা গায়েবীভাবে সমাধান হয়ে যেত। আর এটার দ্বারা গায়েবী রিযিকও তাঁদের মাঝে আসতো, উপরন্ত আল্লাহর গায়েবী খাস রহমতও তাঁদের উপর বর্ষিত হত।[২]

টীকা- ১ ঃ তাফসীরে কবীর ২য় খন্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা, তাফসীরে হোসাইনী ২য় খন্ড ৪৫৯ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কাশশাফ ৪র্থ খন্ড ১৯৬,১৯৭ পৃষ্ঠা, খযায়েনুল ইরফান ৮৪৩ পৃষ্ঠা, আর রেয়াজুল নজরা ২য় খন্ড ৩০২ পৃঃ তাফসীরে খাযেন ও মুদারেক ৩৪০ পৃষ্ঠা, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৬ষ্ঠ খন্ড ৫৬৬ পৃঃ

টীকা - ২ঃ নাজাহাতুল মাজালেস ২২৮ পৃষ্ঠা।

এতে তাঁরা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতেন। পারিবারিক জীবনে তাঁদেরকে কোন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি, এটা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিশেষ করম নাওয়াজী। যা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সমস্ত নর-নারীকে আদর্শ হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। এটা সর্বাবস্থায় গ্রহনীয় ও বরনীয়। যা আমাদের উন্নতির সোপান। এ পদ্ধতি যারা গ্রহন করবে তারা দ্বীন-দুনিয়া দু'জাহানে কামিয়াবী হাসিল করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আদর্শে আদর্শিত হবার তাওফীক দান করুন। আমিন।

হযরত সুলাইমান (আলাহিস সালাম) এর নন্দিনী খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খাদেমা ঃ

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বিলম্ব করে গভীর রাত্রিতে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বাসভবনে আগমন করলেন। তখন হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আরজ করলেন, ঘরে আপনার এত বিলম্বে আসার কারন কি (?), উত্তরে হযরত শেরে খোদা আলী মুরতুজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনার পিতা হুজুর রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে বসে নূরানী বানী শুনতেছি। হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার সম্মানিত পিতা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজকে কি বানী শুনিয়েছেন, প্রতিউত্তরে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আজকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহেবজাদীর বিবাহের উপঢৌকন হিসেবে এক জোড়া পাদুকা দিলেন, যাতে অনেক দামী পাথর, মনি মুক্তা, জওহার খচিত ছিল এবং জামাতাকে হীরা এবং মুক্তা খচিত একটি তাজ দিলেন। একথা শুনে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মনে এই খেয়াল আসল যে, হয়তঃ আমার স্বামী হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মনে এই ধারনা আসতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) আপন সাহেবজাদীকে মূল্যবান উপঢৌকন দান করলেন এবং জামাতাকে হীরা ও মুক্তার তাজ দিলেন। আর আমার পিতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয়ে আপন সাহেবজাদীর বিবাহে কি উপহার দিলেন (?) দিলেন তো দিলেন, ২টি মাটির পেয়ালা, ১টি চামড়ার মশক, ২টি খেজুরের জালের তৈরী

চাটাই আর ১টি চাক্কি, ২টি জায়নামায আর জামাতার জন্য কোন কাপড়ও দিলেন না। আর কোন ঘোড়াও দেন নি। এ ধারণা নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কয়েকরাত অতিবাহিত হয়ে গেল। এক রাত্রিতে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে দেখলেন যে, বেহেস্তের এক উঁচু স্থানে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হীরা, মুক্তা, জওহারাত খচিত পোশাক পরিহিতাবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। যাঁর মস্তক মোবারকে রয়েছে সোনালি তাজ, হাজার হাজার বেহেস্তের হুরেরা তাঁরা খেদমতে নিয়োজিত। এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, হে আমার বিবি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! আমার পিপাসা লেগেছে। আমাকে একটু পানি পান করাও। তখন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এক সুন্দর পোশাক পরিহিতা দামী জেওয়ারাত সজ্জিতা রমনীকে নির্দেশ দিলেন, যাও হাউজে কাউসার থেকে শেরে খোদা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আস। তখন হযরত শেরে খোদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করেন যে, হে ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! ঐ সুন্দরী রমনী কে? যে আপনার খেদমতে নিয়োজিত। উত্তরে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ইনি হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর ঐ সাহেবজাদী যার আলোচনা আমার আব্বাজান রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে আপনি শুনেছেন (সুবহানাল্লাহ্)। [১]

মাসয়ালাঃ এতে বুঝা যায় যে, হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মকাম কতইনা উচ্চ মর্যাদাশীল, যা কল্পনাতীত। এটাকে তাঁর একমাত্র এবাদত-বন্দেগী ও শোকর-নেওয়াজীর উপঢৌকন বলা যেতে পারে। কেননা তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌র শোকরগুজারী, রেয়াজত ও এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন সেটার উপহার একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত ছাড়া আর কিছুই নয়। যেই নেয়ামত আল্লাহ্ স্বয়ং বেহেস্তে দেবেন সেই নেয়ামত হতে আর কি মহামর্যাদা হতে পারে! দুনিয়াবী সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস ক্ষণিকের সামগ্রী। কিন্তু আখেরাতের নাজাতই মুসলমান নর-নারীর জন্য আসল পাথেয়। তাই আমাদের বর্তমান সমাজের নর-নারীর প্রতি বিশেষ আরজ থাকবে যে, আমরা যেন দুনিয়াদারিতে বেশি মশগুল হয়ে রাব্বুল আলামীনের নেযামতরাজির শোকর আদায় থেকে বঞ্চিত না হই।

(টীকাঃ১ মাদারে জুন নবুয়ত, সূত্র- থাকে কারবালা-৩৪ পৃষ্ঠা

আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে যাকে যেই নেয়ামত দান করেছেন তথা যাকে যেই অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় যদি আমরা আল্লাহ্‌র গুণগান ও মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করে সৎ পথে জীবন-যাপন করি তাহলে আল্লাহ আমাদের ইহ ও পরকালীন মুক্তির পথ সহজ করে দেবেন। উপরন্তু দুনিয়াতে সৎ কর্মশীলদের পরীক্ষা প্রতিনিয়ত চলতেছে, চলতে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত মুমেন কোন দিন সেই পরীক্ষায় ধৈর্য্যশীলতা ব্যতীরেকে সফল হয়নি। তাই ধৈর্য্যই হচ্ছে মুক্তির সোপান। আল্লাহ্ আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারন করার তাওফীক দান করুন। বর্তমানে নারী সমাজ স্বীয় স্বামী, পিতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কথায় কথায় নাশোকরীর ভাব তুলে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে যা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য হচ্ছে নাজাতের উসিলা ও উচ্চ মর্যাদা পাবার সোপান । যা হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। আর তাঁর জীবন থেকে যদি আমরা শিক্ষাগ্রহন করি তাহলে দেখা যাবে যে, অল্প তুষ্টি থাকার মাধ্যমেই পরকালের অফুরন্ত নেয়ামতরাজি পাবার মহা উসিলা। তাই নাশুকরী করা ইসলামে জায়েজ নেই। আল্লাহ বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

অর্থাৎ যুদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি আমার নেয়ামতরাজি আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃজ্ঞত হও তাহলে পরকালে তোমাদের জন্য কঠিনতম শাস্তি অবধারিত। হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্য অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমিন

এখান থেকে আরো বুঝা যায় যে, স্ত্রী-স্বামীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে। এ আদর্শ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনাদর্শের মধ্যে রয়েছে। আর স্বামী ও স্ত্রীর সাথে কিরূপ ব্যবহার কবরে তার সুন্দর বিবরণও রয়েছে। বর্তমান যুগে স্বামীর কাছে নেই স্ত্রীর মর্যাদা আর স্ত্রীর কাছে নেই স্বামীর সম্মান। একে অপরকে অশোভনীয় ব্যবহার করে। ফলে সংসারের মধ্যে কল-বিবাদ সৃষ্টি হয়, পরে সংসারে ভাঙ্গন ধরে। বর্তমানে নর-নারীরা যদি খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এই আদর্শকে সামনে রাখে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর দাম্পত্যজীবন যাপন গড়ে উঠবে।

নবম অধ্যায়

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দা

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্দা ও বর্তমান নারী সমাজ ঃ বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইমরান মস্তফীকে বললেন, ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রোগাক্রান্ত হয়েছে; তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাবে? হযরত ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার কদমে আমার আব্বা-আম্মা কোরবান হোক! এটা থেকে মর্যাদাবান আর কি হতে পারে? অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওয়ানা হলেন, সাথে হযরত ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)ও ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের দরজায় যখন গেলেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম দিলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ! সালাম দিয়ে বললেন, আমি কি প্রবেশ করব? ঘর থেকে উত্তর আসলো ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ, আপনি প্রবেশ করুন। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার সাথে অন্য এক ব্যক্তি আছে; সেও কি প্রবেশ করবে? তখন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন,ঐ খোদার শপথ! যিনি আপনাকে বরহক নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার উপরতো পর্দা ওয়াজিব। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মাথার চুল বাঁধানোর একটি খোপা ছিলো সেটা পর্দার মধ্যে থেকে নিক্ষেপ করব বললেন, এটা দিয়ে তোমার মাথা বন্ধন কর। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তা করেছেন । তখন ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আপনি ভিতরে তাশরীফ নিয়ে আসুন। বর্ণনাকারী হযরত ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমিও প্রবেশ করলাম, আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাতুনে জান্নাতের শীর মোবারকের পাশে বসলেন, আমিও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামান্য নিকটে বসলাম। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেন, ওগো আমার আদরের কন্যা ফাতেমা ! এখন তোমার কি অবস্থা? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) খোদার শপথ! আমার শরীরে অনেক ব্যাথা, এরপরেও ঘরের মধ্যে খাওয়ার কিছু নেই, এতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব কান্না করলেন। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)ও কান্না করছেন, আর বর্ণনাকারী হযরত ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এতে আমারও কান্না আসল। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ওগো আমার আদরের কন্যা! তুমি ধৈর্য্য ধারন কর! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর! এ কথা দুইবার কিংবা তিনবার বললেন। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুসংবাদ দিলেন, ওগো আমার সাহেবজাদী! তুমি কি রাজি হবে না যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু তোমাকে সমগ্র মহিলা জগতের সর্দার বানিয়েছেন! উত্তরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁয়! আমি কি করে জগতের মহিলাদের সরদার হতে পারি(?) যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) এর মা মরিয়ম বিনতে ইমরান রয়েছে। তখন হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, ওগো আমার আদরের কন্যা! হযরত মরিয়ম (আঃ) তো তাঁর সময়ের মহিলাদের সরদার আর তুমি তোমার যুগের মহিলাদের সরদার হবে। আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আমাকে বরহক নবী হিসেবে এ ধরাতে প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয় আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে শাদী দিয়েছি, যিনি দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের মধ্যে সরদার। তাঁর সাথে মুনাফেক ব্যতীত আর কেউ বিদ্বেষভাব রাখবে না।[১]

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মহিলাদের কি ধরণের পর্দা করতে হয়। আর পর্দার মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। আরো বুঝা যায় যে, অভাব অনটন ও কষ্টের মধ্যে ধৈর্য্যশীলতা বজায় রাখার মধ্যে যে আল্লাহ্‌র রহমত ও নেয়ামত রয়েছে তার উপমা হিসেবে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর এই সাংসারিক জীবন-যাপনই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কোরআনে পাকে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহার্য্য প্রার্থনা কর।

ধৈর্য্যের মধ্যে আল্লাহ্‌র রহমত নিহিত রয়েছে, আর ধৈর্য্য হবে কষ্টের মাধ্যমে আর কষ্ট হচ্ছে বান্দাদের পরীক্ষা স্বরূপ।

টীকাঃ১ যখায়েরুল উক্‌বা-কৃত আল্লামা তবরী-৪৩,৪৪পৃষ্ঠা

লজ্জা ও পর্দা করণের মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর অবদান ঃ

পর্দা করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধানঃ

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুন্দর ও সুন্দর বস্তুর প্রতি আত্মা এবং হৃদয় স্বভাবগত কারণে আকৃষ্ট হয়। মানবের স্বভাবের মধ্যে এটাও আছে যে, কোন বস্তুকে যদি সে পছন্দ করে তাহলে যে কোন উপায়ে তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হয়। দোকানদার তার দোকানের সামনে সৌন্দর্য্য জিনিস সাজিয়ে রাখে, যাতে মানুষ সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রভাবিত হয়ে ক্রয় করতে আগ্রহী হয়। আর যদি সেই জিনিসকে সাজিয়ে না রাখে তার সৌন্দর্য্যকে জনসম্মুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করা না যায় তাহলে সেই জিনিস নেয়ার জন্য মানুষের আগ্রহ থাকে না। ফলে দেখানোর মাধ্যমেই সেই জিনিস নেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। আর একজন সুন্দর নারী যদি বেপর্দায় মানুষের সামনে আসে, তাহলে যে সব ব্যক্তি আসক্তির প্রতি আকৃষ্ট তারা তাদের সেই আসক্তি পূর্ণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর সেটাও যদি করতে না পারে তাহলে দেখার মাধ্যমে তার মনের কুপ্রবৃত্তি পুরণে চেষ্টা করবে। আর সেটা সমাজে ফিত্‌না ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। তাই পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

অর্থাৎ ওহে আমার হাবীব! আপনি মুসলমান ঈমানদার পুরুষদেরকে নির্দেশ প্রদান করুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য পুতঃপবিত্রতার পন্থা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাদের সকল কর্মকান্ডের খবর রয়েছে। আর মুসলমান নারীদেরকে অবহিত করুন! তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করে এবং তারা তাদের চরিত্রও যেন হেফাযত করে। আর তারা তাদের সৌন্দর্য্যও বাহিরে প্রকাশ না করে। অবশ্যই যা প্রকাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন তা প্রকাশ করবে এবং তারা তাদের জামার (কাপড়) উপর উড়না পরিধান করবে।[১]

টীকাঃ ১ সূরা নূর

মাসয়ালাঃ উল্লেখ্য পর্দার ব্যাপারে শরীয়তের কিছু মাসয়ালাও রয়েছে। মহিলাদের যে সতর আছে তা ঘরে-বাইরে আবৃত করতে হবে। অবশ্যই চেহারা মুখমণ্ডল, হাত পা ইত্যাদি অপরিচিত পুরুষ থেকেও পর্দার আড়ালে রাখবে। এটাই শরীয়তের বিধান।

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা) এর পর্দা ঃ

পর্দার ব্যাপারে খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর অতুলনীয় তথা শিক্ষনীয় পালনীয় প্রণিধানযোগ্য অভিমত রয়েছে।

প্রথমতঃ পুরুষ মহিলা একে অপরকে না দেখার পর্দাঃ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হুজুর (দঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটি সর্বোত্তম? সমবেত সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিরবতা পালন করলেন। কেউ কোন উত্তর দিলেন না। হযরত আলী বলেন, আমি এ কথার উত্তর অবগত হবার জন্য মজলিস থেকে উঠে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

اَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِّلنِّسَاءِ قَالَتْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي (بزار دار قطنى)

অর্থাৎ মহিলাদের জন্য কোন বস্তুটি সর্বোত্তম? হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাঃ) বললেন, মহিলারা পুরুষদের দেখবে না আর পুরুষরাও মহিলাদের দেখবে না। হযরত আলী(রাঃ) বলেন, আমি হুজুর (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই উত্তরটি অবহিত করলাম। তখন হুজুর (দঃ) অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় বললেন, ফাতেমা আমারই অংশ, আমার কলিজার টুকরা।[১]

দ্বিতীয়তঃ মুহরিম (খাস আপনজন) নয় এমন ব্যক্তিদের সাথে পর্দাঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর নিকট তাঁর কোন এক আদরের দুলাল শিশুকে চাইলাম তখন তিনি পর্দার মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁর সন্তানকে দিলেন।[২]

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর খাস খাদেম ছিলেন এবং হুজুর (দঃ) এর পরিবারের মধ্যে তাঁদের প্রিয় বৎস হিসেবে থাকতেন। এরপরেও মুহরিম নয় বিধায় হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) তাঁর থেকে পর্দা করেন,

টীকাঃ ১ দারে কুতনী, বয্যার, সূত্র: সফিনায়ে নূহ ১৭৭ পৃষ্ঠা।
টীকাঃ ২ ফতহুল কাদীর, সূত্র: সফিনায়ে নূহ ১৭৭ পৃষ্ঠা।

কেননা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে-

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ .

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা যখন অপরিচিত মহিলাদের থেকে কোন কিছু চাও, তাহলে পর্দার বাইরে থেকে তাদের নিকট চাও। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পুতঃপবিত্র আমল।[১]

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এ আয়াতে করীমার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে স্বীয় পবিত্র আমল পর্দা করণের মধ্য দিয়ে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটা নারীজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক হিসেবে চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

কিয়ামত দিবসে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর পর্দা ঃ

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর পর্দা ও লজ্জার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ জাল্লাশানুহু নিজেই করবেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ حَتّٰى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمُرَّ وَمَعَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ جَارِيَةٍ مِنْ حُوْرِ الْعِيْنِ كَالْبَرْقِ اَلَا مَعِ

(مستدرك حاكم ونزهة المجالس)

অর্থাৎ যখন কিয়ামত দিবস হবে তখন পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া হবে, হে হাশরবাসীরা! তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর, যাতে ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদ (দঃ) পুলসিরাত অতিক্রম করেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

فَتَمُرُّ عَلٰى سَبْعِيْنَ اَلْفِ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ.

অর্থাৎ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) সত্তর হাজার বেহেশ্তী হুরের মাধ্যমে পুলসিরাত বিজলীর ন্যায় অতিক্রম করবেন।[২]

টীকাঃ ১ সূরা আহযাব।
টীকাঃ ২ নাজাহাতুল মাজালেস-২য় খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠা।

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্দার আয়োজন করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসেও হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর আকৃতি মোবারককে অবলোকন করা কারো জন্য এজাযত বা অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়তঃ কারো মতে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পক্ষ থেকে হাশরবাসীদের দৃষ্টি অবনত করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের কেহ খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে অবলোকন করতে না পারে। আর তারা যদি অবলোকন করতে পারে তাহলে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাবে; তা যেন না হয়। কেননা সেই জালিমদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারন করে রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ এছাড়াও হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মধ্যে পর্দা করণের ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক ব্যবস্থাপনার কারণ এই যে, হুজুর (দঃ) স্বয়ং ফাতেমা (রাঃ) কে আমারই অংশ তথা নিজেরই অংশ বলেছেন। অন্য কোন শাহজাদা কিংবা শাহজাদীর ব্যাপারে এরকম বলেননি। যদিও অন্যান্য সাহেবজাদী ও সাহেবজাদাগণ হুজুর (দঃ) এর নূরেরই অংশ। কিন্তু খাতুনে জান্নাতের (রাঃ) নিকট সেই নূরের জ্যোতি বা প্রখরতা আনুপাতিকহারে অধিকতর হবার কারণে নূরের আলোক রশ্মির তাপ মানুষ সহ্য করতে পারবে না। সেই জন্য তাঁর ব্যাপারে আলাদা পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ হুজুর (দঃ) খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেন,

حَوْرَاءُ اٰدَمِيَّةٌ.

তথা ইনসানী হুর বলেছেন, যার মধ্যে নূরের ঝলক তথা প্রখরতা এমনই বিদ্যমান ছিল, যা কোন সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারবে না বিধায় খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর জন্য পর্দা করার ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমতঃ যেমনিভাবে হুজুর (দঃ) এর নূরে মুহাম্মদীর উপর সত্তর হাজার পর্দার আবরনী ছিল, যেমন- বশারীয়ত, মালাকিয়ত, হক্কীয়ত প্রভৃতি ঐ নূরে মুহাম্মদী (দঃ) এর এক একটি ঝলক বা আবরণ। আর হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ছিলেন হুজুর (দঃ) এর একটি ঝলক। এজন্য খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর কাছে অধিক পর্দা ছিল। অনুরূপভাবে হযরত সৈয়াদেনা হযরত ইউসুফ (আঃ) হুজুর (দঃ) এর সৌন্দর্য্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পাওয়ার কারণে তিনিও পর্দার মধ্যে থাকতেন; এজন্য যে, সাধারন মানুষ তাঁর সেই সৌন্দর্য্যের ঝলক তথা নূরের প্রখরতা সহ্য করতে পারত না।

কেননা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে-

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ .

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা যখন অপরিচিত মহিলাদের থেকে কোন কিছু চাও, তাহলে পর্দার বাইরে থেকে তাদের নিকট চাও। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পুতঃপবিত্র আমল।[১]

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এ আয়াতে করীমার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে স্বীয় পবিত্র আমল পর্দা করণের মধ্য দিয়ে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটা নারীজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক হিসেবে চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

কিয়ামত দিবসে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর পর্দা ঃ

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর পর্দা ও লজ্জার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ জাল্লাশানুহু নিজেই করবেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ حَتّٰى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمُرَّ وَمَعَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ جَارِيَةٍ مِنْ حُوْرِ الْعِيْنِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ

(مستدرك حاكم ونزهة المجالس)

অর্থাৎ যখন কিয়ামত দিবস হবে তখন পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া হবে, হে হাশরবাসীরা! তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর, যাতে ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদ (দঃ) পুলসিরাত অতিক্রম করেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

فَتَمُرُّ عَلٰى سَبْعِيْنَ اَلْفِ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ.

অর্থাৎ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) সত্তর হাজার বেহেশ্তী হুরের মাধ্যমে পুলসিরাত বিজলীর ন্যায় অতিক্রম করবেন।[২]

টীকাঃ ১ সূরা আহযাব।
টীকাঃ ২ নাজাহাতুল মাজালেস-২য় খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠা।

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্দার আয়োজন করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসেও হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর আকৃতি মোবারককে অবলোকন করা কারো জন্য এজাযত বা অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়তঃ কারো মতে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পক্ষ থেকে হাশরবাসীদের দৃষ্টি অবনত করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের কেহ খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে অবলোকন কবতে না পারে। আর তারা যদি অবলোকন করতে পারে তাহলে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাবে; তা যেন না হয়। কেননা সেই জালিমদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারন করে রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ এছাড়াও হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মধ্যে পর্দা করণের ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক ব্যবস্থাপনার কারণ এই যে, হুজুর (দঃ) স্বয়ং ফাতেমা (রাঃ) কে আমারই অংশ তথা নিজেরই অংশ বলেছেন। অন্য কোন শাহজাদা কিংবা শাহজাদীর ব্যাপারে এরকম বলেননি। যদিও অন্যান্য সাহেবজাদী ও সাহেবজাদাগণ হুজুর (দঃ) এর নূরেরই অংশ। কিন্তু খাতুনে জান্নাতের (রাঃ) নিকট সেই নূরের জ্যোতি বা প্রখরতা আনুপাতিকহারে অধিকতর হবার কারণে নূরের আলোক রশ্মির তাপ মানুষ সহ্য করতে পারবে না। সেই জন্য তাঁর ব্যাপারে আলাদা পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ হুজুর (দঃ) খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেন,

حَوْرَاءُ اٰدَمِيَّةٌ.

তথা ইনসানী হুর বলেছেন, যার মধ্যে নূরের ঝলক তথা প্রখরতা এমনই বিদ্যমান ছিল, যা কোন সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারবে না বিধায় খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর জন্য পর্দা করার ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমতঃ যেমনিভাবে হুজুর (দঃ) এর নূরে মুহাম্মদীর উপর সত্তর হাজার পর্দার আবরনী ছিল, যেমন- বশারীয়ত, মালাকিয়ত, হক্কীয়ত প্রভৃতি ঐ নূরে মুহাম্মদী (দঃ) এর এক একটি ঝলক বা আবরণ। আর হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ছিলেন হুজুর (দঃ) এর একটি ঝলক। এজন্য খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর কাছে অধিক পর্দা ছিল। অনুরূপভাবে হযরত সৈয়্যদেনা হযরত ইউসুফ (আঃ) হুজুর (দঃ) এর সৌন্দর্য্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পাওয়ার কারণে তিনিও পর্দার মধ্যে থাকতেন; এজন্য যে, সাধারন মানুষ তাঁর সেই সৌন্দর্য্যের ঝলক তথা নূরেব প্রখরতা সহ্য করতে পারত না।

দশম অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের আয়াতের আলোকে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর ফযায়েল

প্রথম আয়াতে তাতহীরঃ ১ সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩, পারা-১১

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পূতঃ পবিত্র ঃ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

অর্থাৎ ওগো নবীর বংশধর! আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হল যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে সর্বদিক দিয়ে পুতঃপবিত্র রাখবেন।

প্রথমতঃ অত্র আয়াতের মধ্যে আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) কে তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উপরন্তু অপবিত্রতা এবং পাপের উপরও তাদেরকে ঘৃণা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটা প্রথমত আয়াত যাতে সরাসরি 'আহলে বাইত' বলে আল্লাহ তায়ালা সম্বোধন করেছেন।

আর প্রত্যেক প্রকারের অপছন্দনীয় বস্তুকে الرجس বলা হয়। হয়তঃ সেটা আমল হোক বা অন্য কিছু হোক। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম الرجس বলতে পাপকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারো মতে, নৈতিক চরিত্র অথবা ধর্মীয় অপরাধ উদ্দেশ্য, কারো মতে- পাপ, কারো মতে শয়তান, কারো মতে সন্দেহ, কৃপণতা, লালসা, বিদয়াত, অক্ষমতা, ত্রুটি উদ্দেশ্য, মাহমুদ আলুসীর মতে উপরের সবগুলোই উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর প্রত্যেক প্রকারের পাপ-ত্রুটি, অশোভণীয় কার্যক্রম থেকে মাহফুজ রাখেন। হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

اَنَا وَاَهْلُ بَيْتِىْ مُطَهَّرُوْنَ مِنَ الذُّنُوْبِ.

অর্থাৎ আমি এবং আমার আহলে বাইত পাপ থেকে মুক্ত। এ আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) একটা কালো নক্সা বিশিষ্ট চাদর পরিধান করে হুজরা শরীফে বসে রইলেন। এমতাবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাশরীফ নিয়ে আসলেন। তখন চাদরের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করে নিলেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) আগমন করলে তাঁকেও চাদরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এরপর ইমাম হাসান (রাঃ) আসলে তাঁকেও প্রবেশ করালেন। এরপর ইমাম হোসাইন (রাঃ) আসলে তাঁকেও প্রবেশ করালেন। অতঃপর হুজুর (দঃ) উপরোক্ত আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করলেন।[১]

চতুর্থতঃ উপরোক্ত আয়াত উম্মে সালমা (রাঃ) এর হুজরা শরীফে নাযিল হলো। তিনি বলেন, আমি নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমিও কি আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত হই? প্রদুত্তরে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, তুমি মঙ্গলের উপরই আছ এবং নবীর বিবি হিসেবে আছ। এরপর হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَخَاصَّتِىْ فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই চাদরের মধ্যে যারা আছেন, এরাই আমার আহলে বাইত এবং আমার বিশেষ পরিজন। তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত কর এবং তাদেরকে পুতঃপবিত্র রাখ।[২]

পঞ্চমতঃ এছাড়া হুজুর (দঃ) ফযরের নামাযের প্রাক্কালে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘর মোবারকের পাশ দিয়ে যাবার সময় উচ্চ আওয়াজে এরশাদ করতেন-

اَلصَّلٰوةَ يَااَهْلَ الْبَيْتِ الصَّلٰوةَ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

অর্থাৎ হে আহলে বাইত! উঠ, নামাযের সময় হয়েছে, নামায পড়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা তোমাদের থেকে প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা দূর করা এবং তোমাদেরকে সব দিক দিয়ে পুতঃপবিত্র রাখা।[৩]

টীকাঃ১ রুহুল মা'নী, ২য় খন্ড ১২ পৃঃ সূত্রঃ আলে রসূল-কৃত পীর হোসাইন চিশতী, ৫২ পৃঃ
টীকাঃ ২ তাফসীরে খাযেন, ৩য় খন্ড ৪৪৯ পৃঃ, তাফসীরে দুররে মনসুর ৫ম খন্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা, সূত্র আলে রসুল (দঃ) ৫৪ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম, জামে তিরমিজী, মসনদে আহমদ, মুস্তদারেক হাকেম, মুসান্নেফে আবি শাইবা প্রমুখ।
টীকাঃ ৩ তাফসীরে দুররে মনসুর, ৫ম খন্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা

হুজুর (দঃ) এর এ আমল ছয় মাস, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে ৭ মাস জারি থাকল।

ষষ্ঠতঃ হযরত আবু সায়িদ খুদরী (রাঃ) এর মতে, হুজুর (দঃ) চল্লিশ দিন ফযরের সময় খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর দরজায় গিয়ে বলতেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلصَّلٰوةَ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ হে আহলে বাইত! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। নামাযের সময় হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন।

দ্বিতীয় আয়াতে মুবাহেলা ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ২১, পারা ৩

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহ্‌লে বাইতের কথা সত্য এবং তাঁদের দোয়া মক্ববুল

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব (দঃ)! যারা আপনার সাথে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্ক ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, আপনার কাছে এ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট থেকে পূর্ণ সংবাদ আসার পর আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বলে দিন, আসুন! আমরা ও আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে আহবান কর আর তোমরা ও তোমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে আহবান কর এবং একে অপরের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি যে, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক।

প্রথমতঃ আরবের নাজরানের এক খ্রীষ্টান দল হুজর (দঃ) এর দরবারে এসে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করে দিল। হুজুর (দঃ) হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল, আর আল্লাহর একটি বাণী হযরত মরিয়ম বতুল (আঃ) এর প্রতি আসল। ফলে আল্লাহর হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ) পয়দা হলেন। এতে খ্রীষ্টানরা রাগান্বিত স্বরে বলল, পিতা ছাড়া কি কোন মানব হতে পারে? অর্থাৎ তিনিই আল্লাহর সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। তখন উক্ত আয়াতে মুবাহেলা অবতীর্ণ হল। অতঃপর খ্রীষ্টানরা তিন দিনের সময় চেয়ে নিল। তিন দিন পর তারা উত্তম পোশাক

পরিধান করে তাদের বড় বড় পাদ্রীদের নিয়ে আসল। এদিকে হুজুর (দঃ) হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কোলে তুলে নিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) কে হাতে ধরলেন। পিছনে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ), এর পিছনে হযরত আলী হায়দার কাররার (রাঃ)। এ অবস্থায় হুজুর (দঃ) বের হয়ে আসলেন। এরপর বললেন, আমি যদি দোয়া করি, তোমরা আমিন বলবে। অতঃপর আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন,

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত।

দ্বিতীয়তঃ এদিকে আব্দুল মছিহ নামে খ্রীষ্টানদের বড় পাদ্রী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি এমন কতেক নূরানী চেহারা দেখতেছি, তাঁরা যদি আল্লাহর দরবারে কোন পাহাড়কে কোন স্থান থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য দোয়া করেন তাহলে তা সাথে সাথে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পরে পরামর্শ করে সময় নিয়ে নিল এবং মুবাহেলা থেকে বিরত রইল। আর 'কর' দানের উপর সন্ধি করল।

তৃতীয়তঃ হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জান, নজরানবাসীর মাথার উপর আল্লাহর আযাব এসে পৌঁছেছে। তারা যদি মুবাহেলা করতঃ তাহলে তারা বানর ও শুকুরের আকৃতিতে পরিণত হত এবং তাদের বাসস্থলে আগুন লেগে যেত, সমস্ত নজরানবাসী সমূলে বিনাশ হয়ে যেত। এমনকি তাদের বৃক্ষে যে পাখি আছে তাও জ্বলে পুড়ে তছনছ হয়ে যেত। এক বছর যেতে না যেতে তারা সমূলে বিনাশ হয়ে যেত।[১]

চতুর্থতঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে হুজুর (দঃ) ابناءنا ونساءنا এর মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে শামিল করলেন এবং দোয়ার মধ্যে আমিন বলার নির্দেশ দিলেন। আর উক্ত দোয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টান জাতি সমূলে বিনাশ হয়ে যাবার কথাও বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু ঐ আহলে বাইতের দোয়ায় পাহাড় স্থানচ্যুত হবার কথাও খ্রীষ্টান পাদ্রীরা স্বীকার করল। এতে বুঝা গেল, আহলে বাইত তথা বিশেষ করে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর দোয়ার মধ্যে কতই যে প্রভাব রয়েছে। আর আমরা গুনাহগার উম্মতের জন্য খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর নজরে করম ও দোয়া থাকলে পাহাড় সমতুল্য গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং মসিবত দূরীভূত হবে।

টীকাঃ-১ তাফসীরে মুজহেরী ২য় খন্ড ৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কবীর ২য় খন্ড ৪৮৮ পৃষ্ঠা, খাযেন মুদারেক ১ম খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠা, তাফসীরে খাযাযেনুল এরফান

তৃতীয় আয়াতে মুয়াদ্দাতঃ সূরায়ে শুরা, ২৫ পারা, ৬নং আয়াত

আহ্‌লে বাইত তথা ফাতেমা(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতই ঈমান

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ ওহে আমার হাবীব! আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি (বিশেষতঃ ঈমানদাররা)! আমি তোমাদের থেকে হেদায়ত ও রেসালতের বাণী প্রচারের উপর তোমাদের নিকট আমার অতি নিকটতম আপনজন ও আত্মীয়দের প্রতি ভক্তি ও মুহব্বত ছাড়া আর কিছু তালাশ করছি না।

প্রথমতঃ এ আয়াতে করীমা নাযিল হবার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর দরবারে আরজ করলেন-

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَوَلَدُهُمَا.

অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার এই আত্মীয় কারা? যাদের ভালবাসা আমাদের উপর কোরআন শরীফের আয়াতের দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে? প্রদুত্তরে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, তাঁরা হলেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং তাদের দুই সন্তান হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ)।[১]

মাসায়ালাঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আহলে বাইতকে মুহব্বত করা ওয়াজিব সাব্যস্থ হয়েছে। ঐ আহলে বাইতের মধ্যে সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মুহব্বত অন্তর্ভূক্ত। কোরআনে পাকে সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে মুহব্বত করা, ভক্তি ও মর্যাদার মাধ্যমে ফরযের অন্তর্ভূক্ত।

বিঃদ্রঃ- আহলে বাইতকে মুহব্বত করার মাসায়ালা সম্পর্কে পরে আলাদাভাবে আলোকপাত করা হবে।

টীকাঃ১ তাফসীরে মুযহেরী ৮ম খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা সূত্র-তবরানী ইবনে মুরদবীয়া ইবনে আবু হাতেম, যুরকানী ৭ম খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা, দুররে মনসুর ৭ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা, মাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৬৮ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কবীর ২৭ খন্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরে মুদারেক ৪র্থ খন্ড ১০১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে নসফী, রুহুল মায়ানী ২৫ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান ৮ম খন্ড ৩১১ পৃষ্ঠা, সফিনায়ে নূহ ১৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ আয়াতে দরূদঃ সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬ পারা ২২

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহ্‌লে বাইতের উপর দরূদ সালাম পড়া ওয়াজিব

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ আল্লাহর হাবীবের উপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহর হাবীবের উপর দরূদ এবং সালাম আরজ কর।

প্রথমতঃ হযরত কা'ব বিন আযরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে করীমা নাযিল হবার পর আমরা হুজুর (দঃ) এর দরবারে আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমাদেরকে আপনার উপর কিভাবে সালাম পেশ করব তার শিক্ষা প্রদান করেছেন। কিভাবে আপনার আহলে বাইতের উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করব তার শিক্ষা প্রদানের জন্য আরজ করি। তখন হুজুর (দঃ) ইরশাদ করলেন, তোমরা বল-[১]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ থাকে যে, উক্ত দরূদ শরীফের শিক্ষা নামাযে তাশাহুদের পরে পড়ার জন্য। অবশ্যই এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতও রয়েছে। এই দরূদ শরীফ নামাযের মধ্যেই পড়বে। নামাযের বাইরে সালাম ব্যতীত এই দরূদ শরীফ পাঠ করা ফোকাহায়ে কেরামের মতে মাকরূহ হবে। কেননা এখানে সালাম নেই। আর যেহেতু নামাযের মধ্যে তাশাহুদের সালামের কারণে এই দরূদ শরীফের জন্য সালাম যথেষ্ট বিধায় নামাযের জন্য এটা দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার একটি স্বতন্ত্র ফতোয়াও রয়েছে।[২]

টীকাঃ-১ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ৮৬ পৃষ্ঠা, সওয়ায়েকে মুহরেকা
টীকাঃ-২ গ্রন্থকার আল্লামা কাজী মুফতি আব্দুল ওয়াজেদ, ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া , চট্টগ্রাম।

তৃতীয়তঃ স্মর্তব্য যে, দরূদ শরীফে على محمد আলা মুহাম্মদ (দঃ) থেকে প্রথমঃ আহলে বাইতে রসূল (দঃ),
দ্বিতীয়ঃ উম্মুহাতুল মুমেনীন (রাঃ) এবং হুজুর (দঃ) এর অন্যান্য আপনজনগণ অন্তর্ভূক্ত। আর ال محمد আলে মুহাম্মদ (দঃ) এর মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ই বিশেষ স্থানে রয়েছে বিধায় দরূদ শরীফের আয়াতের মধ্যে তিনি অন্তর্ভূক্ত। ফলে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) তথা আলে মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করলে নামাযও সম্পূর্ণরূপে আদায় হবে না। তাহলে বুঝা গেল, খাতুনে জান্নাত (রাঃ) তথা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর শান আল্লাহর দরবারে কতটুকু(?) যাদের উপর দরূদ পাঠই বান্দার এবাদত পরিপূর্ণ ও কবুল হওয়ার জন্য একমাত্র উসিলা।
চতুর্থতঃ ইমাম শাফী (রাঃ) এরশাদ করেন, হে আহলে বাইত! আপনাদের বুজুর্গী কতই না উর্ধ্বে! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের উপর দরূদ শরীফ পড়বে না ততক্ষণ নামাযও হবে না।[১]

পঞ্চম আয়াতে সালাম ঃ সূরা সফ্ফাত, আয়াত ১৩০, পারা-২৩

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) এর উপর আল্লহর সালাম

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ

অর্থাৎ ইয়াসিনের উপর শতকোটি সালাম বর্ষিত হোক।
প্রথমতঃ অধিকাংশ মুফাস্সেরীনদের মতে উক্ত আয়াতে আলে ইয়াসিন থেকে আলে মুহাম্মদ (দঃ)-ই উদ্দেশ্য, যেহেতু ইয়াসিন হুজুর (দঃ) এর নাম মোবারকের মধ্যে অন্যতম নাম মোবারক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কলবী (রাঃ) প্রমুখ মুফাসসেরীনগণ আলে ইয়াসীন থেকে আলে মুহাম্মদ (দঃ) উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[২]
দ্বিতীয়তঃ এ ছাড়া এ আয়াতের মধ্যে হুজুর (দঃ) এর আউলাদে পাকের উপর আল্লাহ তায়ালার সালামী পেশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং মাখলুকের পক্ষ থেকেও তাদের উপর সর্বদা সালাম পৌছতে থাকবে। এবাদতের মধ্যে হোক কিংবা এবাদতের বাইরে হোক। এই আহলে বাইতের মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ)-ই মূল ব্যক্তিত্ব। এজন্য তাঁর উপরই সদাসর্বদা সালামী পেশ করা হয়েছে। তাই ফাতেমা (রাঃ) মহা মর্যাদার অধিকারী।

টীকাঃ ১ দিওয়ানে শাফী, ছাপা আজহার কায়েরো, সূত্রঃ আলে রসূল ৭৩ পৃঃ, সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৫০ পৃষ্ঠা। টীকাঃ-২ তাফসীরে কবির ২৫ খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা, সওয়ায়েকে মুহরেকা ১৬৮ পৃঃ

ষষ্ঠ আয়াতে সওয়াল ঃ সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ২৪ পারা ২৩

হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মুহব্বতই কিয়ামতে মুক্তির উছিলা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদেরকে গেইটে দাঁড়িয়ে রাখ। তাদের নিকট তাদের আমল আক্বায়েদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লাশানুহু কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিবেন যে, ঈমানদারদেরকে কোন এক স্থানে আটক রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদের থেকে আহলে বাইতের প্রতি কতটুকু ভক্তি, মুহব্বত এবং মর্যাদা প্রদান করেছে তা জিজ্ঞাসা করা হবে।[২]
মাসয়ালাঃ কিয়ামত দিবসে সমস্ত ঈমানদারদের নিকট অন্যান্য আমল ও আক্বায়েদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পাশাপাশি আহলে বাইতে রসূল (দঃ) ও খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মর্তবা কতটুকু। যাদের ব্যাপারে কিয়ামত দিবসে প্রশ্ন করা হবে। যার মধ্যে অন্যসব আমল আছে কিন্তু আহলে বাইতের প্রতি মুহব্বত নেই; তাকে জান্নাত দেয়া হবে না। তিনি সংকটের মধ্যে পড়ে থাকবে।

সপ্তম আয়াতে এতেছামঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩, পারা-৪

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীরা সুন্নি হিসাবে সাব্যস্থ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ তোমরা একত্রিত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে আকড়িয়ে ধর এবং পরস্পর (আক্বীদার ক্ষেত্রে) পৃথক হয়ো না।
হকপন্থীদের পরিচয়ঃ তাফসীরে সালবীর মধ্যে হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, অত্র আয়াতে حبل الله বলতে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) উদ্দেশ্য আর আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) মৌলিকভাবে অন্তর্ভূক্ত বিধায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর পথ ও মত হক পথ। যা পরবর্তীতে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতরূপে সাব্যস্থ।

টীকাঃ-২ বর্ণনাকারী ইবনে মুরদবীয়া, দাইলামী, বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ), সূত্রঃ সাওয়ায়েকে মুহরেকা

অষ্টম আয়াতে ফযলঃ সূরা নিসা, আয়াত ৫৪, ৫ম পারা

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর প্রতি হিংসা বিদ্বেষকারীরা জাহান্নামী

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

أَمْ يَحْسُدُونَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

. অর্থাৎ তারা কি ঐ লোকদের উপর হিংসা করতেছে? যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেছন।

প্রথমতঃ ইমাম আবুল হাসান মাগাজলি ইমাম বাকের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এখানে الناس। থেকে আমরা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) কে অন্তর্ভুক্ত করেছি।[১]

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) তথা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারীদের তিরস্কারে নাযিল করেছেন। যারা আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) তথা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করবে না। বরং মনে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে তাদের পরিনতি ভয়াবহ হবে। যেমন হয়েছে ইয়াজেদীদের উপর। বর্তমানে মুনাফেক খারেজী, ফেরকা ওহাবী, মওদূদী, তাবলিগী, জামাতি, আহলে হাদিস প্রমুখ দলের মধ্যে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর প্রতি চরম বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত - বাতিলদের পরিচয়ঃ

উক্ত বাতিল ফেরকাদের ঐ মনোভাব পোষণই প্রমান করে যে, তারাই বাতিল এবং জাহান্নামী। নবী ওলী ও আহ্‌লে বাইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শান বর্ণনা করলে তাদের শরীরে আগুন লেগে যায়। সাথে সাথে শিরক-বিদয়াতের শ্লোগান তুলে ইসলামের নামে এসব সন্ত্রাসী দলসমূহ মূলতঃ ইহুদী-নাসারার দোসর। তাদের মাধ্যমে ইহুদী-নাসারাগণ আহলে বাইতে রসূল (দঃ), নবী-অলীদের বিরুদ্ধে কটুক্তি উচ্চারণ করাচ্ছে এবং শিরক-বিদয়তের ফতোয়া দেয়া হচ্ছে, তাদের ঐ শিরক-বিদয়াতের ফতোয়া দেয়ার হোতা গভীরভাবে গবেষণা করলে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, ইহুদী-নাসারার ইশারায় তারা একাজ করতেছে।

টীকাঃ-১ সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৫২ পৃষ্ঠা।

চতুর্থত সতর্কবানী ঃ

এসব বাতিল ফেরকাদের ব্যাপারে আমাদের নিকট অনেক তথ্য ও প্রমান রয়েছে। তাদের এসব ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে দ্বীন-ইসলাম কুলষিত। সময় সাপেক্ষে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে।

নবম আয়াতে আমান ঃ সূরা আনফাল, আয়াত-৩৩, পারা-৯

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কান্ডারী

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতির উপর সরাসরি আযাব দিবেন না, যেখানে আপনি রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন হিসেবে অবস্থান করছেন।

প্রথমতঃ দেওবন্দীদের মৌলভী মুফতি শফি তার তাফসীর মাআরেফে কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দঃ) রওজায়ে আকদছের মধ্যে জীবিত অবস্থায় আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন আর কিয়ামত পর্যন্ত তার উম্মতের উপর সামগ্রীকভাবে আযাব আসবে না। যেভাবে এসেছিল কওমে আস, কওমে সামুদ, কওমে লুতের উপর।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু হুজুর (দঃ) এর অস্থিত্ব মোবারক উম্মতের জন্য আযাব থেকে রক্ষা পাবার উসিলা। সেহেতু হুজুর (দঃ) এর উসিলায় আহলে বাইত ও উম্মতের জন্য আযাব থেকে রক্ষা পাবার অনন্য উপায়।

তৃতীয়তঃ ইবনে হাজার মক্কী দৃঢ়তার সাথে একথা দাবী করেছেন যে, হুজুর(দঃ) এরশাদ করেন-

النجم امان لاهل السماء واهل بيتى امان لامتى.

অর্থাৎ আকাশের জন্য রক্ষা কবজ তারকারাজি আর আমার উম্মতের রক্ষা কবজ আমার আহলে বাইত (রাঃ)।[১]

চতুর্থতঃ অপর এক বর্ণনার মধ্যে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমার আহলে বাইত বনী ইসরাইলের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসের বাবে হিত্তার ন্যায়। বাবে হিত্তার মধ্যে যারা প্রবেশ করবে তাদেরকে বনী ইসরাইলের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মুহব্বতের মাধ্যমে যারা পাশ করবে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[২]

টীকাঃ-১ সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৫২ পৃঃ, টীকাঃ-২ সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১২৫ পৃঃ

মাসয়ালাঃ এ আয়াতের মধ্যে যেহেতু আহলে বাইতে রসূল (দঃ) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, সেহেতু আহলে বাইতের মূল ব্যক্তিত্ব হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাঃ)ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন বিধায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও উম্মতের ধ্বংস ও রক্ষাকারী।

দশম আয়াতে হেদায়াতঃ সূরা ত্বহা, আয়াত ৮২, পারা-১৬

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুসারীরা আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى.

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তওবা কারীর জন্য অধিক ক্ষমাশীল যে ঈমান আনয়ন করে সৎ কাজ করবে এবং হেদায়তের উপর থাকবে।

প্রথমতঃ হযরত সাবেতুল বনানী উপরোক্ত আয়াতের اهتدى এর ব্যাখ্যায় বলেন,

اِهْتَدٰى اِلٰى وِلَايَةِ اَهْلِ بَيْتِهٖ

অর্থাৎ হুজুর (দঃ) এর আহলে বাইত ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক দিয়ে যে হেদায়ত পাবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা অধিক ক্ষমা করবে।[১]

দ্বিতীয়তঃ হযরত ইমাম বাকের (রাঃ) থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম দাইলামী বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমার আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে 'ফাতেমা' করে এ জন্য নাম রেখেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর ভক্ত, অনুরক্তদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[২]

তৃতীয়তঃ ইবনে সাদ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) আমাকে এরশাদ করেন, সর্বপ্রথম বেহেস্তে আমি, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন প্রবেশ করব। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের ভক্তরা কবে প্রবেশ করবে? প্রদুত্তরে হুজুর (দঃ) বলেন, তোমাদের পিছনে।[৩]

মাসয়ালাঃ

প্রথমতঃ আলোচ্য বর্ণনাদি একথাই প্রমাণ করে যে, আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর কর্তৃত্বের উপর যারা ঈমান আনবে এবং আহলে বাইতকে মুহব্বত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের রক্ষা করবে এবং ক্ষমা করবে।

টীকাঃ-১, ২, ৩ ঃ সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৫৩ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃত আয়াতে করীমার মধ্যে হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের ক্ষমতা, মর্যাদা ও শানের প্রতি ঈমান আনয়নকারীকে আল্লাহর জাল্লাশানুহু ক্ষমা করার ঘোষণা দিলেন।

একাদশ আয়াতে রেদা ঃ সূরা দোহা, আয়াত-৫, পারা-৩০

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দুনিয়াবী কষ্টই যা আখেরাতের সোপান

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনাকে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

প্রথমতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ مِنْ رِضٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا يَدْخُلَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ النَّارَ. (رواه ابن جرير)

অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লাশানুহু কর্তৃক তাঁর হাবীব (দঃ) কে রাজী করার অর্থই হলো, তাঁর আহলে বাইত (রাঃ) থেকে কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[১]

দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اَنَا اَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللّٰهُ لَنَا الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى.

অর্থাৎ আমরা আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ তায়ালা আখেরাতকে দুনিয়ার উপর কবুল করে নিয়েছেন এবং ولسوف يعطيك ربك فترضى. এ আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[২]

তৃতীয়তঃ হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুজুর (দঃ) ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট তাশরীফ আনলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) চাক্কি দ্বারা গম পিষতেছেন। যখন হুজুর (দঃ) দেখলেন, বললেন, হে ফাতেমা! তুমি তাড়াতাড়ি কর, আখেরাতের নেয়ামতের বিনিময়ে এই দুনিয়ার কষ্ট, তিক্ততা সহ্য কর। তখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু উক্ত আয়াত নাযিল করেন।[৩]

টীকাঃ-১, ২, ৩ ঃ তাফসীরে দুররে মনসুর ৫ম খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা

চতুর্থতঃ আরেক বর্ণনায় হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছি যে, আমার কোন আহলে বাইত যেন জাহান্নামে প্রবেশ না করে। এই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন।[১]

দ্বাদশ আয়াতে মুহব্বত ঃ সূরা দাহর, আয়াত-৮, পারা-২৯

সৈয়্যদা ফাতেমা (রদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) এর ত্যাগের শিক্ষাই তার ভক্তদের দীক্ষা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.

অর্থাৎ তারা খাবারের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও খাবার দান করেন- মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে।

শানে আহলে বাইত (রাঃ)ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) শিশু অবস্থায় রোগাক্রান্ত হলেন। তখন হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁদের বাঁদি হযরত ফিদ্দা (রাঃ) মান্নত করলেন, আল্লাহ যদি দুই ইমামকে শেফা তথা আরোগ্য দান করেন, তাহলে তারা তিনটি রোযা রাখবেন। আল্লাহ জাল্লাশানুহু এই মান্নতের বিনিময়ে তথা উসিলায় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে শেফা দান করলেন। মান্নতের রোযা আদায় করার জন্য যখন হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফিদ্দা (রাঃ) রোযা রাখেন, তখন ইফতারীর জন্য হযরত আলী (রাঃ) শামুন ইহুদীর নিকট তিন দিনের পরিমান খাবারের যব ধার নিয়ে আসেন।

প্রথম দিনঃ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কিছু যব দিয়ে পাঁচটি রুটি তৈরী করলেন। ঠিক ইফতারের সময় একজন ভিক্ষুক এসে সওয়াল করলেন, ওহে নবীর সাহেবজাদী! আমি মিসকিন আমাকে খাবার দিন। সাথে সাথে ঐ পাঁচটি রুটি তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা পানি দিয়ে ইফতার করলেন।

দ্বিতীয় দিনঃ পাঁচটি রুটি তৈরী করলেন। ঠিক ইফতারের সময় একজন এতিম এসে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দিন। তখন তাকে ঐ রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। এবং তাঁরা পানি দিয়ে ইফতার করলেন।

তৃতীয় দিনঃ পাঁচটি রুটি তৈরী করলেন। ঠিক ইফতারের সময় এক বন্দি এসে সওয়াল করলেন, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দিন। ফলে ঐ বন্দিকে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ঐ ৫টি রুটি দিয়ে দিলেন।

টীকাঃ ১ সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৬১ পৃষ্ঠা

চতুর্থ দিনঃ তিন দিন পর্যন্ত সবাই অনাহারে থাকার কারণে দূর্বল হয়ে পড়লেন। হুজুর (দঃ) এসে দেখলেন, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) নামাযের মুসাল্লায় এবাদতে আছেন। ক্ষুধার কারণে পেট-পিঠ লেগে গিয়েছে। আর ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) ক্ষুধার কারণে কাঁপতে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১]

পাদটীকাঃ আলোচ্য আয়াতে করীমার মধ্যে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) বিশেষ করে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এমনই উৎসর্গ করলেন যে, নিজের মধ্যে ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাবার প্রদান করেছেন। এটাই আহলে বাইতের শান। তাই তাদের শানে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁদের উৎসর্গের কথা উম্মতে মুহাম্মদীয়া তথা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। (সুবহানাল্লাহ), আহলে বাইতের কতই না শান!

ত্রয়োদশ আয়াতে মনযেলাত ঃ সূরা আর রহমান, আয়াত ১৯, ২০, ২২, পারা-২৭

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) এর বংশধরগণ আল্লাহর মনোনীত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থাৎ তিনি দুইটি দরিয়া জারি করেন, দেখলে বুঝা যায় দুইটাই মিলিত। অথচ উভয়ের মধ্যে পর্দা রয়েছে। একটি অপরটির উপর প্রধান্য লাভ করতে পারছেন না। এই দুই দরিয়া হতে মুক্তা এবং মরজান বের হয়।

প্রথমতঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতে দুই দরিয়া দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। উভয়ের মধ্যে নবুয়তের পর্দা রয়েছে অর্থাৎ হুজুর (দঃ)। আর এই দুই দরিয়ার সংমিশ্রণে لؤ لؤ 'মুক্তা' এবং مرجان 'রক্ত প্রবাল' অর্থাৎ ইমাম হাসান (রাঃ) لؤ لؤ আর مرجان তথা ইমাম হোসাইন (রাঃ)বের হয়ে আসেন।[২]

উল্লেখ্য যে, অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে করীমায় আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) বিশেষ করে খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয্ যাহ্রা (রাঃ) এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে নবুয়তের দরিয়া আখ্যায়িত করেছেন।

টীকাঃ ১ সওয়ায়েকে মুহরেকা, খাযেন, মাছদারেক ৪র্থ খন্ড ৩৪৪ পৃঃ, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৬ষ্ঠ খন্ড ৫৪৬ পৃঃ, টীকাঃ-২ তাফসীরে দুররে মনসুর ৬ষ্ঠ খন্ড ১৪২, ১৪৩ পৃষ্ঠা

তৃতীয়তঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবুয়তের দরিয়া এজন্য যে, হুজুর (দঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, فاطمة بضعة منى অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার অংশ। যিনি হুজুর (দঃ) এর অংশ হয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের দরিয়া জারি হয়েছে।

চতুর্থতঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, ফাতেমা আমারই অংশ। যে তাঁকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে তাঁকে আনন্দ দেয়, সে আমাকেই আনন্দ দেয়। কিয়ামত দিবসে মানবজাতির সমস্ত আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বংশধরের আত্মীয়তা, শাশুড় ও জামাতা এগুলো বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আমার নসব জারি থাকবে। (رواه احمد وحاكم)

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

প্রথমতঃ বুঝা গেল যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মাধ্যমে হুজুর (দঃ) এর নবুয়তের দরিয়া তথা নবুয়তের নসল জারি হল। এ নবুয়তের দরিয়ার সাথে বেলায়তের দরিয়া নিকাহের মাধ্যমে জারি হল। সেখান হতে দুই রত্ন ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) পয়দা হলেন।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের বংশধর ছেলের মাধ্যমে হয়। আর হুজুর (দঃ) এর নূরানী বংশ মোবারক খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মাধ্যমে অলৌকিক ও বিশেষত্বভাবে জারি হয়েছে।

চতুর্দশ আয়াতে নাসেবা ঃ সূরা কাউসার, আয়াত নং-১, পারা-৩০

খাতুনে জান্নাত (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর মাধ্যমে বংশধারা প্রবাহিত

আল্লাহ তায়ালা বলেন

انا اعطينك الكوثر

অর্থাৎ আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।

প্রথমতঃ বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দঃ) এর সাহেবজাদা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন কাফের, মুশরেক, মুনাফেকরা বলে যে, নবীর বংশ বিস্তার হবে না (!) যেহেতু
তাঁর ছেলে ইন্তেকাল করেছেন, আর বংশ বিস্তার হওয়ার জন্য পুরুষ সন্তান প্রয়োজন। তখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু সূরা কাউসার নাযিল করেন। যেখানে সুসংবাদ দেয়া হলো যে, আমি আপনার অধিক দান করেছি।[১]

টীকাঃ ১ কাউসারুল খায়রাত ৩৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ কাউসারের তাফসীরের মধ্যে হুজুর পাক (দঃ) এর আউলাদে পাকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর (দঃ) এর আউলাদ জারি থাকবে। স্বয়ং আল্লাহ হুজুর (দঃ) কে অনেক আউলাদ দান করেছেন।[১]

তৃতীয়তঃ এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

لكل بنى اب عصبة الا ابنى فاطمة فانا وليهما وعصبتهما

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তানের বংশীয় নিসবত পিতার দিক দিয়ে হয়, কিন্তু আমার সাহেবজাদী যাহ্‌রা (রাঃ) এর দুই সাহেবজাদার বংশীয় নিসবত আমারই মাধ্যমে হয়েছে। আমিই তাঁদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক।[২]

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

আলোচ্য আয়াতে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বংশ পরম্পরার মাধ্যমে। কিন্তু হুজুর (দঃ) এর অন্যান্য নসল মোবারক থাকার পরেও তাঁদের মাধ্যমে হয়নি। একমাত্র হয়েছে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর মাধ্যমে। সেটা তাঁর মহা মর্যাদারই ধারক ও বাহক।

পঞ্চদশ আয়াতে যিকির বা তসকীনঃ সূরা রা'দ, আয়াত-২৮, পারা-১৩

খাতুনে জান্নাত (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর স্মরনই আল্লাহর যিকির ঃ

আল্লাহ বাণী এরশাদ হচ্ছে-

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থাৎ জেনে রাখ! আল্লাহর জিকিরের দ্বারা অন্তর শান্তি হয়।

প্রথমতঃ ইবনে মরদবীয়া হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। যখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়, তখন হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূল (দঃ)কে এবং আমার আহলে বাইত (রাঃ) কে মুহব্বত করে এবং ঈমানদারদেরকে উপস্থিত অনুপস্থিতি মুহব্বত করবে, অবশ্যই তারা আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে মুহব্বত করতেছে।[৩]

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) এর মুহব্বত কে আল্লাহর জিকির বলা হয়েছে। আহলে বাইতকে মুহব্বত করে স্মরণ করা, আলোচনা করাকে আল্লাহর জিকির বলা হয়েছে।

টীকাঃ ১ কাউসারুল খায়রাত ৩৬ পৃষ্ঠা।
টীকাঃ ২ ঐ তবরানী সূত্রঃ কাউসারুল কায়রাত ৩৬ পৃঃ
টীকাঃ-২ তাফসীরে দুররে মনসুর ৪র্থ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

মাসয়ালাঃ আহ্‌লে বাইতে রাসূল (দঃ) এর আলোচনার দ্বারা মনের মধ্যে অনাবিল শান্তি লাভ করবে। আহলে বাইতের মধ্যে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর আলোচনা করা, কাহিনী অধ্যয়ন করা এবং তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা তাঁর মহত্ত্ব ও বুজুর্গীর কথা স্মরণ করা, এসবগুলিই আল্লাহর জিকিরের মধ্যে শামিল। ইহা দ্বারা অন্তরের শান্তি সৃষ্টি হবে।

ষোড়শ আয়াত ঃ সুরা বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৪, পারা-৩০

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ই ইসলামের সত্যতার অনন্য দলীল

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.

অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল আসার পর।

প্রথমতঃ ইমাম সুয়ুতী ইবনে মুরদবীয়ার মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতে البينة বলতে আলে রসূল (দঃ) উদ্দেশ্য।[১]

দ্বিতীয়তঃ আহলে বাইতে রসূল (দঃ) দ্বীন ইসলাম এবং হুজুর (দঃ) এর নবুয়তের মর্তবার সঠিক পক্ষের স্পষ্ট দলীল। এ আহলে বাইতের অন্যতম খাতুনে জান্নাত (রাঃ)। তিনিই ইসলামের সত্যতার অনন্য দলীল। বাস্তবেও বর্ণনায় তাই। এজন্য বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) এর অনুসরণকে সত্যের পথ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এক হাদিসে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; একটি হল কিতাবুল্লাহ আরেকটা হল আমার আহলে বাইত। তোমরা যদি এই দুই পথ ধর তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত যায়েদ বিন আরকম (রাঃ)।[২]

টীকাঃ-২ তাফসীরে দুররে মনসুর ষষ্ঠ খন্ড ৩৭৯ পৃঃ, আন নফসুল জলী।

টীকাঃ ৩ তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ৪৫৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ২৯৭, ২৭৯ পৃঃ

সপ্তদশ আয়াতে রিফায়াত ঃ সুরা নূর, আয়াত-৩৬, পারা- ১৮

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘরের প্রশংসা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذ كرفيها اسمه يسبح له فيها بالغدوّ والاصال .

অর্থাৎ এমন কতগুলো ঘর আছে যে ঘরগুলোকে আল্লাহ জাল্লাশানুহু উত্তোলন করতে অনুমতি দিলেন এবং সেখানে আল্লাহর নাম জিকির করতে অনুমতি দিলেন আর সেখানে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ হবে।

প্রথমতঃ এ আয়াত নাযিল হাবার পর যখন হুজুর (দঃ) তিলাওয়াত করেন তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! কোন ঘরগুলোর মধ্যে এঘরটি(?) যার আলোচনা আল্লাহ করেছেন। উত্তরে হুজুর (দঃ) বলেন, নবীদের ঘর। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! উক্ত ঘরগুলির মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘর কি অন্তর্ভূক্ত? উত্তরে হুজুর (দঃ) বলেন, হ্যাঁ। এঘরটি উত্তম ঘরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘরের প্রশংসা করেছেন এবং সেখানে সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র জিকির ও এবাদত বন্দেগী হবার কথা আলোচনা করে প্রশংসা করেছেন। ফলে ঐ ঘর আল্লাহর দরবারেও প্রশংসিত। (তাফসীরে দুররে মনসুর ৫ম খন্ড, ৫০ পৃঃ)

প্রথম মাসআলাঃ আউলাদে রাসূল (দঃ) তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরের বাড়ি-ঘর অন্যান্য সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর থেকে উঁচু হওয়া প্রয়োজন এবং তাঁদের আসন বা খানকা ও অন্যান্য ঘর থেকে উচ্চ হবার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। সাধারণ ঈমানদারদেরকে এ কথার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আউলাদে রসূল (দঃ) তথা ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরদের উপরে বসাতে হবে এবং উচ্চ মর্যাদায় তাঁকে স্থান দিতে হবে। আউলাদে রাসূল (দঃ) এর সম্মুখে অপ্রয়োজনে যাবে না।

উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে আলাদা পরিচ্ছেদ করা হবে ইনশাআল্লাহ!

দ্বিতীয় মাসয়ালাঃ এবাদত বন্দেগী করার জন্য কোন একটি জায়গাকে উঁচুভাবে তৈরী করা বৈধ। যা অন্যান্য ঘর বা স্থান থেকে ভিন্নভাবে দেখা যায়। সেখানে আল্লাহর জিকির আজকার হবে। এখান থেকে খানকা শরীফ তৈরী

করার বৈধতা পাওয়া যায়। যা বুজুর্গানে দ্বীন, এবাদত-বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করে থাকেন।

তৃতীয় মাসয়ালাঃ যে ঘর আল্লাহর জিকির ও এবাদত-বন্দেগীর জন্য তৈরী করা হয়, সেখানে আল্লাহর জিকির ও এবাদত বন্দেগীই চলবে। অন্য কোন দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনা করা সমীচীন হবে না। উল্লেখ্য মসজিদও আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্মিত। সেখানে দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনা করলে চল্লিশ বছরের এবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যায়, এ মর্মে একটি হাদিসও রয়েছে। (তাফসীরাতে আহমদিয়া)

উপদেশঃ যারা আউলিয়ায়ে কেরামের খানকা নির্মাণ করাকে বিদয়াত বলে থাকে, যেমন বর্তমানের ওহাবী-মওদূদী ও নজদীরা সর্বদা বলে থাকে এবং রেডিও, টিভির মাধ্যমে অপপ্রচার করে থাকে। তাদের খন্ডনের জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট। এরা মূলতঃ কোরআন-হাদীস বুঝে না। শুধুমাত্র ইহুদী-নাসারার অবৈধ পয়সা গ্রহণ করে ইসলাম ও কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। এরাই আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীসকে বিকৃতকারী, স্বল্প দুনিয়াবী অর্থের বিনিময়ে দ্বীন-ইসলাম, কোরআন ও সুন্নাহ্কে বিকৃত করছে। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমান বিশেষ করে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের অনুসারীদেরকে এসব ধোকাবাজদের বেড়াজাল থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ এ ছাড়া কোরআনে পাকের আরো অনেক আয়াত রয়েছে সেগুলোতে আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) তথা হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর শান-মানের বর্ণনা রয়েছে।

একাদ্বশ অধ্যায়

হাদীসের আলোকে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) এর ফযায়েল

প্রথম হাদীসে বিদয়া ঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে শত্রুতা কুফরী

হযরত মিসওয়ার ইবনে মখরমা (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

إن فاطمة بضعة منى فمن أغضبها اغضبنى

অর্থাৎ ফাতেমা আমার নূরানী শরীর মোবারকের একটি টুকরা। যে তার সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখে।

(বুখারী শরীফ, যখায়েরুল উক্বা)

প্রথম মাসয়ালাঃ মওয়াহেবে লদুনিয়া কিতাবে আল্লামা কস্তুলানী (রাঃ) বলেন,

واستدل به السهيلى على أن سبها كفر

ইমাম সাহেলী (ইমাম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ মৃত্যু ৭৮১ হিঃ) আলোচ্য হাদীস দ্বারা একথার উপর দলীল পেশ করেন যে, যেহেতু হযরত সৈয়্যদা যাহ্রা (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর নূরানী শরীর মোবারকের অংশ। সেহেতু তাঁর শানে বেয়াদবী করা, গালি-গালাজ দেয়া কুফরী।

(মওয়াহেবে লাদুনীয়া ৪০৬ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-২৮২ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় মাসয়ালাঃ ইমাম আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রাঃ) তাঁর কিতাব আশিয়াতুল লুমাতের মধ্যে বর্ণনা করেন,

میگوید که پیغمبر خدا صلّی الله علیه وسلم قال فاطمة بضعة منّی فاطمة گوشت پاره من است وسبکي استدلال کرده است باید که هر که دشنام کرد فاطمة را کافر شود.

অর্থাৎ হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, ফাতেমা আমার অংশ। এ হাদীস দ্বারা ইমাম সুবকী দলীল পেশ করেন যে, যে ব্যক্তি ফাতেমা (রাঃ) এর বদনামী করবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ সে হুজুর (দঃ) এর বদনামী করল আর হুজুর (দঃ) এর বদনামী করাটাই কুফরী।

(আশিয়াতুল লুমাত ৬৮৫ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খন্ড, আলে রসূল-২৮২ পৃষ্ঠা)

মাসয়ালাঃ আওলাদে রাসূল (দঃ) এর মাধ্যমে যদি রাসূল (দঃ) এর কষ্ট হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই আল্লাহর বড় শাস্তি পাবার ভাগী হবে। বরং ঈমান চলে যাবার উপক্রম হবে। আল্লাহ রাসূল (দঃ) কে কষ্ট দেয়া কোন ঈমানদাদের শান নয়।

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল (দঃ) কে কষ্ট দেয়া যে কত মারাত্মক অপরাধ। বরং এটা কুফুরীর অন্তর্ভূক্ত হবে।

পঞ্চমতঃ ইমাম সুয়ুতী (রাঃ) খাছায়েছে কোবরার মধ্যে ইমাম আহমদ, হাকেম, বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত মিসওয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত হাসান মুসান্নাহ ইবনে হযরত হাসান মুজতবা (রাঃ) হযরত মিসওয়ার (রাঃ) এর নিকট দুধ পাঠালেন। হযরত মিসওয়ারের কন্যাকে হযরত হাসান মুসান্নাহ (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। উত্তরে হযরত মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, খোদার শপথ! হযরত হাসান মুসান্নাহ (রাঃ) থেকে বড় পছন্দনীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক আমার নিকট আর কেহ নেই। কিন্তু তাঁর আক্বদের মধ্যে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সাহেবজাদী ফাতেমা ছোগরা আছেন বিধায় আমার কন্যাকে তাঁর আকদের মধ্যে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আপত্তি পেশ করি। কেননা এটা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট কষ্টের কারণ হবে।

পাদটীকাঃ হযরত মখরমা (রাঃ) যিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ব্যাপারে ঐ হাদিসটি বর্ণনাকারী ছিলেন। সেই হাদীসের মধ্যে হুজুর (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট আবু জেহেলেরা কন্যাকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) থাকাবস্থায় বিবাহ করা নিষেধ করেন।

(খাছায়েছে কোবরা ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, আলে রসূল ২৮৫ পৃঃ)

তৃতীয় হাদীস ঃ

হুজুর (দঃ) এর সাথে বেহেস্তে সর্বপ্রথম ফাতেমা (রাঃ) এর আগমন

عن ابي هريرة رض عنه انا اوّل من يدخل الجنة ولا فخرواوّل من يدخل على فاطمة من مثلها فى هذه امة مثل مريم فى بنى اسرائيل اخرجه ابونعيم.

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, সর্বপ্রথম আমিই বেহেস্তে প্রবেশ করার জন্য বেহেস্তের দরজায় কড়াঘাত করব। এটা কোন গৌরবের বিষয় নয়, (বরং শুকর)। এরপর আমার সাথে সর্বপ্রথম বেহেস্তে প্রবেশ করবে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ)। এই

দ্বিতীয় হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) উপস্থিতিতে হযরত আলী (রাঃ) এর অন্য বিবাহ হারাম

প্রথমতঃ হযরত মিসওয়ার বিন মুখরমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এরশাদ করেন, হিশাম বিন মুগিরার মেয়েরা আমার নিকট আবু জেহেলের মেয়েকে হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে শাদী দেওয়ার অনুমতি চাইল।

فلا اذن لهم ثم لا اذن لهم ثم لا اذن لهم

অর্থাৎ আমি তাদেরকে অনুমতি দেব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দেব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দেব না।

হ্যাঁ, এভাবে হতে পারে যদি হযরত আলী (রাঃ) আমার কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে তালাক দেয়, তবে আবু জেহেলের কন্যাকে শাদী করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ অপর বর্ণনায় এসেছে-

أنى لست احرم حلالا ولا أحل حرامًا ولكن والله لايجتمع بينت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبيت عدوّ الله مكانا واحداً ابداً.

অর্থাৎ আমি কোন হালালকে হারাম করি আর কোন হারামকে হালাল করি না। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল (দঃ) এর সাহেবজাদী ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে এক ব্যক্তির শাদীর মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, যখায়েরুল উক্‌বা ৩৭ পৃষ্ঠা)

তৃতীয়তঃ অতঃপর হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

انما ابنتى بضعة منى يريبنى مارابها ويؤذينى ما أذاها .

অর্থাৎ আমার এ আদরের কন্যা ফাতেমা আমার নূরানী শরীরের অংশ। যে কারণে আমার কন্যা সন্দেহের মধ্যে পড়ে, সে কারণে আমিও সন্দেহের মধ্যে পড়ি এবং যে কারণে আমার কন্যা কষ্ট পায়, সে কারণে আমিও কষ্ট পাই।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ, যখায়েরুল উক্‌বা ৩৭ পৃষ্ঠা)

পাদটীকাঃ এ হাদীসের দ্বারা হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মর্যাদা স্বয়ং রাহমাতুল্লীল আলামীন (দঃ) কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে এরশাদ করেন,

وماكان لكم أن تؤذنوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (দঃ) কে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নেই।

উম্মতের মধ্যে তার উপমা বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর ন্যায়। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালামের উপমা ছিল না, এই উম্মতের মধ্যেও হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর উপমা হবে না। তিনিই হবেন এ উম্মতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিনী।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে,

بينهما أهل الجنة اذ سطع لهم نور فظنوا شمسا فيقول رضوان هذه فاطمة وعلى فضحكا اشرقت الجنان من نور ضحكهما.

অর্থাৎ বেহেস্তবাসীরা হঠাৎ করে একটা উজ্জ্বল প্রজ্জলিত নূর দেখবেন, সেটা তারা সূর্য্য মনে করবেন। তখন বেহেস্তের রক্ষী রিদুয়ান (আঃ) বলবেন, এটা কোন সূর্য্য নয়। বরং এটা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) যে মুচকী হাসি দিয়েছেন সেই জ্বলক, তাঁদের হাসির জ্বলকে সমস্ত বেহেস্ত সূর্য্যের হাসির ন্যায় প্রজ্জলিত হল।

(হাকেম মুস্তদারাক ৩য় খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা, শহীদ ইবনে শহীদ কৃত মাঃ সায়েম চিশতী ৪০ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ হাদীসঃ

হযরত যাহ্‌রা বতুল (রাঃ) এর মুহব্বতকারীরা কিয়ামতে হুজুর (দঃ) এর সাথে একত্রিত হবেন

বর্ণিত আছে যে,

ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم اخذ بيد حسن وحسين فقال من احبّنى واحب هذين واباهما وامها كان معى فى درجة يوم القيامة.

অর্থাৎ হুজুর (দঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর হাত ধরলেন, অতঃপর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে, এ দুইজনকে ভালবাসবে এবং এ দু'জনের আব্বাজন হযরত আলী (রাঃ) ও আম্মাজান হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে ভালবাসবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে একই স্থানে থাকবে।

(মসনসে আহমদ ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, সওয়ায়েকে মুহরেকা ১৫১ পৃষ্ঠা, শহীদ ইবনে শহীদ ৪১ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম হাদীসঃ

কিয়ামতের দিন হুজুর (দঃ) এর সাথে ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাঃ) এর অবস্থান

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট তাশরীফ নিলেন, অতঃপর এরশাদ করেন,

انى واياك وهذا النائم يعنى عليًا وهما يعنى الحسن والحسين لفى مكان واحد يوم القيامة.

অর্থাৎ আমি এবং তুমি (ফাতেমা বতুল) এবং এই নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি তথা হযরত আলী (রাঃ) আর ঐ দুইজন তথা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কিয়ামতের দিন এক সাথে থাকবে।

(হাকেম মুস্তদারাক ৩য় খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-৩০৫ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ হাদীসঃ

হাশর দিবসে হুজুর (দঃ) এর গম্বুজের নিচে ফাতেমা বতুল (রাঃ) এর স্থান

হযরত আবু মুসা আশরারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة فى قبّة تحت العرش.

অর্থাৎ আমি এবং হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) আর ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কিয়ামতের দিন এক গম্বুজের নিচে একত্রিত হব।

টীকাঃ মজমাউয জাওয়ায়েদ কৃত হাফেজ নুরুদ্দীন আলি আল হায়সমী ৯ম খন্ড, ১৮৪ পৃঃ, আলে রসূল-৩০৬ পৃষ্ঠা

সপ্তম হাদীসঃ

কিয়ামত দিবসে হুজুর (দঃ) এর সাথে হযরত ফাতেমা (রাঃ)ও সুপারিশকারীঃ

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, বেহেস্তের মধ্যে এমন একটি স্থান আছে। যার নাম ওসিলা। তোমরা দোয়া করার সময় আমার জন্য ঐ ওসিলা চাও। আমি (বর্ণনাকারী) হুজুর (দঃ) এর দরবারে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ঐ স্থানে আপনার সাথে কে থাকবেন? প্রদুত্তরে হুজুর (দঃ) বলেন,

على وفاطمة والحسن والحسين

অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) আর ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) আমার সাথে থাকবে।

(টীকাঃ কানজুল উম্মাল ৬ ষ্ঠ খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা, আলে রসূল ৩০৬ পৃষ্ঠা)

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, হুজুর (দঃ) ওসিলার

ব্যাপারে দোয়া করার জন্য যখন বললেন, তখন ওসিলা কি জিজ্ঞাসা করা হলে হুজুর (দঃ) বলেন,

انا فى درجة واحد

আর উহা একজনই হাসেল করবেন। আশা রাখি যিনি হাসিল করবেন তিনি আমিই হব।

(টীকা- তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

অষ্টম হাদীস ঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর অনুসরণই মুক্তির ওয়াসিলা ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের দিন হুজুর (দঃ) কসওয়া নামক উটের উপর আরোহী অবস্থায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন হুজুর (দঃ) এ কথা বলেন,

يايها الناس انى تركت فيكم ماان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى واهل بيتى.

অর্থাৎ হে মানবজাতি! আমি তোমাদের নিকট এমন এক বস্তু রেখে যাচ্ছি, এটা যদি তোমরা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়িয়ে ধর তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত পথহারা হবে না। তন্মধ্যে একটা হল, কিতাবুল্লাহ তথা কোরআনে করীমা, অপরটি হল আমার আহলে বাইত।

(টীকা, তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড ৭৩৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

যেহেতু আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্যতম সেহেতু খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর আদর্শ অনুসরণীয়। তিনি পথ হারা উম্মতের মুক্তির দিশারী।

নবম হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) অনুসারীরা বেহেস্তী

হযরত যায়েদ বিন আরকম (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

انّ تارك فيكم ما ان تمسكم به لن تضلوا بعدى احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى اهل بيتى ولن يتفرقا حتّى يردا علىّ الحوض فانظروا كيف تخلفوان فيهما.

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়িয়ে ধর তাহলে পরবর্তীতে তোমরা পথহারা হবে না। ঐ দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি অপরটি থেকে বড়। প্রথমটি হল, কিতাবুল্লাহ; এটা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত নূরের একটি রশ্মির ন্যায়। আর অন্যটি হল, আমার আহলে বাইত। কোরআন এবং আমার আহলে বাইত দুনিয়ার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য থাকবে একে অপর হতে ভিন্ন হবে না। পরবর্তীতে এ দু'টাই আমার কাছে হাউজে কাউসারের নিকট একত্রিত হবে। আমার পরে এ দুই জিনিসের ব্যাপারে তোমরা কিরূপ ব্যবহার করবে তা গভীরভাবে দেখ।

(টীকাঃ তিরমিযী শরীফ, ৭৯৮ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড)

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ প্রাগুপ্ত হাদীসে হুজুর (দঃ) সাব্যস্থ করেছেন, কোরআন আহলে বাইত থেকে পৃথক নয় আর আহলে বাইত কোরআন থেকে পৃথক নয়। কোরআন শরীফ আহলে বাইতের শান বয়ান করে আর আহলে বাইত আমলের মাধ্যমে কোরআন শরীফের শান বয়ান করে। বস্তুত: কোরআন ও আহলে বাইত একে অপরের প্রতিচ্ছবি এবং আহলে বাইত কোরআনে পাকেরই বাস্তবতা আর যারা কোরআন মানবে তারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে মানবে। আর যারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে তারা মূলতঃ কোরআন মানে না।

এ মর্মটি নিচক কথার কথা নয়। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে অনুমান হয়। উপরন্তু কোরআন এবং হাদীসের প্রমাণাদি দ্বারা তা স্পষ্টভাবে সাব্যস্থ।

দশম হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বত ঈমানদারীর পরিচায়ক

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

لا يؤمن عبد حتى اكون احبّ اليه من نفسه وتكون عترتى احبّ اليه من عترتى واهلى احبّ اليه من اهله واذاتى احبّ اليه من ذاته

অর্থাৎ কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার অস্থিত্ব ও আত্মা থেকে অতি নিকটতর না হই এবং আমার আহলে বাইত ও তার বংশধর থেকে তার নিকট অতি প্রিয় না হয় আর আমার পরিবারও তার নিকট তার পরিবার থেকে অতি প্রিয় না হয় এবং আমার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব থেকে অতি প্রিয় না হয়।

(টীকাঃ আশশরফুল মুয়ায়দ ৮৫ পষ্ঠা, খুতবাতুল মুহররম ২৩৩ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে কোন মুসলমান তার স্বীয় বংশধর থেকেও অধিকতর মুহব্বত না করে সে ঈমানদার হতে পারে না। আর যে বা যারা তাঁকে অধিকতর ভালবাসাবে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে। তাই হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বত ঈমানদারের লক্ষণ।

একাদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শ নূহ (আঃ) এর কিশতী সমতুল্য

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কাবা শরীফের দরজা ধরে বলেছেন, আমি হুজুর (দঃ) হতে একথা এরশাদ করতে শুনেছি-

الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.

অর্থাৎ জেনে রাখ! তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইত নূহ (আঃ) এর কিশতীর ন্যায়। যারা কিশতীর উপর আরোহন করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা পিছনে রয়ে গেল তারা ডুবে মরল।

(টীকা- খাছায়েছে কোবরা ৪৬৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৫৭৩ পৃঃ)

উল্লেখ থাকে যে, আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্যতম। যারা আহলে বাইত তথা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মুহব্বতের আদর্শের কিশতিতে আরোহণ করবে, তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বেড়াজালের তুফান থেকে রক্ষা পাবে। যেমনি ভাবে হযরত নূহ (আঃ) এর অনুসারীরা তাঁর কিশতীতে আরোহন করার মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিল।

দ্বাদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) সত্যের মাপকাঠিঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

النجوم أمان لاهل الارض من الغرق وأهل بيتى أمان لامتى من الاختلاف فاذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس واخرجه ابويعلى وابن ابى شيبة سلمة بن الاكوع.

অর্থাৎ আসমানের তারকা জমিনবাসীর জন্য গরকী (তুফান, ডুবে যাওয়া) থেকে

রক্ষাকারী। আর আমার আহলে বাইত (হযরত ফাতেমা (রাঃ) এখানে অন্তর্ভূক্ত) আমার উম্মতকে মতবিরোধ থেকে রক্ষাকারী কোন সম্প্রদায় যদি আহলে বাইত (এখানে ফাতেমা (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত) এর বিরোধীতা করবে তারা এখতেলাফের মধ্যে পড়ে যাবে। পরিশেষে তারা ইবলিশের দলে পরিণত হবে। (টীকা- খাছায়েছে কোবরা ২য় খন্ড ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমাদের মধ্যমনি

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اجعلوا اهل بيتى منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس ولا تهتدى الرأس الا بالعينين.

অর্থাৎ তোমরা আমার আহলে বাইত (ফাতেমা (রাঃ) এখানে অন্তর্ভূক্ত) কে এভাবে মর্যাদা দান কর, তোমাদের শরীরের মধ্যে মাথার যে স্থান আছে সে স্থানের ন্যায় আবার মাথার মধ্যে দু'চক্ষুর যে স্থান আছে সে স্থানের ন্যায়, আর মাথা দুই চক্ষু ছাড়া হেদায়ত পাবে না।

(টীকা- আলে রসূল- ৯৪ পৃষ্ঠা, আশশরফুল মুয়ায়েদ ২৮ পৃষ্ঠা)

এখানে আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্যতম। তাই হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর সম্মান অতি উচ্চে। তাঁকে আমাদের মহিলা সমাজ স্বীয় জীবনের আদর্শের মধ্যমণি হিসেবে গ্রহণ করলেই ইহকালিন ও পরকালিন মুক্তির পথ পাবে। সুতরাং হযরত ফাতেমা (রাঃ) নারী সমাজের মধ্যমণি হয়ে থাকবেন- কিয়ামত পর্যন্ত। তাই তাঁর আদর্শের অনুসরণ আমাদের জন্য জীবনের চলার পথের পাথেয় হিসেবে সাব্যস্থ।

চতুর্দশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর অনুসারীদের জন্য সুপারিশ অবধারিত

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اربعة انالهم شفيع يوم القيامة المكرّم الذريتى والقاضى حوائجهم والساعى فى امورهم عند اضطرارهم اليه والمحبة لهم بقلبه ولسانه.

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তির জন্য আমি নিজেই সুপারিশ করব, প্রথমতঃ

যে আমার আহলে বাইত ও বংশধরকে সম্মান দিবে। দ্বিতীয়তঃ যে আমার আহলে বাইতের বংশধরের অভাব পুরণ করবে। তৃতীয়তঃ যে আমার আওলাদের মধ্যে কেহ অস্থির হয়ে পড়লে উদ্ধার করার জন্য প্রয়াসী হবে। চতুর্থতঃ যে আমার আওলাদের জন্য কথায় কাজে মনে প্রাণে মুহব্বত রাখে। (টীকাঃ যখায়েরুল উক্‌বা ১৮ পৃষ্ঠা, সওয়ায়েকে মুহরেকা)

যেহেতু হুজুর (দঃ) এর আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্যতম। সেহেতু যারা ফাতেমা (রাঃ) কে মুহব্বত করে তাঁর আদর্শকে কথায় ও কাজে বাস্তবায়ন করে অস্থির মানব জাতিকে শান্তি ও কল্যাণময় আদর্শ উপহার দেয়ার মানসে গরীব দুঃখীদের সেবায় আত্ম নিয়োগ করবে। তারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যারা তাকে মুহব্বত করবে তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে শাফায়াত অবধারিত।

পঞ্চদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বত আল্লাহর সন্তুষ্টির সোপান

হুজুর পাক (দঃ) এরশাদ করেন,

انا واهل بيتى شجرة فى الجنة واغصانها فى الدين فمن تمسّك دينا اتخذ ربّه سبيلا.

অর্থাৎ আমি এবং আমার আহলে বাইত বেহেস্তের মধ্যে একটি বৃক্ষ স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দুনিয়াতে রয়েছে। যারা আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, সে তাঁর প্রভু পর্যন্ত পৌছার পথ সুগম করে নিয়েছে।

(টীকা- যখায়েরুল উক্‌বা ১৬ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) যেহেতু অন্তর্ভূক্ত সেহেতু যারা ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে। আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে তাদের জন্য ইহ ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হবে। আল্লাহ আমাদের নারী সমাজকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন। আমীন।

ষোড়শ হাদীসঃ

ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর প্রতি ভালবাসা পুলসিরাতের সংকট মুক্তির উসিলা

হযরত ইবনে আদি এবং ইমাম দাইলামী (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اثبتكم على الصراط اشدكم حبًا لا هل بيتى ولا صحابى

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তি স্থির ও অটল থাকবে, যে আমার আহলে বাইত ও আমার সাহাবীদের প্রতি মুহব্বত রাখে।

(টীকা- সাওয়ায়েকে মুহরেকা ১৮৭ পৃষ্ঠা, আলে রসূল ১০২ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্যতম, তাই যারা যাহ্‌রা বতুল (রাঃ) এর প্রতি মুহব্বত রাখবে তার জন্য ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বত পুলসিরাতের সংকট মুক্তির উসিলা হবে।

সপ্তদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তুলনাহীন

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

نحن اهل بيت لا يقاس بنا أحد

অর্থাৎ আমরা আহলে বাইত। আমাদের উপর কাউকে তুলনা করা যাবে না।

(টীকাঃ যখায়েরুল উক্‌বা ১৭ পৃষ্ঠা)

হযরত ফাতেমা (রাঃ) আহলে বাইতের মধ্যে শামিল বিধায় তাঁর সাথে পৃথিবীর অন্য কারো তুলনা করা যাবে না। হযরত যাহ্‌রা বতুল (রাঃ) এর সম্মান যে সমগ্র নারী জ গতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এ হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

অষ্টদশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শের শিক্ষার্জন আবশ্যক

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ছেলেদেকে তিন কথা শিক্ষা দাও-

حب نبيكم و حب اهل بيته وعلى قراءة القران والحديث.

প্রথমতঃ তোমাদের নবী (দঃ) এর মুহব্বত, **দ্বিতীয়তঃ** আহলে বাইতের মুহব্বত, **তৃতীয়তঃ** কোরআন ও হাদীসের তিলাওয়াত।

(টীকা- সাওয়ায়েকে মুহরেকা-১৭২ পৃষ্ঠা, আলে রসূল ১০৫ পৃষ্ঠা)

আলোচ্য হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা বতুল (রাঃ) এর মুহব্বতের শিক্ষার্জন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর অত্যাবশ্যক। কেননা তাঁর জীবানদর্শ মুসলিম নর-নারীর চলার পথের পথ নির্দেশিকা। যেই নির্দেশিকা আদর্শ নারী সমাজের ভূষণ। যারা তাঁর আদর্শের শিক্ষার্জনের মাধ্যমে স্বীয় জীবনকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত করতে চায় তারাই মূলতঃ বেহেস্তী রমণীদের অন্তর্ভূক্ত। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছেন আর প্রথম পর্যায়ে নবী করিম (দঃ) এর মুহব্বত সৃষ্টি করা তথা মুহব্বতে সাগরে ডুব দেয়াতো ঈমানদারের কাজ। আর এ দু'টিকে সমুন্নত রাখার জন্য কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন তথা কোরআন-হাদীসের আলোকে তাঁদের জীবনী গ্রন্থ পঠন-পাঠন, প্রচার-প্রসার ও মুহব্বতের মধ্যে পরিগণিত। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উনবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সাহায্যকারীদের বিনিময় অবধারিত

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

من صنع مع أحد من اهل بيتى يدا كافأته عليها يوم القيامة و فى حديث اخر من صنع الى احد من اهل بيتى معروفًا معجز عن مكافاته في الدنيا فاتا المكافى له يوم القيامة.

অর্থাৎ যারা আমার আহলে বাইতের কাউকে সাহায্য করে কিয়ামতের দিন তার বিনিময় আমি নিজেই দেব। অপর বর্ণনার মধ্যে এসেছে কেউ যদি আমার আহলে বাইতের প্রতি সাহায্য-সহযোগীতা করেছে, ঐ বংশধর দুনিয়ার মধ্যে এর বিনিময় দিতে না পারলেও কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে আমিই বিনিময় দেব।

(যখায়েরুল উক্বা-১৯ পৃষ্ঠা, সাওয়ায়েকে মুহরেকা-১৮৭ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-১০১ পৃষ্ঠা)

উপদেশঃ এতে বুঝা যায়, যারা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর সাহায্য-সহযোগীতা করবে, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের সুখবর রয়েছে। আহলে বাইতের শান-মান বর্ণনাকারীদের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (দঃ) এর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারের বর্ণনা আলোচ্য হাদীসে রয়েছে। যারা আহলে বাইতের শানমান প্রচার করবে এবং তা স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করবে তারাই সৌভাগ্যশালী। আহলে বাইতে রসূল (দঃ) তথা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর

জীবানদর্শের প্রচার-প্রসারে যারা সচেষ্ট হবে এবং জীবনীগ্রন্থ রচনায় সাহায্য-সহযোগীতা করবে তারাই ইহকাল ও পরকালে মহা নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। যেই নেয়ামতের বিনিময় অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনায় হবে না। যা দেখে আশেকীনরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রভুর দরবারে শোকরীয়ার সিজদায় অবনত হতে বাধ্য হবে। তাঁদের আশাতীত সাফল্য একমাত্র এশ্‌কে আহলে বাইতে রসূল (দঃ), তাই আহলে বাইতের শান-মানের প্রচার-প্রসারের সওয়াব ও সুফল অনিবার্য। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

বিংশতম হাদীসঃ

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মুহব্বত এবাদত থেকেও উত্তম

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত (দঃ) এরশাদ করেন,

حبّ ال محمد صلّى الله عليه وسلم يومًا خيرمن عبادة سنة ومن مات عليه الجنة

অর্থাৎ আলে রসূল (দঃ) এর প্রতি এক দিনের মুহব্বত এক বছরের এবাদত থেকেও উত্তম। আর যে এই মুহব্বতের উপর মৃত্যু বরণ করবে যে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

(নূরুল আবছার-১১৪ পৃষ্ঠা, কৃত-আল্লামা শবেলঞ্জী, সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৭৭৬ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-৯৭ পৃষ্ঠা)

এ থেকে বুঝা যায় যে, আলে রসূল (দঃ) তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতি মুহব্বত এবাদত থেকেও উত্তম। আর যে তাঁর সাথে মুহব্বত রাখে সে বেহেস্তের অধিকারী হবেন।

একবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতকারীদের মৃত্যুকালীন কয়েকটি সুসংবাদ

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

من مات على احبّ ال محمد مات شهيد الا ومن مات على حبّ محمد مات مغفوراً له.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদ (দঃ) এর মুহব্বতে মৃত্যু বরণ করবে সে শহীদের মৃত্যু পেল, তথা জেনে রাখ যে, আলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মুহব্বতে যে মৃত্যু বরণ করবে সে গুনাহ মাফ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على حبّ ال محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان

অর্থাৎ যে আলে রসূল (দঃ) এর মুহব্বত মৃত্যু বরণ করবে, ঈমানের পরিপূর্ণতা নিয়ে তার মৃত্যু হল।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على حبّ ال محمد مات تائبا.

অর্থাৎ যে আলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মুহব্বতে মৃত্যু বরণ করবে তওবাকারী অবস্থায় তার মৃত্যু হল।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على حبّ ال محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير

অর্থাৎ যে আলে বাইতে রাসূল তথা ফাতেমা (রাঃ) এর বংশের মুহব্বত নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে তাঁকে মালাকুল মউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা বেহেস্তের সুসংবাদ দেবে এবং মুনকার-নকীরও বেহেস্তের সুসংবাদ দেবে।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على حبّ ال محمد يزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলে রসূল তথা আওলাদে ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতে মৃত্যু বরণ করবে, তাকে দুলহার ন্যায় বেহেস্তে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনি ভাবে দুলহানকে দুলহীনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات علي حبّ ال محمد فتح له في قبره بابان الى الجنة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলে রসূল তথা আওলাদে ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতে মৃত্যু বরণ করবে তাঁর জন্য বেহেস্তের দুটি দরজা খোলা হবে।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على حبّ ال محمد جعل الله قبره مزار ملئكة الرّحمة

অর্থাঃ যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদ (দঃ) তথা ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতের উপর মৃত্যু বরণ করবে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তার কবরকে রহমতের ফেরেশতার জিয়ারতগাহ্ বানিয়ে দেবে।

* হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الاومن مات على حبّ ال محمد مات على اهل السنة والجماعة.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলে বাইত (দঃ) তথা ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতের মধ্যে মৃত্যু বরণ করবে তার মৃত্যু আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের উপর হবে। তথা ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হবে।

(টীকা- তাফসীরে কবীর ৭ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা), তাফসীর কাশশাফ, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৫৩৪ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে আরবী, আশশরফুল মুয়ায়েদ, নাজাহাতুল মাজালেস ২য় খন্ড ২২২ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-৯৮,৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রাগুপ্ত হাদীস সমূহে আলে রসূল বা আলে মুহাম্মদ (দঃ) এর মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) যেহেতু অন্তর্ভূক্ত সেহেতু যারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতি ভালবাসা-মুহব্বত রেখে সে অনুযায়ী স্বীয় জীবনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞা করবে। আল্লাহ তাকে হযরত ফাতেমা বতুল (রাঃ) এর উসিলায় বর্ণিত নেয়ামত রাজি সহ ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করবেন, আর যার মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে তিনি তো বেহেস্তে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সঙ্গী হবেন নিঃসন্দেহে। আল্লাহ আমাদেরকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শ চরিত্রে চরিত্রবান হবার তাওফীক দান করুন। আমিন। বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দ্বাদবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতি বিদ্বেষীরা জাহান্নামী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

لوان رجلاً صعد بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بيت محمد صلّى الله عليه وسلم دخل النار.

অর্থাঃ যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইব্রাহীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, রোযাও রাখে, কিন্তু মনে মনে আমার আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখল, নিশ্চয় সে জাহান্নামে যাবে।

(টীকা- আশশরফুল মুয়ায়েদ ৯২ পৃষ্ঠা, যখায়েরুল উক্বা ১৮ পৃষ্ঠা, খছায়েছে কোবরা ৪৫৬ পৃষ্ঠা, সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৭৯৫ পৃষ্ঠা)

যেহেতু আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা বতুল (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত সেহেতু তাঁর সাথে যিনি বিদ্বেষভাব রাখবে, তাঁর আদর্শের বিপরীত কাজ করে তাঁর মনে কষ্ট দেবে সেও জাহান্নামীদের মধ্যে শামিল হবে। তাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ!

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নারী সমাজ তথা আশেকে আহলে বাইতদেরকে এশকে মোস্তফা (দঃ) প্রদানের মাধ্যমের দ্বীন ও মাযহাবের খেদমতে আত্ম নিয়োগ করার তাওফীক দান করুন এবং পরকালে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব হতে রক্ষা করুন। আমীন।

ত্রয়োবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর ফয়সালা

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

يا فاطمة ان الله عز وجلّ يغضب لغضبك ويرضى لرضاك خرجه ابوسعد فى شرف البنوة والا مام على بن موسى الرضى فى مسنده.

অর্থাৎ হে আমার আদরের কন্যা ফাতেমা! আল্লাহ জাল্লাশানুহু তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন আর তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।

(টীকা- যখায়েরুল উক্বা ৩৯ পৃষ্ঠা, আলে রসূল ৩০৯ পৃষ্ঠা)

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ আলোচ্য হাদীস হতে একথা সাব্যস্থ হলো যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাঃ) এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। কারো কথায় ও কাজের মধ্যে যদি হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শ পরিপন্থী কোন কাজ পরিলক্ষিত হয় কিংবা শানে আহলে বাইতের প্রতি কেহ দুর্নাম ও খারাপ আচরণ করে তখন তিনি অসন্তুষ্ট হন আর যদি কেহ তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে এবং আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে তখন তিনি সন্তুষ্ট হন। ফলে যারা ফাতেমা (রাঃ)কে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করল আর যারা ফাতেমা (রাঃ) কে সন্তুষ্ট করেছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করল।

মাসয়ালাঃ যারা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর সম্মানিত পিতাজান আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর শানে বেয়াদবী মূলক কটুক্তী করে তাদের উপর ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রাঃ) অসন্তুষ্ট হন। ফলে তাদের উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট। এজন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ছাড়া অন্যান্য সব বাতিল ফেরকার উপর ফাতেমা (রাঃ) অসন্তুষ্ট। তাদের উপর খাতুনে জান্নাত (রাঃ) নারাজ হবার কারণে তারা জাহান্নামী। এই জন্য আল্লাহর হাবীব (দঃ) বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ছাড়া অন্যসব বাতিল ফেরকা জাহান্নামী।

চতুর্বিংশ হাদীসঃ

জীবন চলার পথে হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে অনুসরণ করার নির্দেশ

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اهتدوا بالشمس فاذاغاب الشمس فاهتدوا بالقمر واذا غاب القمر فاهتدوا بالزهرة واذا غاب الزهر فاهتدوا بالفرقدان فقال الشمس انا والقمر على والزهره فاطمة الفرقدان الحسن والحسين

(كذا فى روضة الاحباب روابع المصطفى.)

অর্থাৎ তোমরা চলার সময় সূর্য্যের আলোকে অনুসরণ করে চলা আর সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি বেলায় চন্দ্রের আলোকে অনুসরণ করে চল, আর চন্দ্র অস্ত গেলে শুকতারাকে অনুসরণ করে চল। আর শুকতারা অস্ত গেলে দুই ফরক্বদ তথা পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি তারাকে অনুসরণ কর। অতঃপর হুজুর (দঃ) বলেন, সূর্য্য হলাম আমি (নবুয়তের) আর চন্দ্র হচ্ছে হযরত আলি (বেলায়তের) আর শুকতারা হলেন হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) আর দুই ফরক্বদ হচ্ছে ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)।

(টীকা- রওয়ায়েহুল মুস্তফা-৩৬ পৃষ্ঠা)

এখানে শুকতারার অনুসরণের মর্মার্থ হলো হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শের পথে ও মতে নারী জাতির জীবন যাপন পরিচালিত করা। তাই হযরত ফাতেমা (রাঃ) অনুসরণীয় আদর্শ।

পঞ্চবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সাথে শত্রুতাই আল্লাহর শাস্তির উপযোগী

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه ايس من رحمة الله

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর ব্যাপারে দুশমনী মনোভাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামত দিবসে সে এভাবে উপস্থিত হবে যে, তার দুই চক্ষুর মধ্যখানে লিখা থাকবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।[১]

এখানে আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর মধ্যে যেহেতু হযরত ফাতেমা (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত সেহেতু যারা তাঁর সাথে কিংবা তাঁর আদর্শের সাথে শত্রু মনোভাব

পোষণ করবে তারা আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হবে। এ শত্রুতা হয়তঃ তাঁর আওলাদ তথা বংশধরদের শত্রুতার মাধ্যমে হতে পারে, কিংবা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শের বিপরীত কার্যক্রম করার মাধ্যমে হতে পারে। যে সব নারী পর্দা প্রথাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে গ্রহণ করে, নারী স্বাধীনতার নামে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করে, যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব অশ্লীল কার্যকলাপ যারা করবে তারা অবশ্যই আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হবে।

ষোড়বিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব বেঈমানের লক্ষণ

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً

অর্থাৎ- আলে রসূল (দঃ) এর প্রতি বিদ্বেষভাব নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করল, তাদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হলো।[২]

মূলতঃ আলে রসূল (দঃ) এর প্রতি মুহব্বত ও শ্রদ্ধা করা ঈমানেরই একটি অংশ। যারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আলে বাইতে রাসূল (দঃ) এর প্রতি আদর্শ ও চরিত্রের দিক দিয়ে কিংবা যে কোন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হবে না। ফলে আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখার কারণে বেঈমানের মৃত্যু নসীব হবে। তাই বলা যায় আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব ঈমান হারার আলামত।

সপ্তবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতি হেয়প্রতিপন্নকারীর জন্য বেহেস্ত হারাম

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

الا ومن مات على بغض ال محمد لي يشمّ رائحة الجنة.

অর্থাৎ যারা আলে বাইতে রসূল (দঃ) এর প্রতি হেয় মনোভাব রেখে মৃত্যু বরন করবে, তারা কখনো বেহেস্তের সুগন্ধী পাবে না।[৩]

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর প্রতি যে হেয় মনোভাব পোষণ করবে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বেহেস্তের আশা করতে পারে না।

টীকা-১, ২, ৩, তাফসীরে ইবনে আরবী ২য় খন্ড ৪৩৩ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কবীর ২৭ খন্ড ১৫৫, ১৬৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮ম খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠা, আশ শরফুল মুয়াইয়্যেদ ৭৪ পৃষ্ঠা, নাজাহাতুল মাজালেস ১২২ পৃষ্ঠা, খুতবাতুল মুহররম ২৬২ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-১০০ পৃষ্ঠা)

উপদেশ ও নসিহতঃ

স্মর্তব্য যে, আলে রসূল (দঃ) এর মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) সহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের আওলাদগণ অন্তর্ভূক্ত আছেন। হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এবং সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমেরি (রাঃ) এবং গাউছে জমান হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রাঃ), গাউসে জমান হুজুর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ) এবং বর্তমান সাজ্জাদানসীন গাউসে যমান হুজুর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (ম.জি.আ.) ও হুজুর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ (ম.জি.আ.) আলে রসূলের অন্তর্ভূক্ত। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর লক্ষ কোটি দিশাহারা মানুষ সত্যের পথ পেয়েছেন।

এদের শানে কটুক্তীকারীরা আলে রসূল (দঃ) এর প্রতি শত্রুতা পোষণকারী কি হবেন না? নিশ্চয় হবেন। ফলে এই সমস্ত সমালোচনাকারীরা উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে যে সমস্ত গজবের কথা বলা হয়েছে, সে সব গজবের ভাগী হবে। আর দুনিয়া ও আখেরাতে তারা লাঞ্চনার পাত্র হবে।

অষ্টবিংশ হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা মুনাফেক

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم من ابغض اهل البيت فهو منافق

অর্থাৎ আহলে বাইতে রসূল (দঃ) এর প্রতি যে বিদ্বেষভাব রাখবে, সেই মুনাফেক (মুখে কলেমা অন্তরে কুফরী)।

(টীকা- সাওয়ায়েক মুহরেকা-১৭৪ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-১০৬ পৃষ্ঠা)

ঊনত্রিশতম হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত

ইমাম হোসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

لا يبغضنا ولا يحسدنا احد الا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار. رواه الطبرانى

অর্থাৎ যারা আমার আহলে বাইতের সাথে হিংসা-বিদ্বেষের মনোভাব রাখবে কিয়ামতের দিন তাকে হাউজে কাউসার হতে আগুনের দোররা দিয়ে প্রহার করে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে।

(টীকা-সাওয়ায়কে মুহরেকা-১৭৪, আলে রসূল-১০৬, খাছায়েছে কোবরা-৪৬৬ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ থাকে যে, আহলে বাইতে রসূল (দঃ) তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁর আওলাদগণের উপর যারা বিদ্বেষভাব রাখবে মুসলমান হলেও তারা এজিদের অনুসারী। বর্তমানেও তা পরিলক্ষিত হয়। আওলাদে রসূল (দঃ) এর শান-মান দেখলে এদের শরীরে আগুন লেগে যায়। এটাই হলো, দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবারই লক্ষণ। পরবর্তীতে কেয়ামতের মধ্যেও এরকম হবে।

মাসয়ালাঃ ওহাবী-নজদী-খারেজী-মওদূদী বর্তমানের আহলে হাদীস-তাবলীগ সবাই আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী দল। সুতরাং সকলেরই জ ন্য আল্লাহর গজব ও আযাব অবধারিত। আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখাটাই প্রমাণ করে যে, তারা বাতিল।

ত্রিশতম হাদীসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের প্রতি অবিচার হারামঃ

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

وحرمت الجنة على من ظلم اهل بيتى

অর্থাৎ তাদের জন্য বেহেস্ত হারাম, যারা আহলে বাইতের উপর অত্যাচার, অবিচার করবে।

(টীকা- সাওয়ায়েকে মুহরেকা-৭৯৫ পৃষ্ঠা, হাকে কারবালা ৭ পৃষ্ঠা)

একত্রিশতম হাদিস ঃ

আহলে বাইতের জন্য সদকা গ্রহণ হারাম এবং তাদেরকে ছদকা দেয়াও হারাম

হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

ان الله حرم على الصدقة وعلى اهل بيتى

অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লাশানুহু আমার উপর এবং আমার আহলে বাইতের উপর সদকা হারাম করে দিয়েছেন।

(টীকা- খাছায়েছে কোবরা-৪০৫)

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

যেহেতু আল্লাহ জাল্লাশানুহু আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) কে পুতঃপবিত্র রাখার ওয়াদা দিয়েছেন। এ কারণে সদকা ও যাকাত যা মানুষের মালের ময়লা হিসেবে সাব্যস্থ। তা থেকে হারাম করে দেয়ার মাধ্যমে পুতঃপবিত্র রেখেছেন।

মাসয়ালাঃ ফোকাহায়ে কেরামের মতে, হুজুর (দঃ) এর দাদার বংশধর এবং বনী হাশেম লোকদের পর্যন্ত এগুলি তথা সদকা-যাকাত হারাম বলে মত দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাদের গোলামদের জন্যও হারাম। এক হাদীসের মধ্যে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

وان مولى القوم

অর্থাৎ গোত্রের গোলামও গোত্রের অন্তর্ভূক্ত।

একারণে আলে রসূল, বনী মুত্তালিব ও বনী হাশেম এবং তাদের গোলামদের জন্য সদকা হারাম। ইহা এজন্য যে, তাদের বংশের মর্যাদার জন্য এটা করা হয়েছে।

সর্তকবাণীঃ

সাবধান! আমাদের দেশে অনেকে সৈয়্যদজাদাদেরকে যাকাত-ফিতরা টাকা প্রদান করেন। এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। কেননা এদেরকে সদকা-ফিতরা দিলে প্রথমতঃ তো আদায় হবে না। দ্বিতীয়তঃ গুনাহ্‌র ভাগী হবে। যদি কোন সৈয়্যদজাদা অভাবে পড়েন তাহলে তাঁকে সদকা ফিতরা ছাড়া অন্য কোন মাল থেকে সাহার্য্য করা উচিত। আফসোস! আমাদের দেশে সৈয়্যদজাদাদের কোন মূল্যায়ন নেই। এ পুস্তকের ভিন্ন এক পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে আলোচনা করব, ইনশাল্লাহ্‌।

বত্রিশতম হাদীস ঃ

আহ্‌লে বাইতের জন্য সদ্‌কা নিষিদ্ধঃ

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত: হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সদ্‌কা সম্পর্কে অধিকভাবে বর্ণনা করতেন।

إنما هى اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لا محمد

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, এ সদ্‌কাগুলি মানুষের মালের ময়লা, এ জিনিস হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য হালাল নয়।

টীকাঃ- আশশারফুল মুয়াব্বেদ ৩৪ পৃষ্ঠা , আলে রাসূল- ১০৭ পৃষ্ঠা খাছায়েছে কোবরা- ৪০৪ পৃষ্ঠা।

তেত্রিশতম হাদিসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন-

لايحل هذا المسجد لجنب ولا حائض الا لرسول الله صلّى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين.

অর্থাৎ এ মসজিদের কোন পুরুষের জন্য নাপাকী অবস্থায় এবং কোন মহিলার জন্য হায়েয অবস্থায় প্রবেশ করা হালাল নয়। কিন্তু ইহা আমার জন্য, মাওলা আলী (রাঃ) এর জন্য, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর জন্য তাঁদের দু'সন্তান ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ) এর জন্য (উক্ত অবস্থায়) জায়েয।

(টীকাঃ খাছায়েছে কোবরা-৪২৭ পৃষ্ঠা)

আহলের বাইতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

স্মর্তব্য যে, পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কোন হায়েয বা নেফাস ছিল না। কেননা তিনি মানবীয় বেহেস্তী হুর। উক্ত হাদিসে তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে। যদি তাঁর হায়েয হত তাহলে সে অবস্থায়ও মসজিদে অবস্থান করা বৈধ হত। এছাড়া নাপাকী অবস্থা হওয়াতো স্বাভাবিক। ঐ অবস্থায়ও হালাল।এসব কিছু তাঁদেরই বৈশিষ্ট্যাবলী,যা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দেয়া হয়েছে। অন্য উম্মতের বেলায় তা দেয়া হয়নি।

চৌত্রিশতম হাদিসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁর আওলাদদের উপর দরুদ পাঠই নামাযের পরিপূণ্যতা

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত,

لو صليت صلواة لا اصلّى فيها علي محمد وعلى ال محمد مارايت انها تتم

অর্থাৎ আমি যদি কোন নামায পড়ি যেখানে হুজুর (দঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরুদ শরীফ না পড়ি, তাহলে আমি সেই নামাযকে পরিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি না।

(টীকাঃ বায়হাকী ২য় খণ্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-১০৯ পৃষ্ঠা)

এতে বুঝা যায়, নামাযে আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নামে দরূদ পাঠ না হলে নামাযে পরিপূর্ণ হয় না। তাই দরূদ শরীফ পাঠ উম্মতি মুহাম্মদীর উপর আবশ্যক করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতের মর্যাদাকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছে।

পঁয়ত্রিশতম হাদিসঃ

নামাযে হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের স্মরণে দরূদ পাঠ আবশ্যক

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেছেন-

من صلىٰ صلاة ولم يصلّى فيها على وعلى اهل بيتى لم تقبل منه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায পড়ল আর আমি ও আমার আহলে বাইতের উপর দরূদ শরীফ পড়ল না। ফলে তার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।

(টীকাঃ সাওয়ায়েকে মুহরেকা-২৩৩ পৃষ্ঠা, আলে-রসূল-১১০ পৃষ্ঠা)

এতে বুঝা যায়, নামাযে আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর স্মরণে দরূদ শরীফ পাঠ না করলে তা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না বিধায় নামাযের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ আবশ্যক করা হয়েছে।

ছত্রিশতম হাদিসঃ

দোয়া কবুল হবার জন্য হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর স্মরণে দরুদ পাঠ শর্ত

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত,

كل دعاء محجوب حتى يصلّى على محمد وال محمد.

অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়া মওকুফ (ঝুলন্ত অবস্থায়) থাকবে যতক্ষণ না হুজুর (দঃ) এবং তাঁর আলে বাইতের উপর দরুদ না পড়ে।

(টীকাঃ ফয়জুল কদীর ৫ম খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা, আলে রসূল-১১০ পৃষ্ঠা)

এতে প্রতীয়মান হলো যে, হুজুর (দঃ) এবং আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ না করলে আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল না হয়ে আসমানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

সাঁইত্রিশতম হাদিসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতকে মুহব্বতকারীদের হাউজে কাউসারে অবস্থান

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

يرد الحوض اهل بيتى ومن احبّهم من امّتى كهاتين السبابتين.

অর্থাৎ আমার আহলে বাইত এবং আমার উম্মতের মধ্য থেকে যারা তাঁদেরকে মুহব্বত করবে উভয়ে হাউজে কাউসারে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় হাজির হবে (একথা বলে হুজুর (দঃ) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করেন)।

(টীকাঃ আশশরাফুল মুয়াইয়দ-৭৫ পৃষ্ঠা, আলে-রসূল-১১৩ পৃষ্ঠা)

এটা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মুহব্বতকারীরা হাউজে কাউসারে এক সাথে অবস্থান করবেন।

আটত্রিশতম হাদিসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সন্তুষ্টিই হুজুর (দঃ) এর শাফায়াত

ইমাম দাইলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উসিলা চাই এবং তার আশা হল যে আমার দরবারে তার কিছু খেদমত হয়, যার বদৌলতে কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। তখন তার উচিত-

فليصل اهل بيتى ويدخل السرور عليهم

অর্থাৎ সে যেন আহলে বাইতের সাথে সুসম্পর্ক রাখে এবং তাঁদের খেদমত করে, সাধ্যমত তাঁদেরকে খুশী করবে।

(টীকাঃ আশশরাফুল মুয়াইয়দ-৮৫ পৃষ্ঠা, আলে-রসূল-১১৩ পৃষ্ঠা)

উনচল্লিশতম হাদিসঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথা আহলে বাইতের সাথে দুশমনী করাই ইহুদীদের স্বভাবঃ

ইমাম তবরানী জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন হুজুর (দঃ) আমাদেরকে খুতবার মধ্যে এরশাদ করেন,

ايها الناس ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا

অর্থাৎ হে মানবজাতি! যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের সাথে দুশমনি রাখবে কেয়ামতের দিন ইহুদীদের সাথে তার হাশর হবে তথা ইহুদীদের সাথে সে উঠবে।

(টীকাঃ আশশরাফুল মুয়াইয়দ-৮৫ পৃষ্ঠা, আলে-রসূল-১১৩ পৃষ্ঠা)

স্মর্তব্য যে, যারা আহলে বাইত তথা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরের সাথে শত্রু মনোভাব পোষণ করবে তাদের সম্পর্ক ইহুদীদের সাথে। তাই বলা যায়, আহলে বাইতের শানে কটুক্তি করা, দুশমনি করা ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব। যে সব মুসলমান নামধারী মুনাফিকরা সেইসব ইহুদী আক্বিদার লালন-পালন করবে তাদের স্থান ইহুদীদের সাথে জাহান্নামে। জাহান্নামই দুশমনে রসূলের ঠিকানা।

চল্লিশমত হাদিসঃ

আহলে বাইতের শান-মানের অবজ্ঞাকারীরা জারজ সন্তান

ইমাম ইবনে আদী, ইমাম বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমানের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন,

من لم يعرف عترتى والانصار فهو لاحد ثلاث امّا منافق وامّا لزنية وامّا لغير طهر يعنى حملته امّه على غير طهور.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত তথা আওলাদে ফাতেমা (রাঃ) কে এবং আনসারকে শ্রদ্ধা ও মুহব্বত করবে না। সে (নিম্নলিখিত) তিন অবস্থা থেকে যে কোন এক অবস্থানে থাকবে। প্রথমতঃ হয়তঃ সে মুনাফেক হবে, দ্বিতীয়তঃ তা না হলে জেনার সন্তান হবে, তৃতীয়তঃ তাও না হলে তাকে যখন তার মা গর্ভধারন করে তখন তার মা পবিত্র ছিল না তথা হায়েয অবস্থায় ছিল।

(টীকাঃ আশশরাফুল মুয়াইয়দ-৯২ পৃষ্ঠা, আলে-রসূল-১১৫ পৃষ্ঠা)

মাসয়ালাঃ

উল্লেখিত হাদিস শরীফ থেকে এই মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত যারা আউলাদে রাসূল (দঃ) ও অলি বুজুর্গদের সাথে বেয়াদবী করবে তারা বর্ণিত তিন অবস্থার বাইরে যাবে না। আর বর্তমানেও তা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। তা নাহলে, গাউসুল আযম (রাঃ) ও খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) তথা সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের নামে বিশেষতঃ শোহাদায়ে কারবালা আহলে বাইতের শানে কটুক্তি করতনা। আর এদের শান-বয়ানের মধ্যে কথায় কথায় শিরক, বিদয়াতের ফতোয়া লাগাত না। সম্প্রতি বাংলার ভন্ড মুফাস্‌সের কথায় কথায় গাউসুল আযম (রাঃ) ও খাজা গরীবে নাওয়াজ (রাঃ) এর নামে কুৎসা রটায়। উপরোক্ত হাদিসই তার জন্য নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং হাদিসের আলোকেও বাংলার সমাজে তার কি অবস্থান (?) তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

শানে আহলে বাইত ও চল্লিশ হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বতুল বিন্‌তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলাইহা ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইতে রসূলের শান-মান ও কটুক্তিকারীদের পরিণাম সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদিস শরীফ আলাচনা করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এগুলোর পাঠক-পাঠিকাসহ হেফাযতকারীর জন্য রয়েছে অনন্য পুরষ্কার। সচেতন পাঠকমাত্রই এগুলো পড়ার মাধ্যমে তা অনুধাবন করতে পারবে। আল্লাহ আমাদেরকে আহলে বাইতের শান-মান বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে প্রচার ও প্রসার করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

দ্বাদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কারামত

ফাতেমা বতুল (রাঃ) এর জন্য আসমানী খাদ্য অবতরণঃ

একদিন হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর অভাবের কথা ব্যক্ত করে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি এবং আমার ছেলেরা আর আমার স্বামী হযরত আলী (রাঃ) আজ তিন দিনের উপবাস। এ পর্যন্ত আমরা কিছু খায়নি। তখন হুজুর (দঃ) হাত তুলে দোয়া করেন,

اللهم انزل على محمد كما انزلت على مريم بنت عمران

অর্থাৎ হে আলাহ! তুমি তোমার নবীর উপর খাদ্য অবতরণ কর, যেভাবে বেহেস্ত থেকে মরিয়ম বিন্‌তে ইমরানের জন্য প্রেরন করেছেন।

এরপর হুজুর (দঃ) বললেন, হে আমার আদরের জননী! আল্লাহ জাল্লাশানুহু কিছু প্রেরণ করেছেন কিনা দেখুন। ফলে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ঘরের ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করলেন, সাথে সাথে ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)ও প্রবেশ করলেন। শেষে হুজুর (দঃ)ও তশরীফ নিলেন। দেখলেন, স্বর্ণের বড় রেকাবী-(থাল) উপস্থিত রয়েছে। সেখানে সরীদ (এক প্রকারের সুস্বাদু খাদ্য), ভুনা গোশ্‌ত এবং নানা রকমের ফলাহারের সমাহার। সেখান থেকে মৃদু মৃদু খোশবু ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তোমরা খানা শুরু কর। বর্ণিত আছে যে, সেখান থেকে তারা সাত দিন পর্যন্ত আহার গ্রহন করলেন। এতে কোন কমতি আসেনি। একদিন হযরত হাসান (রাঃ) ঐ বেহেস্তী খাদ্যের একটি টুকরা নিয়ে বাইরে আসলে একজন ইহুদী মেয়ের নজরে পড়লে সে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ঘরে এ খাদ্য কোথা থেকে আসল? তখন হযরত হাসান (রাঃ) ঐ মহিলাকে সেখান থেকে কিছু দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, এ অবস্থায় গায়েবী এক হাত এসে ঐ খাদ্য নিয়ে নিলেন। সাথে সাথে ঘরের মধ্যে যে খাদ্য ছিল তাও উধাও হয়ে গেল। তখন হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, এ-রাজ তথা বেহেস্তী নেয়ামত যদি বাইরে নিয়ে না আসা হত, তাহলে এ খাদ্য সারাজীবন খেলেও কমতি না হতো।

(টীকাঃ মুয়ায়েজুল নবুয়ত ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫৬, মোল্লা মুঈন কাশেফী, যখায়েরুল উক্‌বা-৪৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্যে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ফয়সালা ঃ

ইমাম নসফী (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইমাম হাসান (রাঃ) এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ) উভয়ে দুইটি ফলকের মধ্যে লিখেন এবং উভয়ে দাবী করে যে, আপনার লেখা থেকে আমার লেখা উত্তম? এটা ফয়সালা করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) উভয়কে ফয়সালার জন্য হুজুর (দঃ) এর দরবারে প্রেরন করলেন যে, "আমি পারব না, তোমার নানাজান হুজুর (দঃ) এর কাছে যাও"। তখন হুজুর (দঃ) পুনরায় তাঁদেরকে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট পাঠালেন। হযরত আলী (রাঃ) উভয়কে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করলেন। খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ফয়সালা করবেন। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন যে, আমার কানের মধ্যে সাতটি দানা আছে। আমি উপর থেকে উভয়ের ফলকের মধ্যে এগুলো নিক্ষেপ করব। যাঁর ফলকের মধ্যে দানা বেশী পড়বে তাঁর লেখা বেশী সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। তখন হযরত ফাতেমা বতুল (রাঃ) তাঁর সাতটি মুক্তার বালি উপর থেকে নিচে ঢেলে দিলেন। উভয় ফলকে তিনটি করে পড়েছে। আরেকটি পড়ার সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে আল্লাহ্ দ্রুতবেগে প্রেরণ করে বললেন, ঐ দানাকে দু'টুকরো করে দুই ফলকের মধ্যে দুইটি দিয়ে দাও। তখন উভয়ের লেখার ব্যাপারে আসমানী ফয়সালা হয়ে গেল যে, উভয়ের লেখা ভাল।

(টীকা-থাকে কারবালা-৩৭ পৃষ্ঠা)

টিড্ডী পতঙ্গ কর্তৃক ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ) এর জন্য স্বর্ণের দুলী প্রেরণঃ

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব মজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রসূল (দঃ) এর ১৩ তম খণ্ডে ৪৩ পৃষ্ঠায় একটি দরূদ শরীফ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর জন্য টিড্ডী পতঙ্গ স্বর্ণের অনেক বালি বর্ষণ করেছেন।

হুজুর (দঃ) এর হুদায়বিয়ার মধ্যে আহবান মদিনা পাকে বসে হযরত ফাতেমা (রাঃ) শ্রবণঃ

খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) যখন হুদায়বিয়ায় তাশরীফ নিলেন, তথায় ৬ষ্ঠ হিজরীতে কোরাইশ কাফেরদের কর্তক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান নিচ্ছেন। এদিকে মদিনা শরীফে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মুহব্বতের সুরে নানাজানকে আহবান করলে হুজুর (দঃ) হুদায়বিয়ার জমিন থেকে সেই আহবানে সাড়া দিলেন। আর মদিনা শরীফ থেকে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর সেই আওয়াজ শুনতে পেলেন।

(সুবহানাল্লাহ) (টীকা-মজমুমায়ে সালাওয়াতির রসূল (দঃ) ১৩ খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা)

হুজুর (দঃ) এর উটনীর সাথে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কথাঃ

আল্লামা নসফী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (দঃ) এর ইন্তেকালের পর একদা সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) রাত্রি বেলায় বের হলেন। তখন খায়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত হুজুর (দঃ) এর 'আসবা' নামক উটনী হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিকট এসে বললেন-

السلام عليك يابنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنك حاجة الى ابيك فانّى ذاهبة اليه حتى ماتت فى تلك الساعة ثم كشفوا عنها بعد ثلاثة ايام فلم يجدوا لها واذا كان الليل نادى السباع بعضهم بعضا لا تقربوها فانها لمحمد صلّى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ হে আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর সাহেবজাদী! আপনার উপর আমার পক্ষ থেকে সালাম, আমি আপনার সম্মানিত আব্বাজান হুজুর (দঃ) এর দরবারে হাজির হতে যাচ্ছি। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমি হুজুর (দঃ) এর দরবারে পেশ করব। ঐ সময় ঐ উটনীর মৃত্যু হল। এরপর সাহাবায়ে কেরাম ঐ উটনী কে কম্বল মুড়িয়ে দাফন করলেন। তিনদিন পর ঐ উটনীর কবর খনন করার পর দেখলেন যে, সেখানে ঐ উটনীর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সেটা এমন উটনী ছিল রাত্রিবেলায় হিংস্র জন্তুরা একে অপরকে বস্তুতঃ তোমরা এই উটনীকে হত্যা করার চিন্তা করিও না। কেননা এটা হুজুর (দঃ) এর-ই মোবারকময় উস্ট্রী।

আরো উল্লেখ থাকে যে, ঐ উটনী একদিন হুজুর (দঃ) কে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমি এক ইহুদীর কবজার মধ্যে ছিলাম, অতঃপর আমি যখন ঘাস খেতে যেতাম ঘাস আমাকে আহবান করে বলত, হে উটনী! তুমি আমার দিকে আস, আমাকে ভক্ষণ কর, কেননা তুমি হুজুর (দঃ) এর উটনী হবে।

(টীকাঃ নাজাহাতুল মাজালেস-২য় খন্ড ২২৮ পৃষ্ঠা আলে রসূল-৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা)

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর দোয়ায় আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রাঃ)এর পূনঃজীবন লাভ ঃ

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর ফরিয়াদে গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা (রাঃ) পূনঃরায় প্রাণ ফেরত পেলেন এবং পুনঃজীবন যাপন করেন। বাংলাদেশে গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত

শেরে বাংলা (রাঃ) সর্বপথম সুন্নী আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, এতে ওহাবীরা এক প্রকার কোঠাসা হয়ে গেল। একদা হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকীয়া এলাকায় এক ওয়াজ মাহফিলে তিনি আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর শান বর্ণনা করছেন। এমতাবস্থায় পূর্ব থেকে ষড়যন্ত্রকারী ওহাবীর দলেরা এক ব্যক্তিকে ক্ষেপিয়ে দিল এবং হযরত শেরে বাংলা (রাঃ) কে আঘাত করে শহীদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। মাহফিলের মধ্যে মেন্টল লাইট ছিল। সর্বপ্রথম ঐ ওহাবী গাছের বড় রদ্দা নিয়ে এসে মেন্টল লাইট ভেঙ্গে দিয়ে গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত শেরে বাংলা আলকাদেরী (রাঃ) এর উপর উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগল। যখন ঐ ওহাবী নিশ্চিত হল যে, শেরে বাংলা (রাঃ) আর নেই। তখন সে ঐ স্থান ত্যাগ করল। চতুর্দিকে গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাতের উপর হামলা হবার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে রাসূল প্রেমিকদের মধ্যে দুঃখ ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং হযরত গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাতকে রক্তাক্ত অবস্থায় আন্দরকিল্লাস্থ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখলেন, গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত আর নেই, শাহাদাত বরণ করেছে। তাঁর শরীর মোবারক জম খানায় রেখে দেয়া হয়। পরের দিন সকালে তা দিয়ে দেবে। এদিকে লোকজন ভক্তরা তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে আসার জন্য জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হল এবং লাশ মোবারক নিয়ে আসার জন্য জম খানার দরজা খোলে দিলে আশ্চার্য্যের ব্যাপার (!) সবাই দেখল যে, গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হেলিয়ে দুলিয়ে দরূদ শরীফ পাঠেরত ছিলেন। ভক্তদের মধ্যে অতি নিকটের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর আমরা তো আপনার লাশ মোবারক নিতে এসেছিলাম, আপনি আবার এ অবস্থায়? তখন গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত বলেন, সত্যিই আমার শাহাদাত হয়েছে। আমি দেখলাম যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভান্ডারী সৈয়্যদ আহমদ উল্লাহ কেবলা কাবা (রাঃ) ও হুজুর (দঃ) এর সাহেবজাদী খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাঃ) আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর দরবারে আরজ করলেন, হুজুর (দঃ)! আজিজুল হক আমার সন্তান, আমার বংশদর এ অবস্থায় আজিজুল হক মৃত্যুবরণ করলে এই দেশে বাতিল ফেরকা ঈমানদারদেরকে গুমরাহ করে ফেলবে। তাই আজিজুল হকের প্রাণ পুনঃফেরত দিয়ে তাঁর হায়াত বৃদ্ধির জন্য আপনার দরবারে সুপারিশ করছি।

আল্লাহর হাবীব (দঃ) তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। অতঃপর আমার জান পুনঃরায় হুজুর (দঃ) এর সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ফিরিয়ে দিয়ে এ আমার উপর বিশেষ মেহেরবানী করেছেন। আর এ অবস্থায় তোমরা আমাকে দেখছ।

সূত্রঃ হুজুর শেরে বাংলা (রাঃ) এর বড় সাহেবজাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমিনুল হক আলকাদেরী, হাটহাজারী দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

* আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ ক্বারী আব্দুর রহমান আলকাদেরী, খলিফা, হাটহাজারী দরবার শরীফ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গাউসিয়া হক্ব গ্রুপ বাংলাদেশ।

* মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আল কাদেরী, জামাতা, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রাঃ)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরদের পরিচয়ঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ৬জন সন্তানদের মধ্যে ৩ জন ছেলে ৩ জন মেয়ে।

শাহজাদাদের মধ্যে প্রথমঃ ইমাম হাসান (রাঃ)। তিনি ৩য় হিজরীর ১৫ রমজান জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯ হিজরীর ৫ রবিউল আউয়াল শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বকী শরীফে দাফন করা হয়।

দ্বিতীয়ঃ ইমাম হোসাইন (রাঃ)। তিনি ৪র্থ হিজরী ৫ শাবান জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১ হিজরী ১০ মুহররম শাহাদাত বরণ করেন। ইরাকের কারবালায় তাঁর মাজার শরীফ এবং মিশরে ছের মোবারকের মাজার শরীফ অবস্থিত।

তৃতীয়ঃ হযরত মোহছেন (রাঃ) শিশু অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

শাহজাদীদের মধ্যে প্রথমঃ হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)। তাঁর শাদী হয় হযরত ওমর (রাঃ) এর ছেলে হযরত যায়েদ ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে।

দ্বিতীয়ঃ হযরত জয়নব (রাঃ)। তাঁর শাদী মোবারক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) এর সাথে হয়।

তৃতীয়ঃ হযরত রোকেয়া (রাঃ) শিশু অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

স্মর্তব্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আওলাদ হযরত হাসনাইনে করীমাইনের মাধ্যমে জারি থাকবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বিশেষ আমল

প্রথমতঃ তাসবীহে ফাতেমী (রাঃ), যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হুজুর (দঃ) কর্তৃক ফাতেমা (রাঃ) কে বিশেষ আমলের শিক্ষাঃ

হুজুর (দঃ) খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে বলেন, কোন মুমেন নারী পুরুষ বিত্‌রের পরে দুইটি সিজদা দিয়ে সিজদায় গিয়ে ৫ বার পড়বে-

سبوح قدوس رب الملئكة والروح

উচ্চারণঃ সুববুহুন কুদ্দুসুন্ রাব্বুল মালায়েকাতু ওয়ার রূহ।

অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগেই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবে। আর ঐ রাত্রে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শাহাদতের মর্যাদা পাবে।

ফতোয়াতে তাতরহানীয়াতে সালাতুল বিতরের মধ্যে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, যে ব্যক্তি ঐ আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ১০০ টি হজ্ব এবং ওমরা পালনের সওয়াব দান করবে এবং আল্লাহ্ তায়ালাও তার জন্য ১০০টি ফেরেশতা প্রেরণ করবে, যারা তার পূর্ণগুলি লিপিবদ্ধ করবে।

আর দুই সিজদা আদায় করার বিনিময়ে ১০০টি বাঁদী মুক্তি করার সওয়াব তাকে দিবে এবং সে যে দোয়া করবে আল্লাহ তা কুবল করবেন এবং উভয় সিজদার মাঝখানে একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে।

(টীকা- নাজাহাতুল মাজলেস ২য় খন্ড ২২৯ পৃঃ)

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কর্তৃক একটি বিশেষ নামাযের শিক্ষাঃ

হযরত শেখ আবুল কাশেম ছগগার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি পছন্দ করেন এবং আপনার কহ মোবারকে কি বখশিষ করলে আপনি খুশী হবেন? উত্তরে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) বলেন, শাবান মাসের যে কোন একদিন এক সালামে ৮ রাকাত নামায চার বৈঠকে আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর ১১ বার সূরা এখলাছ পড়বে এবং ঐগুলির সওয়াব আমার উপর বখশিষ করে দিবে। হে আবুল কাশেম! যে ব্যক্তি আমার এই নামায ঐ শাবান মাসের যে কোন এক রাত্রিতে আদায় করবে। আর যদি প্রথম রাত্রিতে পড়ে তাহলে অনেক ভাল। তা না হলে যে কোন এক রাত্রিতে পড়বে। সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা ব্যতীত আমি বেহেস্তে প্রবেশ করব না।

টীকা- ফযায়েলে শুকর ওয়াস সিয়াম ২৪ পৃষ্ঠা কৃতঃ মাওলানা রমজান আলী হানফী ভারত)

হাজত পূরণে হযরত ফাতেমা (রাঃ) র নামায ঃ

যখন কোন হাজত উপস্থিত হয় তখন নিম্ন লিখিত নিয়মে দুই রাকাত নামায আদায় করবে।

নিয়্যতঃ নাওয়াইতু আন উসাববিহা তাসবীহা ফাতেমাতা আয্ যাহ্‌রা বিন্‌তে খাদিজাতাল কোবরা লেনুদ্ববাতিন ওয়া কুরবাতিন ইলাল্লাহে তায়ালা মুতাওয্ যেহান ইলা জেহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর তিন তিন বার সূরা এখলাস পাঠ করবে। সালাম ফিরানোর পর তিন বার আল্লাহু আকবর বলবে এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়বে এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পড়বে। এরপর সিজদায় গিয়ে ১০০ বার পড়বে **ইয়া মাওলায়া ওয়া মাওলা ফাতেমা আগিস্‌নী**।

এরপর মাথার ডানপাশ মসাল্লা জানায়নামাযের উপর রেখে উপরোল্লেখিত দোয়া পড়বে ১০০ বার। এভাবে মাথার বাম পাশ ও জায়নামাযের উপর রেখে উপরোল্লেখিত দোয়া ১০০ বার পড়বে।

এরপর হাত উঠায়ে আল্লাহ্ দরবারে হাজতের জন্য দেরায়া করবে। **ইনশাল্লাহ্** হযরত খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার উসিলায় দোয়া কবুল হবে।

(নাফেউল খালায়েক, ২৭ পৃঃ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাঃ) কর্তৃক পঠিত দরূদ শরীফ

প্রথম দরূদ শরীফঃ

اللهم صلى على من روحه محراب الارواح والملئكة والقوم

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মান রূহাহু মেহবাবুল আরওয়াতে ওয়াল মালায়েকাতে ওয়াল ক্বাওম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! দরূদ সালাম প্রেরণ করুন ঐ রূহ মুবারকের উপর, যেই রূহ হচ্ছে রূহ সমূহ, ফেরেশতাগণ এবং জাতির সরদার (মালিক)।

দ্বিতীয় দরূদ শরীফঃ

اللهم صلى على من هوا ما م الانبياء و المر سلين

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মান হুয়া ঈমামুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! নবীগণ ও রাসূলগণের ইমামদের উপর দরূদ প্রেরণ করুন।

তৃতীয় দরূদ শরীফঃ

اللهم صلى على من هو اما م اهل الجنة عباد الله المؤ منين

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মান হুয়া ইমামু আহলিল জান্নাতি ইবাদিল্লাহিল মুমেনীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! সালাত অবতরণ করুন! ঐ সত্ত্বার উপর, যিনি জান্নাতবাসীদের ইমাম ও আল্লাহর বান্দা এবং পরিপূর্ণ মোমেন।

(রহমতকা দরয়া)

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাত মোবারক

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এবং ওফাত মোবারকের সুসংবাদঃ

১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরীতে ওফাতের সময় হুজুর সরকারে দোআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন অধিক রোগাক্রান্ত ছিলেন, তখন ফাতেমা

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে তশরীফ নিয়ে আসলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন স্বাগতম আমার কন্যা। অতঃপর তাকে অতি নিকটে বসিয়ে ধীরে ধীরে কিছু কথা বলেন, একথা শুনে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে লাগলেন, তখন আরো কিছু কথা তাকে কানে কানে বললেন, এতে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মুচকী হাসি দিলেন, হযরত আয়েশা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) বলেন, হে সৈয়্যদা আপনি প্রথমে কান্নাকাটি করেছেন, পরে মুছকী হাসি দিলেন এটার কারণটা কি? তখন ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি রহস্য ফাঁস করতে আমার পছন্দনীয় নয়। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ওফাতের পর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) দোহাই দিয়ে বলেন, আম্মাজান ঐ রহস্য আমাকে একটু বলবেন কি? যা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতের পূর্বে আপনাকে বলেছিলেন। তখন সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, এখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাত হয়েছে। ঐ রহস্যকে প্রকাশ করতে আর কোন অসুবিধা নেই। সেই কথা এই যে, বলছি শুনুন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে প্রথমে বলেছিলেন হে আমার সাহেজাদী ফাতেমা। আমার ওফাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি তোমাদের থেকে বিদায় হয়ে যাব। এই কথা শুনে আমর কান্না এসেছে ফলে আমি কাদাতে ছিলাম, আমার কান্না দেখে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরেকটি কথা বলেন, তখন আমার হাসি এসেছে। সেটা হচ্ছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এরশাদ করেন-

الاترضين ان تكونى سيدة نساء اهل الجنة اونساء العالمين وفى رواية انى اول بيته اتبعه فضحكت . (مشكراة – المستدرك)

(খাকে কারবালা ৩৭৬ পৃঃ)

অর্থাৎ ওগো ফাতেমা! তুমি কি একথার উপর রাজি হবে না যে, তুমি বেহেস্তী মহিলা কিংবা জগতের রমনীদের সরদারনী হবে। অপর বর্ণনায় এটাও বলেছেন যে, আমি তাঁর আহলে বাইতের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম ঐ কবরের জগতে মিলিত হব। এতে আমি আনন্দিত হয়ে মুসকি হাসি দিলাম।

(মেশকাত শরীফ, মুস্তদারাক, বুখারী শরীফ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) শোকাহতঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের সমগ্র সাহাবায়ে কেরাম এবং সমস্ত মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশেষ করে ফাতেমা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর নিকট এমন দুঃখ নেমে আসল যে, তিনি অধিকাংশ সময় অত্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। এমনকি তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলতেন, আপনারা কিভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মাটির মধ্যে দিয়ে আসলেন। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম ও অত্যাধিক কান্নাকাটি করতেন। এরপর ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রওজা পাকে তশরীফ নিয়ে আসতেন এবং কবর শরীফ থেকে কিছু মাটি নিয়ে স্বীয় চক্ষু মোবারকের উপর রাখতেন, এবং এই কবিতা পাঠ করে তিনি অত্যাধিক কান্নাকাটি করতেন-

ماذا على من شم تربة احمدا

كن لا يشم مد الزمان غواليا

صبت على مصائب لوانها

صبت على الايام صرف لياليا

অনুবাদঃ যে ব্যক্তির নিকট হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাজার আক্বদসের খুশবু মাটি মোবারক হাসিল করার সৌভাগ্য হবে, তাঁর সমগ্র জীবনে আর কোন খুশবু পছন্দ হবে না।

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত শরীফের কারণে আমার উপর এমন মছিবতে পতিত হয়েছে, যাতে আমার সমগ্র জীবন অন্ধকার হয়ে গেছে। যদি ঐ মছিবত উজ্জ্বল দিবসে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে রাত হয়ে যাবে।

(টীকা- যুরকানীশরহে মাওয়াহেবে লুদনিয়া, মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ৪৪৩ পৃঃ সফিনায়ে নূহ ১৮৭ পৃঃ)

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে কবরের জগতে সাক্ষাতের আরাধনাঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আরেক বার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জিয়াতের সময় নিচের কবিতা গুলি পাঠ করে জিয়ারত করেন,

(١) اذا اشتد شوقى زرت قبرك باكيا

اوح والنشكو ماراك مجابيا

(٢) باساكن البطا اعلمنى البكا

وذكرك انسانى جمع الصائبا

(٣) فان كنت عنى فى الثوب مغيبا

فما كنت قلبى الحزين بغابا

(٤) نفسى على زفرز راقها محبوسة

ياليتها خرجت مع الزفرات

(٥) لا خير بعدك فى الحيوات وانها

اتكى فخافة ان تطول هياتى

(টীকা- মাদারেজুন নবুয়ত ২য় খন্ড ৫২ পৃষ্ঠা, সফিনায়ে নূহ ১৮৮ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ খাতুনে জান্নাত যখন আপনার সাথে আমার সাক্ষাত করার জন্য প্রেরণা হতো তখন আমি কান্নাকাটি করে আপনার কবর শরীফ যেয়ারত করার জন্য আমি, এবং আমি এ অভিযোগ করি, যখন দেখি আপনার পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসতেছে না।

(২) কবর শরীফের মধ্যে আরাম কারী আমার পিতা রাহমাতুল্লীল আলামীন আমার কান্নাকাটি দেখুন আর আপনার কথা স্মরণ করাটা আমাকে সকল মুছিবত ভুলিয়ে দিয়েছে।

(৩) যদিও আপনি এই পবিত্র মাটি মোবারক আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি দুঃখী দিলে অনুপস্থিত নয়।

(৪) আমার অন্তর দুঃখ পেরেশানী এবং অশ্রুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। হায়!

ঐ দুঃখ গুলি যদি অশ্রুর সাথে বের হয়ে যেত।

(৫) আপনার পরে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন পূণ্য নেই। আমার হায়াত দীর্ঘ হবে এজন্য আমি কান্নাকাটি করছি না।

সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর শান্তনায় হযরত হিন্দা বিনতে আসমা এর শোকগাথাঃ

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এই কান্নাকাটি ও দুঃখে প্রভাবিত হয়ে হযরত হিন্দা বিনতে আসামা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে একটি শোকগাথা লিখেন। সেখানে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে কিছু বলেন-

(١) اشاب ذوابتى واذل ركنى

بكاؤك فاطم الميت الفقيرا

(٢) افاطم فاجبرى فلقد اصابت

رزيتك السهائم والنجودا

(১) হে ফাতেমা! হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই ওফাতের দুঃখে আপনার গগন বিদায়ী অশ্রুপাতই আমার মাথার চুল শ্বেত করে দিয়েছে এবং আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

(২) হে ফাতেমা! আপনার পিতা রাহমাতুল্লীল আলামীনের ওফাতে আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। নিশ্চয় আপনার পিতৃহারা এই মছিবত তেহামা ও নজ দবাসীদের মর্মাহত করে দিয়েছে। আর এই দুঃখের মধ্যে শরীক হয়েছে স্থল ও জলবাসের অধিবাসীরা। আর রাহমাতুল্লীল আলামীনের বিদায়ের মছিবত প্রত্যেককে মর্মাহত করেছে।

(টীকা- সফিনায়ে নুহ ১৮৯ পৃঃ, সূত্র তবকাতে ইবনে সাদ)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিদায়ের পর সৈয়্যদা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বিচ্ছেদ সময়কালঃ

হযরত আবু জাফর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বলেন,

مارايت فاطمة ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يوما

فترت بطرف نابها ومكثت بعده ستة اشهور -

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পর আমি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে হাসি অবস্থায় দেখিনি কিন্তু যে দিন তাঁর অসুখ বেড়ে গিয়েছিল সে দিন শুধু হেসেছে। এরপর তিনি ছয়মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া-আবু নঈম ইসপাহানি, ২য় খন্ড-৪৩ পৃঃ, সফিনায়ে নূহ ১৮৯ পৃঃ)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পরে হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কত দিন জীবিত ছিলেন, এ ব্যাপারে বিভিন্নমত রয়েছে।

প্রথমতঃ আলোচ্য বর্ণনায় ছয় মাসের কথা এসেছে এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এক বর্ণনায় ও ছয় মাসের কথা উল্লেখ আছে। (হিলিয়াতুল আউলিয়া)

দ্বিতীয়তঃ অপর এক বর্ণনার মধ্যে তিন মাসের কথা এসেছে,

তৃতীয়তঃ কারো মতে ৮ মাস

চতুর্থতঃ কারো মতে ৭০ দিন

পঞ্চমতঃ কারো মতে ১ মাস,

প্রসিদ্ধমতঃ ছয় মাসের কথা অতি বিশুদ্ধ এ প্রসিদ্ধ।

(টীকা আলামনু নেসা-ওমর রেযা কাহ্‌হাল্লা ১৩০ পৃষ্ঠা)

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রোগাক্রান্তবস্থায় সিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সাক্ষাত প্রদান ঃ

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জিয়ারতে হাজির হলেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খাতুনে জান্নাতের নিকট আরয করছেন, খলিফাতুল রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছেন, আপনি যদি চান তাকে অনুমতি দিতে পারেন। খাতুনে জান্নাত বললেন এটাকি আপনার পছন্দনীয় প্রদুত্তরে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন হ্যাঁ, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় অপরাগতা পেশ করলেন, খেলাফতের দায়িত্ব পালন কালে খাতুনে জান্নাতের এর সাথে মিরাজের ঘটনার ব্যাপারে যে দ্বিমত হয়েছিল সে ব্যাপারে ক্ষমা চাই সে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রাজি হয়েছিলেন।

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ওফাতের অন্তিম সময়ের হৃদয়বিধারক ঘটনাঃ

একদিন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এসে দেখলেন যে, খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নিজ হাতে রুটি তৈয়ার করেছেন এবং নিজে বাচ্চাদের কাপড় পরিস্কার করে দিচ্ছেন। এটা দেখে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আশ্চর্য্যান্তিত হয়ে বললেন, হে উভয় জগতের মুখদুমা! হে আখেরী জমানার মাসুমা! হে খাতুনে জান্নাত! আমি আপনাকে এক সাথে দুনিয়ায় দুটি কাজ করতে দেখিনি, যখন আপনি এই তিন কাজের মধ্যে মশগুল, এতে কি রহস্য রয়েছে? একথা শুনে খাতুনে জান্নাতের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অশ্রু এসে গেল। তখন তিনি বলেন, হে বেহেস্তের নওজোয়ানদের সরদার! খাজা আবু তালেবের বাগানের কলি, শেরে খোদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এসময় হলো আমি এবং আপনার মধ্যে বিদায়ীর সময়। আজকে রাত্রে আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক উচু স্থানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে অবলোকন করছেন যে, তিনি কারো জন্য অপেক্ষামান। তখন আমি গিয়া বললাম, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি এখন কোথায়, আপনার বিচ্ছেদে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার জন্য? উত্তরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আমার আদরের কন্যা ফাতেমা তোমার জন্য। ওগো আমার নয়নের মনি, আগামী কাল তুমি দুনিয়ার মছিবতের বন্দীখানা থেকে বের হয়ে বেহেস্তের বাগানের মধ্যে চলে আসবে। ওগো আমার কলিজার টুকরা! অতি অল্প সময়ের মধ্যে (আগামী রাত) তুমি আমার সাথে কবরের জগতে সাক্ষাত করবে। অতঃপর খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আজকের দিনটা আমার শেষ রাত্রি। আগামী কাল রাত্রের প্রথম প্রহরে আমি বিদায় হয়ে যাব। এই যে দুই রুটি নিন। যা আমি তৈরী করলাম। আগামী কাল আমার ওফাতের মুছিবতের মধ্যে আপনি মাশগুল হয়ে যাবেন। আমার বাচ্চারা যাতে ক্ষুধার্ত না থাকে এজন্য তৈরী করে দিলাম এবং বাচ্চার কাপড় পরিস্কার করে দিলাম এজন্য যে, আমার পরে আমার

বাচ্চাদের কাপড় কে পরিস্কার করে দিবে? আমার এতিমদের আশাকে পূরন করবে? আমার ছেলেদের চুলকে আঁচড়িয়ে দেবে? আমি মা আমার পরে তাদের এ মুখের দুলিকে ধুয়ে দেবে, হযরত মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা শুনে অশ্রু সিক্ত নয়নে বললেন, হে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! আপনার সম্মানিত মুহতরম পিতাজান হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিদায়ের ক্ষত অন্তর পেকে এখনো শুকায় নি। এদিকে এখন আপনার বিদায়ের সময় মাথর উপরে এসে গেছে। এক আঘাতের উপর আরেক আঘাত। হ্যায়! আমি কি করব। কোথায় যাব? নবুয়তের আহলে বাইতের বাগান উজাড় হয়ে যাচ্ছে। হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এরশাদ করেন, হে মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)! এ মুছিবতের উপর আপনি ধৈর্য্যধারণ করবেন এবং আমি প্রাণ যাবার পথে আপনার দিকে চেয়ে থাকব। বেহেস্তের মধ্যে ইনশাআল্লাহ! আপনার সাথে দেখা হবে। এই কথা বলতে বলতে শাহাজাদের কাপড় পানিতে ডুবিয়ে পরিস্কার করছেন এবং তাদের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, আহা, ওহ! এবং অশ্রুসিক্ত বদনে বলেন। আমার যাবার পর তোমাদের অবস্থা কি হবে(?) আমি যদি জানতে পারতাম!

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক ওফাতের প্রস্তুতিঃ

হযরত আসমা বিনতে উমাইজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে খাতুনে জান্নাত এরশাদ করেন, আমার ছেলেদের খাদ্য এখানে রেখেছি, তাদেরকে খাবার ব্যবস্থা করে দাও। যতক্ষণ তারা খাবে না ততক্ষণ আমার কাছে আসতে দিবেন না। হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) খাতুনে জান্নাতের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নির্দেশ মোতাবেক শাহজাদাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন শাহজাদারা বললেন, হে আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! আমরা কখনো আমাদেরকে আম্মাজানকে ব্যতীত আহার গ্রহণ করিনি। আজ কি হয়েছে যে, আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে? উত্তরে আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার আম্মাজানের অবস্থা আজ একটু ভাল নয়, তাই আপনারা আপনাদের খাবার গ্রহণ করুন।

শাহজাদারা বলেন, আমরা আমাদের আম্মাজান ছাড়া খাবার গ্রহণ করব না। এ কথা বলে দুই শাহাজাদা হুজুরা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলেন, দেখলেন যে, খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বালিশ মোবারকে তাঁর মাথা রেখেছেন।

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার পার্শ্বে বসে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর শাহাজাদাদেরকে দেখলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন, কিছুক্ষণের জন্য আমার শাহাজাদাদেরকে তাদের নানাজান আমার আব্বাজান হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজাপাকে নিয়ে যান। এবং তাদেরকে আমার আব্বাজান হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারত করিয়ে নিয়ে আসেন।

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর অন্তিম সময়ের গোসল মোবারকঃ

এদিকে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং দুই শাহাজাদাকে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজাপাকে হাজিরা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। এ অবস্থায় হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে সংবাদ দেয়া হলো, তিনি উপস্থিত হলে তাকে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) বলেন, আম্মাজান আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করুন। আমি গোসল সেরে নিব। হযরত উম্মুল মুমেনিন উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পানির ব্যবস্থা করেন এতে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গোসল সেরে নিলেন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় যা হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন তা পরিধান করে নিলেন।

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর অন্তিম শয্যাঃ

এরপর হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, আম্মাজান আমার হুজরা শরীফের মধ্যে বিছানা করে দেন। তিনি কেবলামুখী হয়ে শুয়ে গেলেন। ডান হাত সওয়াল মোবারকের নিচে দিয়ে রাখলেন। এরপরে হযরত আসমা বিনতে উমাইসকে ডেকে বললেন, হে আমার আম্মাজান! হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রোগের সময় হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে ব্যবহার করার জন্য বেহেস্তের কাপুর নিয়ে এসেছিলেন, উহাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন ভাগ করে একভাগ তাঁর জন্য রাখলেন, আর দুই ভাগ আমাকে দিয়ে বললেন, হে ফাতিমা! একভাগ তোমার জন্য আর একভাগ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য। সেই গুলো অমুখ স্থানে আছে। সেখান থেকে আমারটা নিয়ে আসেন, আর বাকীটা নিরাপদ স্থানে রেখে দেন।

সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অন্তিম শয্যায় নামায ও দোয়াঃ

এরপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আসমা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) কে বললেন আপনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যান এবং আমাকে এ হুজরা শরীফে কিছুক্ষণের জন্য একা রেখে যান। আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর এবাদত করব।

বাহির থেকে হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন যে, তিনি মুনাজাতে রয়েছেন। হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি কান লাগিয়ে শুনলাম তিনি দোয়ার সাথে একথা বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমার সম্মানিত পিতা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উসিলায় এবং তিনি যে সদ্য মোলাকাতের জন্য অপেক্ষা করতেছেন তাঁর উসিলা এবং আমার বিরাগে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মত অন্তরের উসিলায়, আমার বিদায়ীতে দুই শাহাজাদার জ্বলন্ত অন্তরের উসিলায়, আমার ছোট ছোট মেয়েদের দুঃখের উসিলা নিয়ে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করি, আমার আব্বাজানের গুনাহগার উম্মতের উপর তুমি দয়া কর এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দাও।
(টীকা- রওজাতুশ শোহাদা, মোল্লা মঈন কাশেফী ১৪২ পৃঃ)

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক ওফাতের পূর্বে পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য অসিয়তঃ

রোগাক্রান্ত অবস্থায় হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পর্দার ব্যাপারে কিছু অছিয়ত করেন। আমার ওফাতের পর আমার জানাজা যাতে কেউ দেখতে না পায়। হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আরজ করলেন, হে আমার শাহাজাদী, আমি দেখছি হাবশীরা চার পায়ের উপর গাছের ডালি বেঁধে দিত এবং এর উপর একটা কাঁপড় ঢেকে দিত। ফলে এক একটা কাপড়ের ঘর হয়ে যেত এবং সম্পূর্ণ পর্দা হয়ে যায়। এতে হযরত আসমা (রাঃ) খেজুর গাছের কয়েকটি ডাল নিয়ে এটার আকৃতি দেখিয়ে দিলেন। হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এটাকে পালকির ন্যায় দেখে বলেন, এটাতে এক সুন্দর ব্যবস্থা! এটা পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আমার ওফাত হলে এভাবে একটি ডুলি তৈরী করবেন এবং রাত্রি বেলা আমাকে দাফন করবেন। কাউকে আমার জানাজা সম্পর্কে খবর দিবে না।
(টীকাঃ সূত্রঃ সুনানে কোবরা ৪র্থ খন্ড, যখায়েরুল উক্বা ৪৩ পৃঃ, হিলিয়াতুল আউলিয়া ২য় খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা, আলে রাসূল (দঃ) ৩২৪ পৃঃ)

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও ওফাতের পূর্বে গোসল সংক্রান্ত প্রথম অসিয়তঃ

হযরত সৈয়্যদা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আসমাকে অসিয়ত করছে যে, আমাকে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আপনি মিলে গোসল দিবেন এবং আমার জানাজার ব্যাপারে কাউকে আহবান করবেন না। তাবকাতে ইবনে সাদ ও অন্যান্য কিতাবের মধ্যে বর্ণনা আছে যে, উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা দিয়েছেন. হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঘরে ছিলেন না। আমাকে বলেন, আম্মাজান! আমাকে গোসল করিয়ে দেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম, তিনি ভাল ভাবে গোসল করিলেন। আর আমাকে নতুন কাপড়ের জন্য বললেন, আমি তাঁকে নতুন কাপড় পড়িয়ে দিলাম এবং হুজরা শরীফের মধ্যে বিছানা তৈরী করার জন্য বললে আমি হুজরা শরীফে। চার পায়ের উপর বিছানা বিছিয়ে দিলাম এবং তিনি হুজরা শরীফের চার পায়ের উপরে শুয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, আম্মাজান আমি গোসল সেরে নিয়েছি, আমার ওফাতের পর যাতে কেউ গোসল না দেয়। এ কথার পর তাঁর বেসাল শরীফ হয়ে গেল। এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তশরীফ নিয়ে আসলেন ঘটনা শুনলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর গোসল হয়েছে আর গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই।

(তাবকাতে ইবনে সাদ ৮ম খন্ড ৪৬ পৃঃ, আলে রাসূল ৩২৪ পৃঃ)

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গোসল সংক্রান্ত দ্বিতীয় অসিয়তঃ

মসনদে আহমদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) উম্মুল মোমেনিন হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেন,

يامة انى مقبوضة الان وقد تطهرت فلايكشفنى احد

(মাসনাদে আহমদ ২য় খন্ড ৪৮৮ পৃঃ, সূত্রঃ আলে রাসূল ৩২৫ পৃঃ)

অর্থাৎ আম্মাজান আমি কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যাচ্ছি। আমি গোসল সেরে নিয়েছি। কেউ যেন গোসলের জন্য আমার শরীর না খুলে।

সৈয়্যদা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গোসল সংক্রান্ত তৃতীয় অসিয়তঃ

হিলয়াতুল আউলিয়ার মধ্যে আবু নুয়াইম ইস্পাহানী বর্ণনা করেন, খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসলের পানি নিয়ে আসার জন্য বলেন, এতে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গোসল সেরে নিলেন, এবং কাফনের কাপড় চাইলেন, আমি তা দিলে তিনি নিজেই তা পরিধান করে খোশবু লাগালেন এবং বলেন, তাঁর এন্তেকালের পর যেন কেউ তাঁর পরিধেয় কাপড় না খোলে। (আলে রাসূল ৩২৬ পৃঃ)

সপ্তদশ অধ্যায়

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কর্তৃক খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জান কবজঃ

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নিজেই গোসল সেরে কাপড় পরিধান করে যখন শুয়ে পড়লেন তখন মালাকুল মউত হযরত আজরাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁর দরবারে রূহ মোবারক কবজ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি পর্দার গুরুত্ব দিয়ে মালাকুল মউতকে উত্তর দিলেন, আপনাকে আমি আমার রূহ কবজ করার জন্য অনুমতি দেব না। তখন মালাকুল মউত আল্লাহর দরবারে গিয়ে একথা জানালে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লাশানুহু কুদরতী ব্যবস্থায় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর রূহ মোবারক কবজ করলেন। তাফসীরে রূহুল বয়ানের মধ্যে রয়েছে-

,, كما روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنه لما نزل عليها ملك الموت لم ترضى بقبضه فقبض الله روحها ''

অর্থাৎ বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট যখন মালাকুল মউত আসলেন তখন মালাকুল মউত কর্তৃক তাঁর রূহ কবজ করতে তিনি রাজি হন নি। আল্লাহ জাল্লাশানুহু কুদরতী ব্যবস্থায় তাঁর রূহ মোবারক কবজ করলেন।

(আলে রসূল-৩২৬ তাফসীরে রূহুল বয়ান ৮ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রূহ কবজ করা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান ঃ

এটা কি সম্ভব (?) যে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রূহ কবজ করা? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। কেননা আল্লাহ জাল্লাশানুহু কোরআন পাকে এরশাদ করেন-

الله يتوص ا لا نفس حين موتها -

অর্থাৎ আল্লাহ আত্মাসমূহ কবজ করেন, তাঁর মৃত্যুর সময়।

(হাকে কারবালা-৩০, তাফসীরে রূহুল বয়ান-৩খন্ড ৪০৩ পৃষ্ঠা)

আয়াত শরীফে ব্যাখ্যায় ইসমাইল হককী রূহুল বয়ানের মধ্যে ঐ ঘটনা বর্ণনা করেন, এরপর তিনি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বর্ণনা করেন, হযরত জুন্নুন মিছরী (রাঃ) আল্লাহর দরবারে এই ফরিয়াদ করেন,

الهى لا تكلنى الى ملك الموت لكن اقبض روحه انت ايضا

অর্থাৎ হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পর্দার ব্যাপারে এতই কঠোর ছিলেন যে, মালাকুল মউত জান কবজ করার অনুমতি চাইলেও তিনি অনুমতি দিলেন যে, আযরাইল (আঃ) মৃত্যুর দূত হলেও তিনিও তো অপরজন (মুহরেম) নয় ইন্তেকালের পর তাঁকে আর গোসল দেওয়া হয় নি।

(যখায়েরুল উক্বা-৫৪ পৃষ্ঠা)

উপদেশঃ হায় আমাদের বর্তমান সমাজের নারী সমাজ কতইনা বেপর্দার মধ্যে স্বীয় জিন্দেগীকে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে রেখেছেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের নারী সমাজের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কিভাবে পর্দার জন্য মৃত্যুকালেও সচেষ্ট ছিলেন, আমরা তো সর্বদা দোকানে, রাস্তায়, পার্কে , কলেজে মেয়েদের আড্ডা তো নিত্য নৈমিত্তিক কাজ বলে সাব্যস্থ হচ্ছে। এটা কতইনা অপরাধ!

প্রথমতঃ মহিলার জন্য পর্দার বেহুরমতিতে গুরুত্বর অপরাধ।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষদের দৃষ্টি শক্তি আকর্ষণের মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব যা সমাজে অশ্লীল বেহায়াপনার কাজে প্রবিষ্ট করে। তাও পাপের মধ্যে শামিল। যা নারীদের দ্বারা সংঘঠিত হচ্ছে।

এসব পাপ কাজ থেকে আল্লাহ আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতীকে রক্ষা করুন। আমীন

অষ্টদশ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের তারিখ মোবারকঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত মোবারকের ৬ মাস পর ৩রা রমজান ১১ হিজরী মঙ্গলবার রাত্রি বেলায় উম্মতে মুহাম্মদীর নারীদের সরদারনী হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ইহকাল ত্যাগ করে মাওলায়ে হাকিকীর সান্নিধ্য পাড়ি জামান।

(ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)

৩রা রমজান ওরস ও ফাতেহা শরীফঃ

প্রতি বছর ৩রা রমজানুল মোবারক খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্র উরসে পাকের আয়োজন করা যায় আর প্রতি চন্দ্র মাসের ৩ তারিখে

খাতুনে জান্নাতের নামে ফাতেহাও দেয়া যায়। এতে ইহ ও পরকালীন অনেক ফযিলত ও বরকত রয়েছে।

উপরোক্ত বিশেষ অনুষ্ঠানে খতমে কোরআন শরীফ, খতমে গাউসিয়া শরীফ, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি যিকির আজকার এবং খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পবিত্র জীবনী আলোচনার আয়োজন করা যায়।

আর এ বরকতময় অনুষ্ঠানাদি করলে উভয় জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। এগুলো করা শরিয়ত সম্মত। বরং এগুলো করার মধ্যে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। নিশ্চয় পালনকারীরা ও আয়োজনকারীরা এর বরকত অনুধাবন করতে পারবেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ওফাতের সময় খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বয়স মোবারকঃ

প্রথমতঃ জমহুর ওলামাদের মতে, ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২২ বৎসর।

দ্বিতীয়তঃ আল্লামা শাবলঞ্জীর মতে ২৮ বছর।

তৃতীয়তঃ আল্লামা ইবনে তবরীর মতে ২৯ বছর।

চতুর্থতঃ কারো মতে ৩০ বছর।

পঞ্চমতঃ কারো মতে ৩৫ বছর।

ষষ্ঠত ঃ ২৪ বছর।

সপ্তমতঃ ২৫ বছর।

বিশুদ্ধমতে ২২ বছরই প্রসিদ্ধ। আর কারো মতে ১৮ বছর ৭৫ দিন।

(যখারেরুল উক্বা ৫৩ পৃঃ, আলামুল নেসা ৩০ পৃষ্ঠা,

বিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের পর দাফন -কাফন ও গোসল

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নামাযে জানাযা ঃ

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নামাযে জানাযা কে পড়িয়েছেন এব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

তৃতীয়তঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অনুমতি ক্রমে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

বিশুদ্ধ মতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর নামাজে জানাযা পড়েছেন।

তবকতে ইবনে সাদ এ ৭ম খন্ড ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত-

صلى ابو بكر الصديق رضى الله عنه على فاطمة بنت رسول الله على الله عليه وسلم فكبر عليها اربعا -

আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ১ম খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত-

كبر ابو البكر على فاطمة اربعا

(সূত্র নূহকা সফিনা ১৯৩ পৃষ্ঠা)

শরহে নহজুল বালাগাত কৃত ইবনে আবিল হাদিদ ৪র্থ খন্ড ১০০ পৃঃ বর্ণিত-

ان ابا بر هوالذى صلى على فاطمة عليها السلام وكبر عليها اربعا

(সূত্র নুহকা সফিনা ১৯৩ পৃঃ)

হযরত ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দাফন কাজে যারা নিয়োজিতঃ

(১) হযরত আব্বাস (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) (হুজুর (দঃ) এর চাচা)

(২) ফজল বিন আব্বাস (রাদ্বিআল্লাহু আনহু)।

(নূহকা সফিনা ১৯৩)

সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ওফাতের পর গোসল সংক্রান্ত ফয়সালাঃ

এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়ঃ

প্রথমতঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরতে আসমা বিনতে ওমাইস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উভয়ই ইনতিকালের পর গোসল দিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর অছিয়ত ছিল।

বর্ণিত আছে, হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ইনতিকালের পর উম্মূল মোমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে আসমা বিনতে ওমাইস (আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রী) ভিতরে প্রবেশ করতে দেন নি। তখন আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আবু বকর সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

অভিযোগ দিলেন যে, এই হাসয়ামা কবিলায় মহিলা আমাদের ও আল্লাহ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহেবজাদীর মধ্যে আড়াল বনেছেন। আমাদেরকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। আপনি জিজ্ঞাস করুন, তখন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আম্মা! তুমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবিদের কে হুজুরের সাহেবজাদী ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছ কেন? দেখছি তিনি তার জন্য একটি ফালকীর ন্যায় ঘর তৈরী করেছে। হযরত আসমা (রাঃ) উত্তর দিলেন, খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এ ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইন্তেকালের পর কেউ যেন তাঁর নিকট প্রবেশ না করে। তাকে এ ধরনে ফালকীর ন্যায় পর্দার ব্যবস্থা করার জন্যও আমাকে নির্দেশ দিলেন। খাতুনে জান্নাত (রাঃ) কে এভাবে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ) গোসল দিলেন।

(টীকা তারিখে কারবালা - ২১৭ পৃষ্টা) আলামুন নেসা ১৩১পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয়ত ঃ কিন্তু যখায়েরুল উকারে মধ্যে ইমাম তবরী (রাঃ) বর্ণনা করেন-

فقال على والله لايكشفها احد فاحتملها فدقها بغسلها ذالك ولم يكشفها ولا غسلها احد حرجة احمد فى المنا قب والد ولابى

(যখায়েরুল উত্তবা- ৫৪ পষ্ঠা)

অর্থাৎ অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট যখন হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে আসমা (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ওফাতের পূর্বে গোসলের কথা বর্ণনা করলেন এবং আর কেউ তাঁর কাফন না খোলার জন্য অছিয়ত করলেন এ কথা হযরত আলী (রাঃ)কে এর নিকট বর্ণনা করার পর হযরত আলী (রাঃ) বলেলন, যে তাকে আর কেউ খোলবে না এবং ঐ পূর্বের গোসলের উপর তাঁর জানাযা হল এবং নামায পড়া হল। ইন্তেকালের পর তাকে কেহ খুলেওনি এবং কেউ গোসলও দেননি।

গোসল সংক্রান্ত সমাধান ঃ

উপরোল্লোখিত দুই বর্ণানার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান এভাবে দেয়া যেতে পারে।

ইন্তেকালের পরে গোসল দেয়ার বর্ণনাকারী হলেন উম্মে আবু জাফর। তিনি হযরত আসমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) কে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর হুজরা শরীফের মধ্যে অবস্থান করার পরিপ্রেক্ষিতে ধারনা করে বর্ণনা দেন

যে, তাঁরা উভয়ই গোসল দিয়েছেন। সেখানে অন্য কারো প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি হুজুর (দঃ) এর বিবিগণের ব্যাপারেও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে ইন্তেকালের পরে গোসল আর কে দিবে(?) এরা দুজনই দিয়েছেন। যখন এ বর্ণনা করে দিলেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর যে বিষেশত রয়েছে এবং ইন্তেকালের পূর্বে নিজের গোসল নিজে করে নিলেন এবং কাফনও পরিধান করে নিলেন, এইসব কিছু বাইরের লোকেরা জানে না। একাজটা করার সময় উম্মুহাতুল মোমেনিনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ছিলেন। তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে গোসল কাফন ও বিছানার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর ওফাতের সময় যে অছিয়ত করেছিলেন তা হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট বললে- তিনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর আর গোসলের প্রয়োজন হবে না এবং এটা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বিশেষত্বের মধ্যে অন্যতম। যেখানে খাতুনে জান্নাতের মধ্যে এমন কতগুলো বিশেষত্ব রয়েছে, যা অন্য কোন মহিলাদের মধ্যে নেই। যেমন তিনি হায়েজ নেফাস থেকে মুক্ত ছিলেন। সেহেতু ইন্তেকালের পরেও তাঁর গোসল নেই, খাতুন জান্নাত (রাঃ) এর বিশেষ বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবর্ণানাটি গ্রহণযোগ্য।

আর যেখানে খাতুনে জান্নাতে (রাঃ) অছিয়ত করেছেন যে, যে কাপড়ে তাঁর ইন্তেকাল হবে তাঁকে যেন আর খোলা না হয়। ইন্তেকালের পরে যদি গোসল দেয়া হয় তাহলে তো এগুলো খোলতেই হবে। এটা তার অছিয়তের বরখেলাপ হয়। পাশাপাশি আর পর্দার ব্যাপারে তার যে কঠোরতা ছিল সেটাও ভঙ্গ হবে। যে পর্দার জন্য আজরাইল (আঃ) কে জান কবজ করার অনুমতি দেন নি। সেখানে ওফাতের পর গোসলের আবার কি প্রয়োজন (?) যিনি আগেই গোসল করে ওফাতের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলমীন স্বীয় কুদরতের মহিমায় তাঁর জান কবজ করবেন। আর তাঁর জান যেখানে আল্লাহ কবজ করবেন সেখানে তিনি পুত পবিত্র অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেখানে তাঁকে গোসল দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

একবিংশ অধ্যায়

খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কবর মোবারকের রহস্য ঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর পর্দার ব্যাপারে যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। ফলে তার কবর শরীফের ব্যাপারে ও সঠিক তথা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি অছিয়ত করেছিলেন তাঁর ইন্তেকালের ব্যাপারে কাউকেও কোন খবর দেয়া না হয় এবং কোন স্থানে তাঁকে দাফন করা হবে এ ব্যাপারেও যেন জানাজানি না হয়। এরপরেও রাত্রি বেলায় তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

দাফন সংক্রান্ত মতামত ঃ

প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ বর্ণনুযায়ী তাঁর কবর শরীফ জান্নাতুল বকীতে রয়েছেন। যেখানে অন্যন্য আহলে বাইতগন আছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কারো কারো মতে তাঁর হুজরা শরীফের মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মদিনা শরীফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইমাম সামাহুদী ওফাউল ওফা গ্রন্থে তাঁ এদুই ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়তঃ মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে ওমরের বর্ণনা মতে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কবর শরীফ দ্বারে আকিলের ডান কোণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যা জান্নাতুল বকীর মধ্যে শামিল।

চতুর্থতঃ কারো মতে দারে আকিল থেকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কবর শরীফের দূরত্ব ২২গজ অথবা ১৭ গজ।

পঞ্চমতঃ হযরত হাসন বিন আলী (রাঃ) কে অছিয়ত করে ছিলেন, খাতুনে জান্নাত (রাঃ) আমার আব্বাজান হুজুর (সঃ) এর পাশে আমাকে যদি দাফন করার সুযোগ না হয় তাহলে আমার আম্মাজানের পাশে জান্নাতুল বকী শরীফে আমাকে দাফন করবেন।

দাফন সংক্রান্ত আলোচনার সমাধানঃ

(১) এসব গুলো প্রমান করতেছে তাঁর কবর শরীফ জান্নাতুল বকীর মধ্যে আছে।

(২) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) এর বর্ণনানুযায়ী তাঁকে তার হুজুর শরীফে দাফন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তা মসজিদে নববীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

(৩) যেভাবে হুজুর (রাঃ) কে তাঁর হুজরা শরীফের মধ্যে দাফন করা হয়েছে যেভাবে হযরত খাতুনে জান্নাত ও (রাঃ)কে তাঁর হুজরা শরীফে দাফন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে অনেক মত বিরোধ রয়েছে। এসমস্ত বর্ণনার মধ্যে জান্নাতুল বকী শরীফে হওয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু শাফেয়ীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর হুজরা শরীফের মধ্যে হওয়া প্রাধান্য দিয়েছে।

জযবুল কুলুব শেখ মুহাক্কেক দেহলভী ১৮৪,১৮৫,১৮৬ পৃষ্ঠা

সমাধান সংক্রান্ত অভিমত ঃ

(১) এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) কর্তৃক পর্দার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান থাকার ব্যাপারে জান্নাতুল বকীতে তাঁর কবর শরীফ কোনটি? এ ব্যাপারেও লোকদের নিকট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সে সময় জান্নাতুল বকীতে কয়েকটি নতুন কবর হয়েছিল।

(২) উল্লেখ রওজায়ে পাকের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পার্শ্বে একটি কবর শরীফ দেখা যায়। এটাকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কবর শরীফ বলে অভিহিত করা হয়। শিয়াদের মধ্যে এটা প্রাধান্য পেয়েছে।

সমাধান সংক্রান্ত গ্রন্থকারের অভিমত ঃ

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর কবর শরীফ নিয়ে এ দ্বন্দ্বের অবসান কালে এটাই বলে দেয়া যেতে পারে যে, তাঁর কবর শরীফ জান্নাতুল বকীও আছে আর রওজায়ে পাকেও আছে। এটা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বিশেষ ক্ষমতা। সেখানে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর আউলাদদের ওলিগনের মধ্যে এমনও বর্ণনা রয়েছে যে, তাঁদের কবর একাধিক স্থানে আছে। যেমন চট্টগ্রামের হযরত বদর আউলিয়া মাজার, হযরত আলী শাহ কালন্দর (রাঃ) এর মাজারও কয়েক স্থানে রয়েছে। এটা সম্ভব যে, কেননা একজন অলি আল্লাহ তাঁর রূহানী ক্ষমতা দিয়ে স্বশরীরে একাধিক স্থানে একই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন গাউসুল আসম দস্তগীর (রাঃ) একই সময়ে সত্তরজন মুরিদের ঘরে ইফতারের সময় উপস্থিত হয়ে ছিলেন। আল্লামা হুমবী তার কিতাব নাফখাতুন কোরবে ওয়াল এত্তেসালের মধ্যে ৬ ও ৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

ان الاولياً يظهرون فى صور متعدد بسب غلبة روحانيتهم على جسما نيتهم وحمل هذا المعنى مافى بعض روايات الحديث الصحيح حيت قال صلى الله تعالى عليه وسلم - ينادى من كل باب من ابواب الجنة بعض اهل الجنة فقال له ابو بكر الصديق رضى الله عنه وهذادخل احدمن تلك البواب كلها قال نعم وا رجوا ان تكون منهم وقالو ان الروح الكلية نظهر فى سبعين الف صورة فدار الدينا ففى الفرح اولى ران الروح فيه رغلب واشد استعلالا واقوى واكثر انتقالا بسب المفا رقة عن البدن النتهى -

অর্থাৎ- অলি আল্লাহগণ তাঁদের শরীরের উপর রূহানী শক্তি বৃদ্ধির কারণে একাধিক রূপ ধারণ করতে পারে এবং একই সময়ে একাধিক স্থানে বিচরণ করতে পারে। একথার মর্মার্থ ছহীহ হাদীসের দ্বারাই সাব্যস্থ। হাদীসে পাকের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, কোন এক বেহেস্তীকে আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তের আট দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আহবান করা হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, হযরত রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তি একই সময়ে কি আট দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আশা করি তুমিও তাদের মধ্যে একজন। আর ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, একটি শক্তিশালী রূহ দুনিয়ার জগতে সত্তর হাজার রূপ ধারণ করে বিচরণ করতে পারবে। তাহলে কবরের জগতেতে অনায়াসে পারবে। কেননা কবরের জগতে রূহ বা আত্মা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দুনিয়ার তুলনায় অনেক শক্তিশালী এবং স্বাধীন হয়ে যায়।

(টীকা- রেসালাতুন ফি তাহকীকিন রাবেতা, মাওলানা খালেদ রাফেদাদী ৬-৭ পৃঃ)

হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী আউলিয়াদের ক্ষমতা যদি এমন হয় যে, তাঁরা একাধিক সময়ে একই স্থানে থাকতে পারে? সেটা দুনিয়া ও কবরের জগতে।

তাহলে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও জান্নাতুল বকী ও হুজুর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা মোবারকে কেন থাকতে পারবেন না। আর উভয় স্থানে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর কবর শরীফ হওয়া মূলতঃ খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) এর পর্দার প্রতি কঠোর অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি এটা তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অনন্য দৃষ্টান্ত বহন করে।

জান্নাতুল বকী শরীফের মধ্যে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাজার শরীফে গুম্বুজ ছিল। সেই সময়ের গুম্বুজ সম্বলিত ছবিও এক কিতাবের মধ্যে রয়েছে কিন্তু ১৩৪২ হিজরীর মলউন সউদী ওহাবী বর্তমানের সাউদীয়া তা শহীদ করে দিয়েছে।

(মাদারেজুন নবুয়ত, ৫৪৪ পৃঃ), ২য় খন্ড)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বর্ণিত হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তেকালের পর তাঁর কবর শরীফ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রত্যেক দিন যিয়ারত করতেন।

দ্বাদবিংশ অধ্যায়

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস বর্ণনা

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেন।

বুখারী-মুসলিম শরীফে ১টি।

তিরমিযী ও ইবনে মাযাহর মধ্যে হাদীস বর্ণিত আছে।

বর্ণনাকারী আলী, হাসনাইন, উম্মে সালমা, উম্মে রাফে, হযরত আয়েশা, আনস ইবনে মালেক।

এরসাল হিসেবে- ফাতেমা বিন্তে হুসাইন অর্থাৎ দাদী থেকে না দেখে হাদীস বর্ণনা করেন।

(টীকা- আলামুন নেসা- ১২৮, মুহাম্মদ রেজা কাহহালা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ফেদকের মাসয়ালা

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) ও সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মিথ্যা অভিযোগের বর্ণনা

কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (দঃ) এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর হক ছিনিয়ে নিয়েছেন।

হুজুর (দঃ) কর্তৃক ফেদকের যে বাগিছা দান করা হয়েছিল, হুজুর (দঃ) এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তা তরকা হিসেবে দিলেন নি এবং এতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর উপর নারাজ হয়ে যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর উপর নারাজ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁকে মাফ করে দেন।

মিথ্যার অপনোদনঃ

ঐতিহাসিকদের একথার কোন ভিত্তি নেই। এটা শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর উপর বিদ্বেষভাব রেখে করা হয়েছে।

মূল ঘটনাঃ এটার মূল ও সঠিক তথ্য এই যে, ফেদক হচ্ছে খায়বর এলাকার একটি খেজুর বাগান। ঐ এলাকায় ইহুদীরা বাস করত। এদেরকে যখন অবরোধ করে রাখা হল, তখন ইহুদীরা সন্ধি করল যে, ফেদকের উৎপাদন অর্ধেক হুজুর (দঃ) এর দরবারে প্রেরণ করবে। একথার উপর চুক্তি হল। খায়বর এবং ফেদক সবগুলো মুসলমানের হাতে আসার পর হুজুর (দঃ) ঐগুলির আমদাদী তাঁর বাচ্চা এবং আহলে বাইতের উপর ব্যয় করতেন। হুজুর (দঃ) এর ওফাতের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) তা তরকা হিসেবে দাবী করলেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কাছে হুজুর (দঃ) এর এই হাদীস দলীল থাকার কারণে তাঁকে তরকা হিসেবে দিতে অস্বীকার করলেন। হাদীসটি হলো, হুজুর (দঃ) বলেন,

نحن معشرالانبياء لا نورث ماتركناه صدقة

অর্থাৎ আমরা নবীগণের দল কাউকে ওয়ারিশ বানায় না, আমরা যা পরিত্যাগ করে যাব তা সমগ্র মুসলমানদের সদকা।

টীকা- (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত শরীফ)

এ হাদীসের আলোকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বললেন, সাহেবজাদী! আপনি হুজুর (দঃ) এর আহলে বাইত! নবী হিসেবে হুজুর (দঃ) এর তরকা হতে পারে না। সুতরাং এ জন্য আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ঐ হাদীসের উপর আমল করে তা প্রদান করেন নি। একথা নয় যে, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে ছিনিয়ে নিয়েছেন। পরে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) মাসয়ালা বুঝাতে পারেন এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর উপর রাজি হয়ে যান। যা পূর্বে ওফাতের ঘটনার মধ্যে বলা হয়েছে।

(টীকা- সফিনায়ে নূহ ১৯৪, ১৯৫ পৃঃ)

শিয়া রাফেজীদের কারসাজীঃ

এই কথা নিয়ে শিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায়রা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর কটুক্তি করেন। এটা সম্পূর্ণরূপে আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) দুনিয়াবী সব ধন-সম্পদ থেকে নিজকে বিরত রাখেন, সেখানে কি তিনি ঐ তরকার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন? আর তরকা সৃষ্টি হওয়াতে নবীদের বিশেষত্বের হানি হয়। যেহেতু নবীগণ হলেন জিন্দা। তার অনেক প্রমাণের মধ্যে তাঁদের মাল তরকা না হওয়াই একটি প্রমাণ। সুতরাং পাঠক মহলের প্রতি আরজ, আহলে বাইতের শানে শিয়া-রাফেযীরা বয়ান করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সহ বড় বড় সাহাবীদের শানে বেয়াদবী করে এবং আহলে বাইত ও সাহাবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব উপস্থাপিত করে দেয়। অথচ বাস্তবে এরকম নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যা বয়ান করবে তা সঠিক ও তথ্য নির্ভরশীল। সুতরাং এটাই অনুসরণীয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আহলে বাইত সংক্রান্ত আলোচনা

আল (ال)ও আহলে বাইত সম্পর্কিত আলোচনা ঃ

সাধারণত আহলে বাইত বলতে ঘরের অধিবাসীদেরকে বলা হয়।

প্রথমতঃ কোন কোন বর্ণনায় আল (ال) শব্দ এসেছে। ال মূলে اهل ছিল, ه কে ا দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। লেসানুন আরবের মধ্যে ال الله وال رسوله এ বাক্যে ال থেকে আউলিয়া উদ্দেশ্য। আহল এর অর্থ পরিবার, পরিজন, আত্মীয়, স্বজন ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ কখনো কখনো اهل এর অর্থ ছাহেব বা মালিকের অর্থ ব্যবহার হয়। যেমন- اهل مال মাল ওয়ালা, اهل علم জ্ঞান ওয়ালা।

তৃতীয়তঃ সাধারণভাবে اهل ব্যবহৃত হয় সম্ভ্রান্ত বংশের হলে। আর ال ব্যবহৃত হয় ال رسول আলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশের হলে ।

চতুর্থতঃ (ক) আহলে রসূল ال رسول থেকে কারা উদ্দেশ্য এই নিয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ال থেকে যদি اهل بيت رسول الله صلى عليه وصلم উদ্দেশ্য হয় তাহলে যে সমস্ত বর্ণনাতে ال رسول এর কথা এসেছে, তা থেকে আহলে বাইতে রসূল তথা পাক পাঞ্জাতনসহ আযওয়াযে মুতাহ্হারাত তথা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিবিগণ উদ্দেশ্য।

(খ) এক হাদীসের মধ্যে প্রত্যেক নেককার মুমেনকেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ال বলেছেন। ইহা থেকে ال عام উদ্দেশ্য।

ال এর প্রকরণ ঃ

প্রাগুপ্ত বর্ণনা দ্বারা ال দুই প্রকার স্পষ্ট হয়-

(১) ال خاص অর্থ বিশেষ পরিবারবর্গ।

(২) ال عام অর্থ সাধারণ পরিবারবর্গ, অর্থাৎ নেককার ঈমানদারগণ।

আল (ال)ও আহলে বাইত সংক্রান্ত মতামতঃ

হাদীসের বর্ণনা দু'টি শব্দ দেখা যায়,

প্রথমতঃ আলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দ্বিতীয়তঃ আহলে বাইতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আয়াতে তাতহীরের মধ্যে-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ليطهركم تطهيراً.

এ আয়াত থেকে কারা উদ্দেশ্য এ নিয়ে মুফাসসেরিনদের মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ রয়েছে।

আহলে বাইত থেকে পাক পাঞ্জাতন উদ্দেশ্য ঃ

প্রথম মতামতঃ ইমাম বগবী, খাযেন আরো অন্যান্য মুফাস্‌সেরীনদের মতে, সাহাবায়ে কেরামের একদল বিশেষ করে আবু সাঈদ খুদরী, তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত মুজাহেদ, হযরত কাতাদাহ প্রমূখ বলেছেন আহলে বাইত থেকে আহলে আবাহ (চাদর ওয়ালা) উদ্দেশ্য। এরা হচ্ছেন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁরা তাদের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত উক্ত দলীল পেশ করে।

দলীল সমূহ ঃ

প্রথমতঃ নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্থ যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ অবস্থায় তশরীফ এনেছেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হযরত আলী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু), হযরত ফাতেমা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা), ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। হুজরা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে কাছে বসালেন এবং দুই হাসানাইনকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুই রানের মধ্যে বসিয়ে চাদর মোবারক তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে জড়িয়ে দিয়ে উক্ত আয়াতে তাতহীর পাঠ করেন এবং এ দোয়া করেন।

اللهم هولاء اهل بيتى وخاصّتى فاذهب عنكم الرجس فطهرهم تطهيراً.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই আমার আহলে বাইত! এদের থেকে নাফাকী দূর কর এবং এদেরকে অত্যন্ত পুতঃ পবিত্র রাখ।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, একদিন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুজরা শরীফের মধ্যে ভোর বেলায় তশরীফ নিয়ে আসেন। এ সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে একটি কালো নক্সা বিশিষ্ট চাদর ছিল।

فاتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن فادخله فيه ثم جاء الحسين فادخله فيه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً.

অর্থাৎ এমতবস্থায় হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন চাদরের মধ্যে তাঁকে ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আসলে তাঁকেও চাদরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করলেন। এরপর ইমাম হাসান (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) আসলেন তাঁকে প্রবেশ করালেন। এরপর ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন, তাঁকেও প্রবেশ করালেন। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরোক্ত আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করলেন।

(টীকা- আলে রসূল ৫৪ পৃষ্ঠা, তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে খাযেন)

এ চাদরের ঘটনা হযরত উম্মে সালমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে হচ্ছিল। তিনি এ চাদর মোবারক উঠিয়ে সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন, তাঁর থেকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদর চিনিয়ে নিলেন। তখন তিনি বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত নয়? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, তুমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবি হবার কারণে উত্তম অবস্থায় আছ। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরোক্ত দোয়া করলেন।

(তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে দুররে মনসুর)

তৃতীয়তঃ হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে তাতহীর নাযিল হবার পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলতেন,

الصلوة يا اهل البيت الصلوة انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً.

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ আমল ছয় মাস পর্যন্ত জারি ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মতে, এ আমল ৭ মাস জারি ছিল। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আয়াতে তাতহীর নাযিল হবার পর ৪০ দিন খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর পাশ দিয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেতেন এবং বলতেন,

السلام عليكم يا اهل البيت الصلوة رحمكم الله.

(টীকা-আশশরফুল মুয়াইয়দ, আলে মুহাম্মদ-৫৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্থতঃ হযরত ওয়াসেলা ইবনে আমশ হতে বর্ণিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘর মোবারকে তশরীফ নিলেন। এরপর হযরত আলী, ফাতেমা, ইমাম হাসান ও হোসাইনকে নিজের সামনে বসালেন এবং আয়াতে তাতহীর পাঠ করলেন এবং উপরোক্ত দোয়া করলেন, তখন হযরত ওয়াসেলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) وانا من اهلك, আমি আপনার আহলের মধ্যে।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন,

وانت من اهلى قال انها لا رجعى مع ارجوقال البيهقى وكانه تشبيها لا تحقيقا.

(টীকা- আলে রসূল, পৃষ্ঠা নং৫৬)

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমিও আমার আহলের মধ্যে হতে। ইমাম ওয়াসেল বলেন, আহ্! এটা আমার জন্য বড় আশার কথা। ইমাম যাহাবী বলেন, এটা উপমা হিসেবে বলেছেন, বাস্তবপক্ষে নয়। বাস্তবপক্ষে ঐ পাঁচজনই। এছাড়া আরো অনেক দলীলাদি রয়েছে যা আহলে বাইত থেকে পাক পাঞ্জাতন হবার ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছে।

পাক পাঞ্জাতন ছাড়াও অন্যান্যরা উদ্দেশ্য ঃ

দ্বিতীয়ত মতামতঃ অপর আরেক দল উলামাদের মতে, আহলে বাইতের মধ্যে উম্মুহাতুল মুমেনীন উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ এ কথার দিকে হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইকরাম গিয়েছেন। তাঁদের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে

يا ايها النبى قل لازواجك ان الله كان لطيفا خبيرا

হতে শুরু করে । পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ৭ আয়াত উম্মুহাতুল মুমেনীনদের শানে নাযিল করেছেন। সুতরাং তারা ও আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয়তঃ আল্লামা খতিব তিরমিযী ইমাম নসায়ীর সূত্রে বলেন যে, আহলে বাইত থেকে ঐ সমস্ত লোকেরাই উদ্দেশ্য যারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বিশেষ সম্পর্কে সম্পৃক্ত আছেন। পুরুষ মেয়ে, পবিত্র বিবিগণ, বাঁদী, নিকট আত্মীয়।

তৃতীয়তঃ ইমাম সালুবী বলেন, কোন কোন হযরত ওলামা আহলে বাইত থেকে বনু হাশেম, কারো মতে, বনু আব্বাস, আলে আকীল যাদের উপর সদকা হারাম তা উদ্দেশ্য।

মতামত সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

প্রথমতঃ জমহুর উলামাদের ফয়সালা হল, আহলে বাইতের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবিগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয়তঃ হযরত সদরুল আফাযেল আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব সওয়ানেহে কারবালার মধ্যে বিস্তারিত লিখে তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘরের মধ্যে যারা বসবাস করতেন তাঁরা ঐ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা বাইত শব্দটি এখানে ব্যাপক। যা বাইতে মাসকন ও বাইতে নসবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয়তঃ বাইতে মাসকনের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবিগণ ও পাকপাঞ্জাতন আছেন।

আর বাইতে নসবের মধ্যে বনু হাশিম অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আহলে বাইতের জন্য অন্যান্যদের তুলনায় বিশেষত্ব রয়েছে। আহলে বাইতের মধ্যে খাছ বুঝানো হয় তখন পাক পাঞ্জাতন উদ্দেশ্য। এজন্য হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক হাদীসের মধ্যে خاصتى (খাসসাতি) আর হযরত ওয়াসেল এবং হযরত সালমান ফারসীকে নিজ আহলে বাইত বলেছেন। ঐ বাইত থেকে বাইতে শরফ উদ্দেশ্য অর্থাৎ মর্যদার দিক দিয়ে।

আহলে বাইতের প্রকারভেদঃ

আলোচনা থেকে বুঝা গেল আহলে বাইত ৪ প্রকার; যথাঃ

(১) **আহলে বাইতে খাচ্ছাহ্ঃ** এখানে পাক পাঞ্জাতন শামিল।

(২) **আহলে বাইতে মাসকনঃ** এখানে হুজুরের বিবিগণ অন্তর্ভূক্ত।

(৩) **আহলে বাইতে নসব ঃ** এখানে বুন হাশিম অন্তর্ভূক্ত।

(৪) **আহলে বাইতে শরফঃ** এখানে অন্যান্য সাহাবীগণ ও অন্তর্ভূক্ত।

(টীকা- আশশরফুল মুয়াইয়দ, আলে রসূল-৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা, খুতবাতে মুহররম-২২৫, ২২৬, ২২৭ পৃষ্ঠা)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আহলে বাইতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মান

সাহাবায়ে কেরাম আহলে বাইতের মর্যাদা ঃ

আহলে বাইতের মর্তবা ও সম্মান সম্পর্কে পূর্বে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরামগণ পরবর্তী উম্মত আহলে বাইতকে সম্মান ও মুহব্বত করাকে নিজের মধ্যে গৌরবের বিষয় মনে করতেন।

প্রথমতঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আহলে বাইত পাক পাতনের মুহব্বত সম্পর্কে এ কথা বলেছেন,

والذى لنفسى بيده لقرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلم احب الىّ عن اصل من قرابتى.

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয় থেকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আত্মীয় স্বজনকে অধিক প্রিয় মনে করি। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয়তঃ আরেক হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একথা বলেছেন,

ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم فى اهل بيتى

(বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আহলে বাইতের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাকে রক্ষা কর। তথা আহলে বাইতকে সম্মান কর। (তারিখে কারবালা ৭৩ পৃষ্ঠা)

তৃতীয়তঃ হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আহলে বাইত সম্পর্কে তাঁর মুহব্বত ও সর্বক্ষেত্রে আহলে বাইতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তার একথা প্রনিধান যোগ্য।

হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে মুসলমানরা ইরাকের মাদায়েনে বিজয় হবার পর সেখানে যে সব ধন-সম্পদ পাওয়া গেল। সেখান

থেকে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হাজার হাজার দিরহাম দিনেন। আর হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ কে দিলেন ৫০০ দিরহাম।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় আমি যুবক ছিলাম। তখনও যুদ্ধ করতে গিয়েছি।

আর হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ঐ সময় মদীনার অলি-গলিয়ে খেলা করতে ছিল। আর এখন তাঁদেরকে হাজার হাজার দিরহাম দিতেছেন আর আমাকে ৫০০ দিরহাম দিচ্ছেন। তখন ফারুকে আজম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে বৎস! প্রথমে ঐ মকাম ও ফযিলত অর্জন কর, যা দুই শাহ্‌জাদা অর্জন করেছেন। তখন হাজার দিরহাম তলব কর, তাহলে তা পাবে। আর এ দুই শাহজাদার নানা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); পিতা হচ্ছেন, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), মা হচ্ছেন, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)।

(টীকা- খুতবাতে মুহররম ২৮২, ২৮৩ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা ৭৪, ৭৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্থতঃ প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) ইয়াহিয়া ইবনে সৈয়্যদ আল জরীর সূত্রে ওবাইদ বিন হুনাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি (হোসাইন) হযরত ফারুকে আযম (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এর নিকটে গিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় ফারুকে আযম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে নববী শরীফে খুতবা দিচ্ছেন, আমি যখন গিয়ে পৌছি তখন তাঁকে বললাম,

انزل عن منبر ابى اذهب الى منبر ابيك.

অর্থাৎ আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান এবং আপনার পিতার মিম্বরে চলে যান। অতঃপর তখন ফারুকে আজম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার পিতার কোন মিম্বর নেই। তখন তিনি আমাকে ধরে তাঁর পাশে বসালেন। তখন আমি মিম্বর শরীফের পার্শ্বে কংকর নিয়ে খেলতে ছিলাম। তিনি মিম্বর শরীফ থেকে নেমে আমাকে তাঁর ঘরে নিলেন এবং বললেন আপনি মাঝে মধ্যে এখানে তশরীফ আনবেন। তাহলে এটা কতই না যে ভাল হবে এবং আমাদের জন্য ইহা সৌভাগ্যের বিষয় হবে। আর আমরা এই মরতবা আপনার নানাজানের পক্ষ থেকে পেয়েছি।

(টীকা- খুতবাতুল মুহররম ২৮১, ২৮২ পৃষ্ঠা, তারিখে কারবালা-৮৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চমতঃ এভাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি ঘটনা হয়েছে। তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শাহজাদা ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, এটাতো আপনাদেরই বদৌলতে হয়েছে।

(খাওয়ায়েকে মুহরেকা ৫৯২ পৃঃ)

ষষ্ঠতঃ এবার হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দরবারে খেলাফতের সময় তশরীফ নিলেন। দেখলেন, তার দরবারের বাইরে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) দাঁড়ানো অবস্থায় অপেক্ষায় রয়েছে এবং ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পায়নি। হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এটা দেখে ফিরে আসেন। মনে মনে ভাবলেন, যেখানে হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছেলের অনুমতি নেই। সেখানে আমার কি স্থান হবে? এ কথা জেনে হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শাহজাদা হাসানের দরবারে গিয়ে বলেন, আমি আমার ছেলেকে অনুমতি দিইনি। কিন্তু আপনি তো আমাদের সরদার! আর আপনার মর্যাদার বদৌলতে এ মর্তবা আমাদের নসীব হয়েছে।

(টীকা)- তারিখে কারাবালা ৮৮ পৃঃ, খুতবাতু মুহররম ২৮৩ পৃঃ, আল আমন ওয়াল উলা ৮৭, বরকাতে আনোয়ার)

সপ্তমতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান মুসান্না (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) একদিন হযরত ওমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বিন আব্দুল আজিজের নিকট তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি যুবক ছিলেন, তাঁকে হযরত আব্দুল আজিজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উঁচু আসনে স্থান দিলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি উপস্থিত হলেন, তাঁর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে দিলেন।

তিনি চলে যাবার পর লোকে খলিফা আবদুল আজিজকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি একজন কম বয়সী ছেলেকে এত উঁচু আসনে স্থান দিলেন কেন? তিনি বলেন, আমি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের থেকে শুনেছি, ফাতেমা আমারই নূরানী শরীরের অংশ যে কাজে ফাতেমা আনন্দিত হবেন আমি সেই কাজে রাজি হব। তিনি ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সন্তান। এতে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রাজি হবেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাজি হবেন, এজন্য আমি এরূপ করেছি।

(টীকা- তারিখে কারবালা ৮৯ পৃঃ, সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৬০২ পৃঃ)

অষ্টমতঃ আর একদিন হযরত ফাতেমা বিনতে আলি, ওমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট তাশরীফ আনলে তিনি তাঁকে অনেক সম্মান করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর জমিনে আপনাদের থেকে কেউ উঁচু মর্যাদার নেই এবং আপনাদের ব্যতীত আমার আছে আর কেউ সম্মানিত নয়।

(সায়ায়েকে মুহরেকা ৭৮৯ পৃষ্ঠা, তারিখ কারবালা ৯০ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের তাজিমের প্রতি চার মযহারের ইমামগণঃ

ইমাম আবু হানিফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঃ

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনুহু) আহলে বাইতের আতহার এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আহলে বাইতের প্রতি তিনি ব্যয় করতেন আর তাঁদের নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন এবং আহলে বায়তের কোন একজনের নিকট তিনি লুকায়িত বার হাজার দেরহাম প্রদান করেন, এবং তাঁর অনুসারীদেরকে আহলে বাইতের প্রতি সম্মান করার সিদ্ধান্ত দিতেন।

(সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৬০৪ পৃঃ)

আর এছাড়া হযরত আবু হানিফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত ইববারাহীম যখন হাসান মুসান্না (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিলেন, রাজ নীতিদের ব্যাপারে সহযোগীতা করতে এবং জনগণের নিকট দাওয়াত দিলেন যে, হযরত ইব্রাহীমের ভাই মুহাম্মদ এর সাথে রাজনীতিকভাবে থাকা ওয়াজীব। পাশাপাশি তিনি ৫৩০ দিন ইমাম জাফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট খেদমতে থেকে জগতের ইমাম হয়েছেন।

(আশশরফুল মুয়াইয়াদ ৮৮ পৃঃ)

ইমাম মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঃ

ইমাম মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন জাফল বিন সুলাইমান বেত্রাঘাত করেন, তখন ইমাম মালেক (রাঃ) বেহুস হয়ে পড়েন। হুস হবার পর ইমাম মালেক লোকজনকে বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি তাঁকে (জাফর বিন সোলাইমান) ক্ষমা করে দিলাম। তখন তিনি বলেন, আমার ভয় হচ্ছে যদি আমার মৃত্যুর পর হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আমার হাজির কিভাবে হবে। আমার কারণে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরের শাস্তি হবে। আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আত্মীয় হবার কারণে জাফরকে ক্ষমা করে দিলাম।

(বরকাতে আলে রাসূল ২৬২ পৃঃ, খুতবাতে মুহরম ২৩৭ পৃ)

ইমাম শাফেয়ী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ঃ

ইমাম শাফেয়ী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এর মধ্যেও আহলে বাইতের প্রতি গভীর মুহব্বত ছিল। এক প্রকারে তিনি কবিতাকারে বলেছেন-

لوكان رفضًا حب ال محمد

فليشهد الثقلان انّى رافضى

يا اهل بيت رسول الله حبّكم

فرض من الله فى القرآن انزله

يكفيكم من عظيم الفخر انكم

من لم يصلّ عليكم الاصلاة له.

(১) আলে রাসূলের মুহব্বতের নাম যদি রাফেজী হয়, তাহলে জীন-ইনসান এ শর্তে সাক্ষী থাকবে যে, এ অর্থে আমি রাফেজী।

(২) হে আহলে বাইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনাদের মুহব্বাত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফরয, যা আল্লাহ তায়ালা আয়াতে মুয়াদ্দতের মাধ্যমে নাযিল করে দিয়েছেন।

(৩) আপনাদের জন্য উম্মতের পক্ষ থেকে এই তাজিমই যথেষ্ট যে, আপনাদের উপর দরূদ শরীফ না পড়লে নামাযই হবে না।

(তাফসীর কবির ২৭ খন্ড ১৬৬ পৃঃ, আশশরফুর মুয়াইয়াদ ৮৮, তারিখে কারবালা ৮৫, খুতবাতুল মুহরম ২৩৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) ঃ

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) সর্বদা আহলে বাইতের আতহারের তাজিম করতেন, এবং আহলে বাইতে কেউ তাশরীফ নিলে তিনি আপন স্থান ত্যাগ করে তাঁকে স্বীয় স্থানে বসাতেন। আর তিনি তাঁর পিছনে বসতেন এবং হাটার সময়ও পিছনে পিছনে থাকতেন, কখনো সামনে যেতেন না।

(টীকা- সাওয়ায়েকে মুহরেকা ৬০৪ পৃঃ, তারিখে কারবালা ৮৬ পৃষ্ঠা)

ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক আহলে বাইতের তাজিমঃ

প্রথমত ঃ কাজী আয়াজ কিতাবুশ শেফার মধ্যে বর্ণনা করেন যে, এই পবিত্র ব্যক্তিত্ব সমূহ অর্থাৎ আহলে বাইত আতহার উম্মহাতুল মুমেনীন ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা হারাম। এদের মানহানীকারী লানত প্রাপ্ত।

(টীকা- কিতাবুশ শেফা ২য় খন্ড ৪৮৮ পৃঃ)

দ্বিতীয়তঃ আব্দুল ওয়াহাব শারানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, সৈয়াদ শরীফ হযরত খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর খানকার মধ্যে এ কথা বর্ণনা করেন, কাশিফুল বুহীরা একজন সৈয়্যদাজাদাকে প্রহার করেছে। রাত্রে বেলায় ঐ কাশেফুল বুহীরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখলেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন, আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আপনি আমার থেকে আপনার চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিয়েছেন, আমি কি কসুর হয়েছে? ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন.

تضربنى انا شفيعك؛ يوم القيامة.

অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রহার করবে আর আমি তোমার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশ করব।

কাশেফুল বুহীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি এখনো বুঝতে পারি নি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اما ضربت ولدى

অর্থাৎ তুমি কি আমার আউলাদকে প্রহার করনি?

ما وقعت ضربتك ال علي ذرائى هذا.

অর্থাৎ তোমার ঐ প্রহার আমার এই বাহুর মধ্যে পড়েছে।

একথা বলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখিয়ে দিলেন, সেখানে প্রহারের দাগ রয়েছে। যেভাবে মৌমাছি কামড় দিলে দাগ হয় সেভাবে হয়ে গেল।

(টীকা- বরকাতে আলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), খুতবাতুল মুহররম ২৭৬ পৃঃ)

তৃতীয়তঃ আল্লামা মুকরেমী বর্ণনা করেন, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ওমরী বর্ণনা করেন, আমি একদিন, কায়রোর গভর্ণর কাজী জামাল উদ্দীন মাহমুদ কাজেমীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তিনি তাঁর অধিনস্থদেরকে নিয়ে মসজিদের মুয়াজ্জিন সৈয়্যদ আব্দুর রহমান তবাতুবীর বাসভবনে তাশরীফ নিলেন এবং খবর দিয়ে দিলেন, তিনি যেন বাসভবনের বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসে যে গভর্ণর তার বাসভবনের বাইরে এসেছে।

গভর্ণরকে ঘরে বসালেন। আর প্রত্যেককে আপন আপন মর্যাদানুযায়ী বসালেন, তখন সৈয়্যদ গভর্ণর বলেন, জনাব সৈয়্যদ সাহেব। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। সৈয়্যদ সাহেব বলেন, আপনি একজন গভর্ণর, আমি আপনাকে কিভাবে ক্ষাম করে দিব। তখন গভর্ণর বলেন, গতরাত আমি গভর্ণর ভবনে গিয়েছিলাম। বাদশা জাহের বরকুকের সামনে বসেছি এবং আপনি যখন এসেছেন এবং আমার থেকে উঁচু স্থানে বসে গেছেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, বাদশার মজলিসে একজন মুয়াজ্জেন হয়ে আমার থেকে উঁচু স্থানে কেন বসে গেলেন? একথা আমি মনে মনে ভাবতেছি। রাতের বেলায় যখন আমি নিদ্রা গেলাম স্বপ্নে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জেয়ারত হলেন এবং তিনি লক্ষ্য করে আমাকে বললেন,

يامحمود تانف ان تجلس تحت ولدى.

অর্থাৎ হে মাহ্‌মুদ! তুমি আমার আউলাদের নীচে বসতে নিজের মধ্যে লজ্জাবোধ মনে করছ।

একথা শুনতে না শুনতে হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রহমান তবাতবী কেঁদে বললেন, জনাব আমার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে যে, যার কারণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কথা স্মরণ করবে। একথা শুনে উপস্থিত সকলেই অশ্রুভরা নয়নে কেঁদে ফেললেন এবং সকলেই হযরত সৈয়্যদ সাহেবের নিকট দোয়া চাইলেন এবং সকলেই দোয়া নিয়ে ফিরে আসলেন।

(বরকাতে আলে রসূল ২৬৯ পৃষ্ঠা, খুতবাতে মুহররম ২৭৮ পৃষ্ঠা)

চতুর্থতমঃ ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এর সাথে একজন সৈয়্যদজাদার সাথে একটি ঘটনাঃ কলম সম্রাট আল্লামা এরশাদুল কাদেরী বর্ণনা করেন যে, একবার আলা হযরত (রহঃ) বেরলভী শহরের কোন এক মহল্লায় যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ীর সামনে পালকী নিয়ে আসা হল। তিনি অযু করে নতুন কাপড় পরিধান করে মাথায় পাগড়ী পরিধান করে আলেমা শান নিয়ে হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন এবং পালকিতে আরোহন করেন। পালকী বাহকেরা পালকী কাঁদে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু দুর যেতে না যেতে আলা হযরত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন; তোমরা পালকীকে থামাও। সবাই পালকী রেখে দিলেন। পালকীর পিছনে অনেক ভক্তরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন।

আলা হযরত অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় পালকী হতে বের হয়ে আসলেন এবং পালকী বাহকদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনাদের মধ্যে কে সৈয়্যদজাদা আছেন? একথা শুনে বাহকদের মধ্যে একজনের মধ্যে ব্যতিক্রম অবস্থা দেখা গেল। তাঁর চেহারায় পেরাশানের ভাব স্পষ্ট হল। সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়ে দিলেন।

এরপর আলা হযরত বললেন, আল্লাহর হাবিবের দোহাই দিয়ে বলছি যে, আপনাদের মধ্যে কে সৈয়্যদজাদা আছেন? একথা বলার পর এক ব্যক্তি বলে উঠল, হুজুর! আপনি যখন আমার নানাজানের দোহাই দিলেন, তখন আর নিজের পরিচয় না দিয়ে পারছি না, আমিই ঐ ফাতেমী বাগানের একটি শুকনা ফুল। কিন্তু অভাবের কারণে কারো নিকট হাত বাড়াতে পারি না। সুতরাং জীবিকার জন্য এই পেশা নিলাম। একথা শুনে আলা হযরত বিনয়াবত হয়ে তাঁর নিজের পাগড়ী মুবারক খুলে সৈয়্যদজাদার কদমে রাখেন এবং অশ্রু সিক্তে বলেন, মুয়াজ্জজ শাহজাদা! আমার বেয়াদবী মুলক আচরণ ক্ষামা দৃষ্টিতে দেখবেন। অজ্ঞতা বশতঃ আমার থেকে এ ভুল প্রকাশ হয়েছে। এখন আপনার দরবারে আমার আরজ এই যে, এই ভুলের মার্জনা এভাবে হবে বলে আমি মনে করি, আপনি যে পালকিতে আরোহণ করিয়ে আমাকে যতটুকু আনছেন ততটুকু পথ আমি আপনাকে আরোহণ করিয়ে আনব। একথার উপর সকলের মধ্যে একটা নীরবতা সৃষ্টি হল। সৈয়্যদজাদাও কিছু বলতে পারছেন না। এক দিকে জগৎ বিখ্যাত আলেমে দ্বীন তিনি কিভাবে পালকী বাহক সৈয়্যদজাদাকে নিবেন। আর সৈয়্যদজাদাও কিভাবে এত বড় আলেমের কাঁধের উপর যাবে। সম্পূর্ণরূপে ইহা বাস্তবের আমলের বিপরীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলা হযরতের এশকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যে প্রেম রয়েছে, তা এ কাজ করা ছাড়া অন্য কিছু মানতেছে না। অগত্যায় উক্ত সৈয়্যদজাদা আলা হযরতের মধ্যে এ কথা মানতে বাধ্য হলেন।

(খুতবাতে মুহররম ২৮৭ পৃষ্ঠা, তারীখে কারবালা- আমিন কাদেরী ৮৯, ৯২ পৃঃ)

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদ শব্দের বিশ্লেষণঃ

سيد আরবী শব্দ। এর অর্থ ইমাম, পেশওয়া এবং সরদার ও মুনিব। সৈয়্যদ শব্দটি যদি আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয় তখন তার অর্থ হবে মুনিব, মালিক। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য ব্যবহার হলে, তখন তার অর্থ হবে ইমাম, পেশওয়া, এমন কি মুনিবের অর্থও হবে, যদি উম্মতকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গোলাম সাব্যস্থ করা হয়। বাস্তবে তাইও। ইসলামী শরিয়তে গোলাম-মুনিবের মাছআলাও আছে। মুনিবকে আরবীতে সৈয়্যদ বলা হয় আর গোলামকে আরবীতে عبد বলা হয়।

কুরআন করিমে হযরত ইয়াহিয়া (আলাইহিস সালাম) এর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে,

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.

(সূরাঃ আলে ইমরান)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াহিয়া (আলাইহিস সালাম) কে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সৈয়্যদ হবেন তথা সরদার ও ইমাম হবেন এবং নারী সম্প্রদায় হতে বিরত থাকবেন এবং ছালেহীন নবীদের মধ্যে থেকে অন্যতম হবেন।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরামের যমানায় সৈয়্যদ শব্দ ব্যবহারিত হতে আহলে বাইতের রসূলের উপর চাই হাসানি হোক, হোসাইনি হোক অথবা আলাভী হোক, অথবা জাফর অথবা আকিল অথবা আব্বাসের আওলাদ হোক। পরবর্তীতে মিশরের মধ্যে যখন ফাতেমী বংশ সৃষ্টি তখন শরীফ শব্দ ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেললের। মিশরে এ পর্যন্ত এ প্রচলন আছে।

প্রথমতঃ ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন, যাঁরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে)র বংশধর তাদের জন্য সৈয়্যদ ব্যবহার করা হয়। আর ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশধর তাদের জন্য শরীফ ব্যবহার করা হয়। হুজুরের আউলাদ যারা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাধ্যমে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাধ্যমে যে বংশধর সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের জন্য সৈয়্যদ শব্দ ব্যবহারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ কেহ কেহ সৈয়্যদ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তির রাগ তার আকল তথা বিবেকের উপর প্রাধান্য না পায় তাকে সৈয়্যদ বলা হয়।

তৃতীয়তঃ আর কারো মতে, সৈয়্যদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার মধ্যে খাইর-বরকত অন্যদের তুলনায় অধিক থাকবে।

চতুর্থতঃ সৈয়্যদ শব্দ দ্বারা যদি বংশ বুঝানো হয় তাহলে তা দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নুরানী বংশধর যা ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্দেশ্য হবে।

পঞ্চমতঃ আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নূরানী বংশের উপর সৈয়্যদ শব্দের হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পাওয়া গেছে।

যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন

الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة.

অর্থাৎ নিশ্চয় (আমার দেহিত্রদ্বয়) হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন হচ্ছেন বেহেশতের যুবকদের সরদার।

(মিশকাত শরীফ ৭৫০ পৃঃ, তিরমিযি শরীফ, যাখারেরুল উক্বা ১২৯ পৃঃ)

ষষ্ঠতঃ হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

قال رسلو الله صلّى الله عليه وسلم من احبّ ان ينظرالى سيدا اهل الجنة فلينظر الى هذا.

অর্থাৎ হযরত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতীদের যুবকদের ছরদারদ্বয় এর দিকে দেখতে ভালবাসে অতঃপর সে যেন ইহাদের (ইমাম হাসান ও হোসাইন) এর দিকে দেখে।

সপ্তমতঃ অপর হাদীসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

اما حسن فله هيبتى وسوددى

অর্থাৎ ইমাম হাসনের জন্য আমার দাপট ও গাম্বীর্যতা এবং সরদারী রয়েছে।

(আশশরফুল মুয়াইয়াদ ৭২ পৃঃ)

অষ্টমতঃ অপর আরেক হাদীসে ইমা হাসান সম্পর্কে বলেন,

ابن هذا سيد

অর্থাৎ আমার এই নাতি সৈয়্যদ (সরদার)। (যখায়েরে উক্‌বা ১২৫ পৃঃ)

উপরে উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে سـيـد শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই হযরতের বংশধরের উপর সেই শব্দ ব্যবহার হতে থাকবে।

তাই এই জন্য যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সৈয়্যদুল মুরসালীন। سيد المرسلين

আর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হলেন سـيـد الاولـيـاء ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) سيدا شباب اهل الجنة এই কারণে আর তাঁর আওলাদগণ سادات المسلمين

অর্থাৎ মুসলমানদের ছরদার। আর হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) سيدة نساء العا لمين

অর্থাৎ রমণী জগতের সরদারণী।

হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অন্য বিবিদের মাধ্যমে যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি হয়েছেন, তাদেরকে সৈয়্যদ বলা যাবে না। তাদেরকে বলা হয় আলভী। যেমনঃ মুহাম্মদ বিন হানিফা আলভী ইত্যাদি। তাঁরা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশধর হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর গর্ভে আসা নয় বরং হযরত হানিফা ও অন্যান্য বিবিগণের গর্ভে আসা সন্তান।

এই যুগে সৈয়্যদ বলা হবে যার পিতা সৈয়্যদ বংশের সন্তান। মা যদি সৈয়্যদ বংশের হয় আর পিতা যদি অন্য বংশের হয়, তখন ঐ সন্তানদেরকে সৈয়্যদ বলা যাবে না। কেননা বংশ বিস্তার হয় পিতার মাধ্যমে। মাতার মাধ্যমে নয়।

সৈয়্যদ এর প্রকরণ ঃ

আর যদি পিতা সৈয়্যদ বংশের আর মা অন্য বংশের হয় তখন সন্তানদেরকেও সৈয়্যদ বলা হবে।

আর যদি মা-বাপ উভয়ে যদি সৈয়্যদ বংশের হয়, এদেরকে নজীবুত তরফাইন

সৈয়্যদ (فجيبة اطرفين سير) বলা হয়। যেমন- হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। পিতার দিক দিয়ে হাসনী সৈয়্যদ আর মায়ের দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়্যদ।

বর্তমানেও সৈয়্যদ বংশের ধারা অব্যাহত ঃ

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) পিতার দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়্যদ এবং মাতার দিক দিয়ে হাসানী সৈয়্যদ। হুজুর কিবলা আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রাঃ) পিতা ও মাতার দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়্যদ। বর্তমান হুজুর ক্বিবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের ও হুজুর ক্বিবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া কাদেরীয়া ছিরিকোটি শরীফ, পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষক, আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া চট্টগ্রাম বাংলাদেশ উভয়ই পিতা ও মাতার দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়্যদ।

সৈয়্যদ না হয়ে সৈয়্যদ দাবীকারীদের উপর অভিসম্পাত ঃ

বর্তমান জমানায় অনেকেই নিজকে সৈয়্যদ বলে দাবী করে এবং জোরালোভাবে প্রচারও করে, প্রকৃতপক্ষে বংশীয় দিক দিয়ে সৈয়্যদ না হয়ে থাকে শরীয়ত মতে তা হারাম এবং অপরাধ। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

من ادعى الى غيابيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً.

(ফতওয়ায়ে রেজভীয়া ৭ম খন্ড ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজকে আসল পিতা ছাড়া অন্য পিতার দিকে নিসবত করবে, তার উপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাগণ ও সকল লোকদের অভিস্পাত বর্তাবে এবং আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবে না।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সৈয়্যদজাদাদের ফাযায়েল তথা মর্যাদা বর্ণনা

তকি বিন ফাহাদ হাশেমীর বর্ণনা ঃ

তকি বিন ফাহাদ হাশেমী মক্কী বর্ণনা করেন, আমার নিকট সৈয়্যদ আকিল বিন আকিল এসে রাত্রি বেলায় খাবার চাইলেন, আমি তাঁকে কিছু দিলাম না। ঐ রাত্রি বা পরের কোন এক রাত্রিতে স্বপ্নে আমার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জেয়ারত নসীব হল। হুজুর আমার থেকে তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার হাদীসে পাকের খাদেম। কি অপরাধ হয়েছে আমার? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমার নিকট আমার একজন আওলাদ রাত্রি বেলায় খানা চেয়েছে আর তুমি তাঁকে খাবার দাওনি। সকাল হওয়ার পর ঐ সৈয়্যদ সাহেবের নিকট গিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং উপস্থিত আমার যা ছিল তা আমি তাঁর নিকট পেশ করলাম।

(সাওয়ানেকে মুহরেকা ৮০৬ পৃঃ, তারিখে কারবালা আমিন কাদেরী ৯৬ পৃঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের বর্ণনা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বড় এক দলসহ মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন একজন সৈয়্যদজাদা বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এ কি বড় দল নিয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন এ কাজ তো আপনার পিতা করেন নি। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেন, আমি তো আপনার নানাজানের কাজ করতেছি যা আপনারা করতেছেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক একথাও বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আপনি সৈয়্যদ তথা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধর। আমার পিতা এরূপ ছিলেন না। আমি আপনার নানাজানের এলমের মিরাদ পেয়েছি। এতে আমি সবাইয়ের প্রিয়ভাজন হয়েছি আর আপনি আমার পিতার মিরাদ নিয়েছেন ফলে আপনি ইজ্জত পাননি। সেই রাত্রিতে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক স্বপ্নে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মলিন অবস্থায় দেখলেন। আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মলিন অবস্থায় কেন?

উত্তরে তাঁকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি আমার বংশধরের ইজ্জতহানী করছ এতে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ভয়ে জাগ্রত হলেন। পরের দিন ঐ সৈয়্যদ জাদাকে তালাম করেন মাফ চেয়ে নিতে বের হলেন এ দিকে ঐ রাত্রি সৈয়্যদজাদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, বৎস! তুমি যদি ভাল হতে তোমাকে কেউ একথা বলতে পারত না। পরের দিন সকালে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়ে গেলে একজন অপরজনকে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। পরিশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক উক্ত সৈয়্যদজাদার থেকে মাফ চেয়ে নিলেন।

(তারিখে কারবালা ৯৭ পৃষ্ঠা, বহলায়ে ছহহী হেকায়াত ৯৩ পৃঃ)

আবু মুহাম্মদ ফাছী (রহঃ) বর্ণনা ঃ

আবু মুহাম্মদ ফাছী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি মদীনা শরীফের হোসাইনী পরিবারের কোন এক ব্যক্তিকে ঘৃণা করতাম। একারণে যে, তিনি খেলাফে সুন্নতের কাজে লিপ্তত থাকতেন। একদিনি মদীনা শরীফে মসজিদে নিদ্রা গেলাম। তখন স্বপ্নে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জেয়ারত নসীব হল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন যে, কি কারণ তুমি আমার আওলাদকে ঘৃণা করতেছ। আমি আরজ করলাম ইটা রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি না এইরূপ ব্যাপার নই। আমি উনাকে পছন্দ করি নাই আমার না পছন্দ হল তিনি সুন্নতের খেলাপ আমল করে তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন এইটা কোন ফিকাহ শাস্ত্রের মাসআলা নয় কি? যে, নাফরমান আওলাদ বংশের মধ্যে বহাল থাকে। বংশ থেকে খারিজ হয় না। আমি আরজ করলাম হ্যা মাসআলা সেই রকম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই মাসআলা সেই রকম। আমার আওলাদ থেকে খেলাফে শরাহ কাজ সংগঠিত হলে ও বংশ থেকে খারিজ হয় না।

আল্লামা ফাছী বলেন, জাগ্রত হওয়ার পর আমার অন্তর থেকে ঐ সৈয়্যদজাদার প্রতি বিদ্বেষভাব চলে গেল। আর এরপর দিন থেকে আমি তাঁকে সন্মানের চোখে দেখি।

(বরকাতে আলে রসূল ১০৪ পৃঃ, খোতবাতে মুহররম ২৫০ পৃঃ)

মুফতিয়ে আজম হিন্দ হযরত মুস্তাফা খাঁ রেযা (রাঃ)এর বর্ণনা ঃ

মুফতিয়ে আজম হিন্দ হযরত মুস্তাফা খাঁ রেযা (রাঃ) বলেন, আওলাদে রসূলের মধ্যে বে আমল হলেও তাঁদেরকে তাজিম ও সম্মান করতে হবে। সৈয়্যদ বংশের লোকদের থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুফুরী প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যকীয়।

ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ এবং তাদের সমস্ত ভূলভ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন। মৃত্যুর পূর্বে হলেও তাঁদেরকে তওবার সুযোগ দিয়ে তাঁদেরকে গুনাহ থেকে পরিস্কার করে দিবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে,

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ليهطركم تطهيراً.

(হুজ্জতে তাহেরা ১১পৃঃ, খোতবাতে মুহররম ২৫০ পৃঃ)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন যে,

ان فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله وذريتها عن النار.

নিশ্চয়ই হযরত ফাতেমা (রাদ্বিআল্লাহু আনহা) তাঁর চরিত্রের পর্দাকে হেফাজত করেছেন, বিধায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন।

(আশশরফুল মুয়াইয়াদ ৪৫ পৃঃ, খুতবাতে মুহররম ২৪৯-৫০ পৃঃ)

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী এর বর্ণনা ঃ

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী তাঁর ফতোয়ার শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন, কিছু মুহাক্কেক আল্লাহ না করুক যদি কোন সৈয়্যদজাদা থেকে বেবিচার শরাব পান অথবা চুরি ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হলে তাঁর উপর শরয়ী শাস্তি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে শরীয়তের কাজী বা বিচারক এই কথা এবং ধারণা নিয়ে ঐটা প্রয়োগ করবে। শাহ্‌জাদার পায়ের মধ্যে ময়লা লেগেছে আমি তা ধুয়ে দিচ্ছি। এই কথা মনে করবে না যে, সৈয়্যদজাদার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ইমাম নিবহানী এর বর্ণনা ঃ

ইমাম নিবহানী বলেন, বর্তমানে এ পরিভাষা পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রাচ্যেত্যের দেশ সমূহের মধ্যে প্রচলিত। আরবের মধ্যে শরীফ শব্দটি হাসানি ও হোসাইনী বংশধরের জন্য ব্যবহার হয়। অনেক শহরে এ পরিভাষা প্রচলন আছে যে, সৈয়্যদ বললে হাসানি ও হোসাইনি বংশধর নোকদের কে বুঝানো হয়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

শানে আহলে বাইত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

প্রথম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনাঃ

খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বংশধরদের সাহায্যকারীরা বেহেস্তী

বর্ণিত আছে যে, বলখ শহরের মধ্যে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর বংশধরের কোন এক সৈয়্যদাজাদীর স্বামী একজন সৈয়্যদজাদা ছিলেন। স্বামী মৃত্যুবরন করার পর বলখ শহর ত্যাগ করে তার সন্তানদেরকে নিয়ে সমরকন্দের এক জামে মসজিদে আশ্রয় নিলেন এবং শিশুদেরকে জামে মসজিদে রেখে তাদের আহার অন্বেষণে বের হলেন। তিনি শহরের একজন ধনী মুসলমান ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, আমি একজন সৈয়্যদজাদী মহিলা, কয়েকজন সন্তান নিয়ে খুব কষ্ট ও অসহায়ের মধ্যে আছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন। তখন ঐ মুসলমান ধনী ব্যক্তি বললেন, আপনি যে সৈয়্যদ বংশী তার প্রমাণ পেশ করুন। তখন ঐ সৈয়্যদজাদী মহিলা উত্তর দিলেন, আমি মুসাফের, আপনাকে কিভাবে দলীল দিব? এতেও ধনী ব্যক্তির মন তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়নি। বরং মুখ ফিরিয়ে নিল। পরিশেষে একজন অগ্নিপূজককে এই সৈয়্যদজাদী দেখলেন এবং তার নিকট এই সৈয়্যদজাদী মহিলা তাঁর অসহায়ের কথা ব্যক্ত করলেন। ঐ অগ্নিপূজক ব্যক্তি ঐ মহিলা খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বংশধর হওয়ায় তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে তার ঘরে আশ্রয় দিলেন, রাত্রি বেলায় ঐ ধনী ব্যক্তি হুজুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন যে, এবং হুজুর (দঃ) এর পাশে একটি সুন্দর বাটি রয়েছে। তখন ঐ মুসলমান ব্যক্তি আরজ করে বলল, হুজুর এই সুন্দর বাটিটি কার? উত্তরে হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, এটা একজন মুসলমানের জন্য বরাদ্দ। ধনাঢ্য ব্যক্তি বলল, হুজুর (দঃ) আমি তো মুসলমান, আমার জন্য কি হবে না? তখন হুজুর (দঃ) বললেন, তুমি যে মুসলমান আমার কাছে দলীল পেশ কর। এতে ঐ ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে পড়ল। তাকে হুজুর (দঃ) লক্ষ্য করে বলেন, তোমার নিকট আমার কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এর সাহেবজাদী তার অসহায় সন্তানদের জন্য সাহায্য চাইতে গেল আর তার নিকট তুমি আমার বংশধর হবার ব্যাপারে দলীল চেয়েছ। এ অবস্থায় ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির নিদ্রা-ভঙ্গ হল। উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি পরের দিন সকালে ঐ সৈয়্যদজাদীকে তালাশ করতে লাগলেন। খোঁজ

নিয়ে ঐ অগ্নি পুজকের নিকট পেলেন। তখন ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি অগ্নিপুজককে বলল, ভাই, তুমি এক হাজার দিনার রাখ, আর আমাকে এই সৈয়্যদজাদীকে দিয়ে দিন। আমি তাঁর খেদমত করব। তখন ঐ অগ্নিপূজক বলল, আমি তোমার কাছে এই এক হাজার দিনারের বিনিময়ে হুজুর পাক (দঃ) এর সম্মুখে যে বাটিটা ছিল সেটা বিক্রি করব না। গত রাত আমিও নিদ্রা অবস্থায় হুজুর (দঃ) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করি। আমিও আমার পরিবার হুজুর (দঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহন করেছি। অতঃপর হুজুর (দঃ) আমি ও আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও তোমার স্ত্রীর অবস্থান বেহেস্তের মধ্যে। আর বেহেস্তের এ বাটি তোমাদের জন্য বরাদ্দ।

দ্বিতীয়ত কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনাঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরের খেদমতে ঈমান নসীব

একজন অগ্নিপূজক উত্তম খাবার তৈরী করেছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আউলাদ তার প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতেন। এই সৈয়্যদ বংশধরের একজন শিশু কন্যা বললেন, এই অগ্নিপূজক যে উত্তম খাবার তৈরী করেছে ঐ খাবারের সুগন্ধি আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। কেননা আমরা অভাবের মধ্যে আছি। এই সংবাদ পেয়ে অগ্নিপূজক সৈয়্যদ পরিবারের নিকট খাবর পাঠালেন। তখন ঐ শিশু কন্যাটি খাবার পেয়ে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! এ ব্যক্তিকে আমার নানাজান হুজুর (দঃ) এর সাথে হাশর করাও।"

ঐ এলাকার একজন বুজুর্গ লোক স্বপ্নের মধ্যে হুজুর (দঃ) কে দেখলেন যে, হুজুর (দঃ) কোথাও তাশরীফ নিচ্ছেন। তখন ঐ বুজুর্গ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) আপনার তাশরীফ আউয়ারী কোন দিকে? হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমি এই অগ্নিপূজকের বাড়িতে যাচ্ছি, তাকে বলে দেবে যে, আমি তার দাওয়াত কবুল করেছি। পরের দিন সকাল বেলা ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি এই অগ্নিপুজকের কাছে এই সংবাদ দিলে সাথে সাথে সে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশ ধরের সাহায্যকারীর জন্য মহা পুরস্কার

একজন ব্যবসায়ীর নিকট আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) তথা আউলাদে ফাতেমা (রাঃ) এর বশধরের এক ব্যক্তি এসে কিছু মাল চাইলেন এবং বলে দিলেন যে, এটা আমার নানাজান হুজুর (দঃ) এর নামে লিখে রাখেন। ঐ ব্যবসায়ী তা

করে মাল দিলেন। একথা সকলের জানাজানি হয়ে গেল। কিছু দিন পর ঐ ব্যবসায়ী ব্যক্তি অভাবে পড়ে গেল।

অতঃপর একদিন স্বপ্নের মধ্যে হুজুর (দঃ) এর জিয়ারত নসীব হল। হুজুর (দঃ) করেন, "হে অমুক! তুমি যদি আমার সাথে দুনিয়াবী লেনদেন করে থাক, তাহলে তা দুনিয়ার মধ্যে পূরণ করে দিব। আর যদি আখেরাতের জন্য লেনদেন করে থাক তাহলে জেনে রাখ, আমি কত যে বড় কর্জদার।"

এ স্বপ্ন থেকে আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় তিনি জাগ্রত হলেন। কিছু দিন পর ঐ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তখন জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করছেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি হুজুর (দঃ) এর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক রোখে, সে ব্যক্তি স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়।

চতুর্থ কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনাঃ

সৈয়্যদা যাহ্‌রা বতুল (রাঃ) এর বংশধরের সম্মানার্থে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব করার মহান সৌভাগ্য অর্জন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তার পিতা মুবারক বর্ণনা করেন, আর তিনি কোন এক বুজুর্গ হতে বর্ণনা করেন। ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি প্রত্যেক বছর হজ্বে যেতেন, এক বছর হজ্বের মৌসুমে ৫০০ দিনার নিয়ে হজ্বের সফরের হজ্বের আসবাব পত্র ক্রয়ের জন্য বাগদাদের বাজারে বের হলেন। পথে খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বংশধর একজন সৈয়্যদজাদী মহিলা ঐ বুযুর্গ ব্যক্তিকে বললেন যে, আমি একজন সৈয়্যদজাদী, খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর বংশধর। আমার কয়েকজন সন্তান আছে। আজ ৪ দিন পর্যন্ত তারা খাবার খায়নি। একথা শুনে ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি হজ্বের বাজারের জন্য যে ৫০০ দিনার নিয়ে গিয়েছিল সব দিনার সৈয়্যদজাদীকে দিয়ে দিলেন। সেই বছর ঐ বুজুর্গ আর হজ্বে যেতে পারলেন না। অন্যান্য লোকেরা হজ্বে চলে গেলেন। হজ্ব শেষ করে হাজ্বীরা যখন তাদের বাড়ীতে ফিরে আসলেন তখন ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি তাদের সাক্ষাতের জন্য বের হলেন আর যার সাথে তিনি সাক্ষাত করেন প্রত্যেককে তিনি বলেন, "আল্লাহ যেন তোমার হজ্ব কবুল করেন।" এভাবে দোয়া করলেন। তখন ঐ হাজী সাহেবানরাও বলতেছেন, আর আপনি! "আপনার (এবারের) হজ্বও আল্লাহ কবুল করুন।" তখন ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি তাদের একথায় আশ্চার্য্যান্বিত হলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, আমিতো হজ্ব করলাম না আর তারা বলতেছে আমার যেন

এবারের হজ্ব কবুল করেন (!) ঐ রাত্রে এই বুজুর্গ ব্যক্তি হুজুর (দঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন, স্বপ্নে হুজুর (দঃ) বললেন, "তুমি আশ্চর্য হয়ো না, তুমি যখন আমার বংশধর, আমার আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এর আউলাদকে তোমার হজ্বের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছ তখন আল্লাহ্‌র দরবারে আমি দোয়া করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তোমার আকৃতিতে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে তোমার আকৃতিতে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব করে। অন্যান্য লোকেরা যে হজ্বে তোমাকে দেখেছে, মূলতঃ তোমার আকৃতিতে ঐ ফেরেশতাকে দেখেছে।"

পাদটীকাঃ উল্লেখিত কাহিনীতে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হুজুর (দঃ) এর ঐ হাদীসেরই বাস্তবতা। "যে আমার আহলে বাইতকে সাহায্য করে, তারা যদি দুনিয়াতে বদলা দিতে না পারে কিয়ামতের দিন আমিই তাদের প্রতিদান দেব।" উল্লেখ থাকে যে, কিয়ামতের বিনিময়ই হলো বড় বিনিময়। এর পূর্বে তারা হুজুর (দঃ) থেকে দুনিয়ার মধ্যেও পেয়ে গেলেন।

(টীকা- নাজাহাতুল মাজালেস ২য় খন্ড, ২৩৩, ২৩৪ পৃঃ)

পঞ্চম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

আউলাদে ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কলেমা নসিব

বর্ণিত আছে যে, কারবালার ময়দানে খান্দানে নবুয়তের উপর যে অত্যাচারের স্টীম রোলার চলছিল, সেখানে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খান্দানী বাগানের অনেক ফুল ঝরে গিয়েছিল। তন্মধ্যে ২জন শিশু কোন কারণে বেঁচে গিয়েছিল যাঁদের পিতা ঐ ময়দানে শহীদ হয়েছেন। ঐ দুই শিশু ঐ মরুভূমি ময়দানে অনেক কষ্টে অতিক্রম করার পর লোকালায়ে এসে পৌছেছে। রৌদ্র উত্তপ্ত ছিল। অনেক দিনের তারা উপবাস। ক্ষুধার কারণে তাঁদের পা চলছিল না। উত্তপ্ত রৌদ্রে চলতে ও পারছে না। হঠাৎ করে কোন একজন মুসলিম চৌধুরীর ঘরের বারান্দায় দুপুর বেলায় আশ্রয় নিল এবং ঐ দুই ছেলে পরস্পর কারবালার সেই লোমহর্ষক ঘটনা আলোচনা করতেছিল। এমতাবস্থায় ঐ চৌধুরীর দুপুর বেলায় আরামের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিল তোমরা কারা? তোমরা এখানে এসে আমার আরামের নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছ। ঐ দুইজন এতিম ছেলে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমরা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আউলাদ। কারবালায় আমাদের উপর যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে তা কারো অজানা নয়। সেখানে আমার পিতাও শহীদ হয়েছেন। সেখানে আমরা অনেক দিন অনাহারে থেকে কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করে

উত্তপ্ত রৌদ্রে হাঁটতে সহ্য করতে না পেরে আপনার ঘরের ছাদের নীচে আশ্রয় নিয়েছি। তখন ঐ চৌধুরী বললঃ তোমরা যে আউলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কোন প্রমাণ আছে কি? অনেকেই তো এইরূপ দাবী করে যাও। আমার ঘর ত্যাগ কর। ঐ দুই ছেলে ভরাক্রান্ত মন নিয়ে অগত্যায় উঠে পড়ল এবং দুর্বলতার কারণে চলতে পারছিল না। তার পরেও কোন প্রকারে সামনে ধীরে ধীরে পথ ধরে চলে যাচ্ছে। পথের পাশে এক অগ্নি উপাসকের বাড়ী ছিল। ঐ ব্যক্তি এই দুই শিশুকে দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া আসল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের পরিচয় কি? কোথা থেকে তোমরা এসেছ? এই দুই ছেলে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে ঐ অগ্নিপূজক মনে একটু দয়া আসল এবং তাঁদের মর্মান্তিক ঘটনা শুনে কেঁদে ছিল এবং হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আউলাদ হওয়ার কথা শুনে তার মনে এক ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। ঘরের ভিতর এই দুইজনকে নিয়ে গেল এবং তার বিবিকে বলল যে, এই দুইজন মুসলমানের নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বাগানের ফুল। এই দুইজনের খেদমত কর। তখন ঐ অগ্নি পূজকের বিবি এই দুইজন সৈয়্যদজাদার খুব যত্ন নিলেন। আর রাত্রি বেলায় ঐ মুসলমান চৌধুরী স্বপ্নে দেখল যে, কিয়ামত হয়েছে, বেহেশতীরা বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য সারিবদ্ধভাবে বেহেশতে প্রবেশ করছে আর ঐ মুসলমান চৌধরীকে দোযখের ফেরেশতারা টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখে আহবান করল যে, হে রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই ফেরেশতারা টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)চ্ছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তুমি যে মুসলমান আমার উম্মত তার প্রমাণ কি আছে? তোমার নিকট এতিম শাহ্‌জাদা গিয়েছিল তুমি তাদেরকে সৈয়্যদ বংশের দলীল দেখাতে না পেরে ধমক দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছ আর এ দিকে আমার থেকে সুপারিশ চাচ্ছ? একথা বলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য দিকে চলে গেলেন এবং ঐ ব্যক্তির আতংকবস্থায় ঘুমও ভেঙ্গে গেল পরের দিন সকাল বেলায় ১০০০ দিনার নিয়ে বের হল ঐ দুইজন এতিম সৈয়্যদ জাদাকে তালাশ করতে। অবশেষে তাদেরকে পাইল ঐ অগ্নিপূজকের ঘরে এবং সে অগ্নিপূজারীকে বলল এই ১০০০ দিনার রাখ আর আমাকে এই দুইজন ছেলেকে দিয়ে দাও। অগ্নিপূজক উত্তর দিল যে, তোমার ১০০০ দিনার বিনিময়ে আল্লাহর নবী গতরাত্রে যে বেহেশত আমাকে দিয়েছেন তা আমি বিক্রি

করতে পারিনি। তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ তা আমিও আমার বিবি দেখেছি। ময়দানে হাশরে আমাদেরকে ডেকে কলেমা পড়িয়ে দিলেন এবং আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এখন আমরা মুসলমান, রাসূলের গোলাম। এই রাসূলের শাহাজাদাদের খেদমত করব। আমরা তোমাকে তাঁদেরকে দিতে পারিনা।

পাঠক ভাই-বোনেরা চিন্তা করে দেখুন আউলাদে রাসূল তথা আউলাদে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে খেদমত করার বিনিময়ে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিধর্মীদেরকে স্বপ্নের মধ্যে এসে কলেমাও পড়িয়ে দিলেন এবং বেহেশতের মালিকও বানিয়ে দিলেন আর কলেমা পড়ুয়া চৌধুরী মুসলমান আউলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি বেহুরমতি করার কারণে তার পরিনতি কি হয়েছে তা অনুমান করুন।

(টীকা- জুলফ ওয়া জনযির ২৭ পৃষ্ঠা, পাকিস্তান)

ষষ্ঠ কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

আউলাদে ফতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খেদমতে বেলায়ত নসিব

হযরত জুনাইদ বোগদাদী নাম করা একজন রাজকীয় পলাওয়ান ও কুস্তীগীর ছিলেন। বাগদাদের খলিফার দরবারে তার অনেক সম্মান ছিল এবং কুস্তীগীরির প্রতিযোগীতায় প্রত্যেক বারে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য বজায় থাকত। একবার বাদশার দরবারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল কুস্তী প্রতিযোগীতার কোন কুস্তিগীরি আছে না-কি (?) যে বাদশাহর দরবারের কুস্তিগীরির সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হবেন? এই ঘোষণা চতুর্দিকে প্রচার হলে একজন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার নাম দিয়েছিল ঠিক প্রতিযোগীতার সময় দেখা গেল, জুনাইদ এর প্রতিপক্ষ একজন দূর্বল ব্যক্তি।

কুস্তি প্রতিযোগীতা যখন আরম্ভ হল ঐ দূর্বল ব্যক্তি কানে কানে জুনাইদকে কি জেন বলেছে? আর এইটা বলা হয়েছিল যে, হে জুনাইদ! তুমি রাজকীয় কুস্তিগীর। তোমার শক্তির সামনে আমি কিছু না (!) আমি হলাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধর হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আউলাদ। অভাবের কারণে দূর্বল হয়ে পড়েছি। তুমি যদি আজকের বিজয়টা কোন কৌশলে আমাকে দিয়ে দাও তাহলে আমার অভাব মোচন হবে। কিয়ামতের দিন এইটা বদলা আমি আমার নানা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর থেকে নিয়ে দিব। এই কথা জুনাইদের অন্তরে তীরের ন্যায়

বিদ্ধ হল এবং কাজ সেই রকম হল যে, জুনাইদ পরাস্ত হয়ে বিজয়টা সৈয়াদজাদাকে দিয়ে দিল। সৈয়াদজাদা বিজয়ের পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরলেন আর এ দিকে জুনাইদ দীর্ঘ দিনের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরলেন এবং লোকেরা তাকে ধিক্কার দিতে লাগল। ভরাক্রান্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন জুনাইদ। স্বপ্নে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাসভবনের সামনে তশরীফ নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে জুনাইদ! তুমি মন খারাপ কর কেন? তোমার ইজ্জত ভুলণ্ঠিত করে আমার আউলাদকে যে ইজ্জত দিয়েছ এবং আমার আউলাদ তোমাকে আমার থেকে কিয়ামত দিবসে যে বদলা নিয়ে দেবে বলে ওয়াদা দিয়েছে ঐ বদলা কিয়ামত নয় এখনই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে বেলায়ত দেওয়া হল এবং আজকে থেকে তোমার উপাধি سيد الطائفة সৈয়্যদুত তায়িফা তথা অলিদের সরদার পরের দিন হযরত জুনাইদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেই বেলায়তী মর্যাদায় আসীন হলেন। এই হল আউলাদে রাসূল তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশধরের খেদমত করার বিনিময়।

(টীকা- জুলফ ওয়া জনযির ৭৬ পৃঃ, আল্লামা এরশাদুল কাদেরী। পাকিস্তান)

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর খেদমতে আল্লামা ইকবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর শ্রদ্ধা নিবেদন-

(১) আল্লাহর হুকুম ও ফয়সালাকে মাথা পেতে মেনে নেওয়ার বাগানে উৎপাদনকারীনী এবং পূর্ণ আদর্শের জন্য হযরত ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ই চিরদিনের জন্য আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকবেন।

(২) আল্লাহর কানুনের বন্ধনি আমার পায়ের মধ্যে শিকল বেঁধে দিয়েছে এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফরমানের প্রতিবন্ধকতাও আমার জন্য রয়েছে।

(৩) নতুবা আমি খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কবর শরীফের চতুর্পার্শ্বে তওয়াফ করতাম এবং তাঁর কবর শরীফে সিজদা করতাম।

সপ্তম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

আহলে বাইতের শানে কবিতার রচনায় ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর উসিলায় রোগ মুক্তি

জওয়াহের আল ওকদাঈন কিতাবে শরীফ সমহুদী মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, কবি নসরুল্লাহ বিন আঈন মক্কা মোয়াযযমার পথে পাড়ি

দিলেন। তাঁর আসবাবপত্র, ধন-সম্পদ যা কিছু ছিল ওয়াদি-এ-সোগরা উপত্যাকা অতিক্রম কালে বনু ফাউদ গোত্রের লোকেরা লুট করে লইল। কবিও আহত হলেন। মনের দুঃখে তিনি একটি কবিতা রচনা করে ইয়েমেনের রইস মালেক আযিয মুল ফযকীন-বিন আয়বের কাছে পাঠাইলেন। তিনি তাঁর ভাই নাসের গভর্ণরকে নির্দেশ দিলেন, দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ফেরেঙ্গীদের হতে দখল করে নিতে। কবিতাটির প্রতিটি ছত্র হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম, ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), তাঁর আল-এ-আতহার ও আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রশংসায় রচিত। কাসিদাটি রচনার পর পরেই কবির স্বপ্নে যিয়ারত নসীব হয়েছে। স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ফাতেমা যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কবির ঘরকে আলোকিত করেছেন। কবি সালাম পেশ করলেন কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। মনের দুঃখে কবি অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন আর বিনীতভাবে অপরাধের কারণ জানতে চাইলেন। জনাবা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কবির ছন্দ গুচ্ছ মিলিয়ে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিলেন। কবির দেহের অস্ত্রাঘাত জনিত ক্ষতের উপর সৈয়্যদার পূত-পবিত্র দস্ত মুবারক হতে পানির ন্যায় কিছু ঝ ড়ে পড়, আর কবির স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। লক্ষ্য করলেন, দেহের ব্যথা-বেদনা ও ক্ষতের কোন চিহ্ন নেয়। কবি তৎক্ষণাৎ খাতুনে আতহারের কথিত কবিতার ছন্দে আর একটি কাসিদা রচনা করে খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কৃপা ভিক্ষা চাইলেন। অতঃপর ঘটনাটি ইয়েমেনের বাদশাহের কাছে নিবেদন করলেন, বাদশাহ শুকরানা আদা করার মানসে মক্কা মোয়াজ্জমার শরীফ ও অন্যান্য শহরবাসীগণের খেদমতে অনেক নজরানা ও তোহফা প্রেরন করলেন। কাসিদাগুলি দেওয়ান-ই-ইবনে আঈন এর মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিতাব-এ সফীনা-এ রাগেবে উল্লেখ আছে খাতুন-এ আতহারের সন্তানগণের অন্যতম ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অপূর্ব মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। জওয়াহের আল ওকদাঈন ও আরবাব-এ তারিখে বর্ণিত আছে, আলী বিন আল হুসাইন শৈশবেই বেশ কয়েকবার হজ্ব আদায় করেছিলেন।

অষ্টম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাহিনী শুনার শর্তে ছেলের জান ফেরত

একটি মশহুর রেওয়ায়ত আছে, আরব দেশের কোন এক শহরে এক স্বর্ণকারের বিবি বাস করিতেন। তাঁর এক ছেলে ছিল। একদিন কূপ হতে পানি আনতে গেলেন। ছেলেও মায়ের সঙ্গ নিল। বাচ্চাকে কূপের ধারে বসিয়ে মা পানি

তুলছিলেন। অপর দিকে এক কুমোরের চুল্লীতে আগুন গন্ গন্ করে জ্বলছিল। বাচ্চাটা খেলার ঝোঁকে ঐ চুল্লির মধ্যে পড়ে গেল। পানি তোলার ব্যস্ততায় মায়ে নয্‌র পড়লো না কোথা থেকে কি ঘটে গেল। কলসী পুরা শেষ হতেই মা দেখলেন বাচ্চা নেই- হয়তো বা বাড়ী ফিরে গেছে। ঘরে পৌছে দেখলেন, সেখানেও নেই। মায়ের মন পেরেশান হয়ে গেল। কাঁদছেন, মাথায় করাঘাত করছেন, আবার আসছেন কূপের ধারে। পাওয়া গেল না। এদিক ও দিক সর্বত্র খুঁজলেন, কত জনকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন সন্ধানই পেলেন না। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই রব উঠলো স্বর্ণকারের বাচ্চা কুমোরের চুল্লীতে পুড়ে মরে গেছে। হতভাগিনী মা এই দুঃসংবাদে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন।

বেহুঁশ অবস্থায় দেখলেন- নেকাবে আননখানা তাঁর ঢাকা, এক মহা সম্মানিতা নারী তশরীফ এনেছেন। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, 'দুঃখ করো না, বাচ্চাকে ফিরে পাবে। নিয়ত করো-বাচ্চা তোমার সুস্থ সবল, খেলতে কুদ্‌তে ফিরে আসলে জ নাব সৈয়্যদা (রাদ্বিয়াল্লাহহু আনহা)এর কাহিনী শুনাবে।"

বেহুঁশ থাকাকালীন স্বর্ণকারের বিবি নিয়্যত করলেন আর মানত মানলেন। জ্ঞান ফিরে পেতেই চোখ খুলে দেখলেন, খোদার ফজলে তার বাচ্চা হাসতে খেলতে জিন্দা ফিরে এসেছে। জনাব সৈয়্যদার কারামত বাচ্চার দেহে আগুন আদৌ স্পর্শ করে নাই। এমন কি পরনের কাপড়-চোপড়ের সুতোও জ্বলেনি।

স্বর্ণকারের বিবি খুশীতে আত্মহারা। ফিরে পাওয়া মানিককে নিয়ে ছুটলেন বাজারে। মিষ্টি কিনলেন দু'পয়সার। ঘরে ফিরে পড়শীদের বললেন, মনের বাসনা পুরো হয়েছে, সবাই আমার ঘরে চল, আর তেমাদের যদি সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাহিনী জানা থাকে আমাকে শুনাও। ছ'সাত বাড়ী ঘুরলেন সকলেই বলল, আমাদের কাহিনী মনে নেই আর এ কাজে আমরা যেতে অপারগ। হতাশ হয়ে স্বর্ণকারের বিবি রওনা দিলেন জঙ্গলের পথে যেতে না যেতেই নেকাব পড়া অবস্থায় মোয়াজ্জমা দর্শন দান করলেন আর ফরমালেন-

"মেয়েটি আমার, কেঁদো না, চাদর বিছিয়ে বসে পড়
কাহিনী আমি-ই শুনাচ্ছি, কাহিনী তুমি শুনতে থাক"।

এই কাহিনী স্বর্ণকারের বিবিকে শুনায়ে জনাব সৈয়্যদা গায়েব হয়ে গেলেন। স্বর্ণকারের বউ বাড়ী এসে দেখলো ওই সব লোক যারা কাহিনী শুনতে বা শুনাতে চায় নাই আর কাজটা নিষ্প্রয়োজন ও বাজে মনে করেছিল, তাদের ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরে গেছে।

নবম কাহিনী বা উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

মছিবতে সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর সাহায্য আর কাহিনী না শুনার পতিফল ও প্রতিকার

কোন এক শহরে এক বাদশাহ বাস করতেন। তিনি তাঁর উজীরকে শিকারের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে আদেশ দান করলেন। উজীর বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বাদশাহ ও উজীরের দুই শাহজাদীও সাথে চললেন। চলতে চলতে এক জঙ্গলে তাঁবু টাঙ্গানো হল। সঙ্গী-সাথীরা ক্লান্তি দূর করার জন্য কেহ শুয়ে পড়লেন আবার কেহ নাশতা করছিলেন। এমন সময় ঘুর্ণিঝড় উঠলো কে কোথায় উড়ে গেল। ছিটকে পড়লো সবাই। শাহজাদী আর উজীরজাদীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় কোন পাহাড়ে তাদের দু'জনকে নিয়ে ফেলে দিল! ঝড় থামতেই একে একে সকলে উপস্থিত হল। সৈন্যগণও ফিরল কিন্তু মেয়ে দুটির কোন খবর পাওয়া গেল না। বাদশাহ আর উজীর অনেক খোঁজাখুজি করলেন। কিন্তু কোন নিশানই পেলেন না। পরিশেষে তারা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরলেন । ঘটনা চক্রে তাঁরা চলে যাওয়ার পর অন্য আর এক দেশের রাজা ওই বনে শিকারে এলেন। তিনি তাঁর উজীরকে আদেশ করলেন- তৃষ্ণা লেগেছে পানির সন্ধান করো। উজীর পানির অন্বেষণে বের হলেন, আর পৌছলেন ওই পাহাড়ে যে পাহাড়ে মেয়ে দু'টি গিয়ে পড়েছিল। মেয়ে দু'টি মাতাপিতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। ওই বেহুঁশী হালতে দেখতে পেল-এক নেকাব পড়া মোয়াজ্জমা তশরীফ এনেছেন আর বললেন- মেয়েরা, তোমরা মানত কর তোমাদের মাতাপিতাকে ফিরে পেলে জনাবে সৈয়্যদার কাহিনী শুনবে। মেয়ে দু'টি অজ্ঞান অবস্থায় মানত করল। জ্ঞান পিরে পেতেই একে অন্যকে কহিল একই স্বপ্ন তারা দেখেছে। এমন সময় ওই উজীর পানির তালাশে সেখানে পৌছলেন। মেয়ে দু'টিকে সেখানে দেখে তিনি আশ্চর্য্য হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েরা তোমাদের বংশ পরিচয় বা কি? মেয়ে দু'টি সব ঘটনা ব্যক্ত করলো। আর বললো এভাবেই আমরা মা-বাপ হতে দূরে ছিটকে পড়েছি। উজীর তখন বাদশাহের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন। বাদশাহ আদেশ করলেন, সত্বর যাও, আর মেয়ে দু'টিকে এখানে নিয়ে এসো। উজীর লোকজন, যানবাহন নিয়ে পৌছলেন আর পাহাড়ে গিয়ে মেয়ে দুটিকে বললেন, "মেয়েরা ভাল মনে করলে আমার সাথে চল।" মেয়েরা রাজী হয়ে গেল।

উজীর তাদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের রাজাধানীতে পৌছলেন। কিছুদিন পর মেয়ে

দুটির মা-বাপ জানতে পারলেন, অমুক দেশের রাজ বাড়ীতে তাঁদের মেয়েরা বাস করছে। বাদশাহ তাঁর উজীরের মাধ্যমে একটি চিঠি লিখে আশ্রয়দাতা বাদশাহকে অনুরোধ করলেন, যাহাতে তাঁদের মেয়েদের ফিরিয়ে দেন। উত্তরে দ্বিতীয় বাদশাহ লিখলেন, যদি আমার রাজপুত্রের সাথে আপনার রাজ কন্যার আর উজির কন্যার সাথে আমার উজির পুত্রের শাদী দিতেন। প্রথম বাদশাহ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তখন দ্বিতীয় বাদশাহ মেয়ে দু'টিকে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ে দু'টো নিজেদের মা-বাপকে ফিরে পেয়ে খুব খুশী হল। আগের মত রাজ প্রাসাদে খেলাধূলার, আমোদ-আহলাদে আত্মহারা হয়ে গেল। শাদীর ব্যবস্থা হতেই নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়ে গেল। দু'মেয়ে বধুবেশে শ্বশুড়ালয়ে রওয়ানা দিল। ঘটনাচক্রে এক মেয়ে উপঢৌকনের বদনাটি নিতে ভুলে গেল। পথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই এক স্থানে তাঁবু টাঙ্গানো হল। তালাশ করে বদনাটি পাওয়া গেল না। জানা গেল বদনাটি মহলে ফেলে এসেছে। বরপক্ষের উজির একজন সিপাহী পাঠালেন বদনাটি নিয়ে আসতে। সিপাহী গিয়ে দেখে কি, মহল যেখানে ছিল সেটি এক বিরাট ময়দান। না আছে তখত্, না তাজ, না আছে বাদশাহ, আর না তার ফৌজ। ধূধূ করছে শূন্য মাঠ আর পড়ে আছে একটা বদনা। বদনাটি নিবার জন্য হাত বাড়াতেই এক সাপ ফনা তুললো। সিপাহী তো লাফ দিয়ে পিছনে পড়লো। অনেক চেষ্টা করলো বদনাটি উঠিয়ে নিতে কিন্তু পারলো না। অবশেষে ফিরে এসে সব কথা খুলে বললো। সব শুনে বাদশাহ ঘাবড়ে গেলেন- সে কি, তাদের সবাইকে বহাল তবিয়তে দেখে আসলেন আর এরই মধ্যে কি ঘটে গেল। মোট কথা বাদশাহ দুলহীনদের কাছে গিয়ে বললেন- এ সব কি ঘটনা? মনে হচ্ছে, তোমরা যাদুকরের মেয়ে। এই এতটুকু আসতেই এই অবস্থা, ঘরে গেলে যে কি করে বসবে? এখন তোমাদের বন্দী করলাম। ভোরে কতল করে দিব। আদেশ শুনিয়ে দিয়ে বাদশাহ রাগে গর গর করতে করতে নিজের তাবুতে ফিরে গেলেন। মেয়েরা ঘটনার কথা শুনে একে অন্যের গলা জড়িয়ে কত কাঁদলেন আর কত ফরিয়াদ করলেন- আয় দয়াময় খোদা! এ কি ঘটে গেল, কাল আমাদের বিয়ে হল, আর আজ বন্দিনী, সকালে তো কতল করে দিবে। আয় আল্লাহ, জানি না আমরা কি এমন গুনাহ করেছি। এই ফরিয়াদ করতে করতে তারা এত কাঁদলেন যে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থায় দেখেন কি সেই নেকাব পড়া মহিমাময়ী যাঁকে

পাহাড়ে দেখেছিলেন। তিনি ইরশাদ ফরমালেন, মেয়েরা তোমরা পাহাড়ে ওয়াদা করেছিলে তোমাদের মা-বাবাকে ফিরে পেলে জনাব সৈয়্যদার কাহিনী শুনবে। কিন্তু তোমরা নিয়্যত তো পুরো কর নাই। ওয়াদার খেলাপ করেছ। এ কারণেই তোমাদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে। এখন তোমরা এই কয়েদখানাতেই কাহিনী শুন। মেয়ে দু'টি নিবেদন করলো কয়েদখানায় পয়সা কোথা পাব? সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ফরমালেন, তোমাদের আঁচলে দু'টি পয়সা বাঁধা আছে। মেয়েদের জ্ঞান ফিরতে দেখলো সত্যিই আঁচলে দু'টি পয়সা বাঁধা আছে। তারা কোন প্রকারে মিঠাই যোগাড় করলো। একজন কাহিনী শুনাল আর অন্যজন শুনলো।

ভোরের বেলায় বাদশাহ জল্লাদকে ডেকে দুলহীনদের কতল করার আদেশ দিলেন। জল্লাদ তাদের কাছে আসতেই দুলহীনরা বললেন- বাদশাহের কাছে আমাদের কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি শুনে নিন তারপর কতল করবেন। বাদশাহ মেয়েদের কাছে আসলেন- সদ্য মেহদীতে রাঙ্গানো হাত চারটি জোড় করে আরয করলেন- বাদশাহ নামদার, প্রথমে একটি লোক পাঠিয়ে আমাদের মহলের অবস্থা জেনে নিন, পরে যা খুশী করতে পারেন। বাদশাহ প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। আর একজন সিপাহী প্রথম বাদশাহের মহলে আবার গেলেন। দেখেন কি বাদশাহী মহল, তখত্, তাজ, ফৌজ, শান-শওকত সবই মজুদ আছে। মেয়েদের সওয়াল করলেনঃ ব্যাপারটি কি? দুলহীনদ্বয় সব কথা নিবেদন করলেন। বললেন, সবই জনাব সৈয়্যদার বদৌলতে। তাঁর কাহিনী আমরা শুনি নাই, এ কারণে হয়তো এই মুসিবত আমাদের উপর নাযিল হয়েছিল। বাদশাহ বিশ্বাস করলেন আর দুলহীনদের মৃত্যুদণ্ড রদ করে দিলেন।

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

পাক পাঞ্জতনের নামে পাকের বরকত হাসিলের বিশেষ আমলঃ

কোন এলাকায় বসন্ত মহামারি দেখা দিলে পাক পাঞ্জাতন তথা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নাম মোবারক কাপড়ে অথবা কাগজে লিখে এলাকার চতুর্পার্শ্বে আজান দিয়ে ঐ কাপড়-কাগজ পতাকার ন্যায় গেড়ে দিলে ঐ এলাকাতে কলেরা মহামারি চলে যায় এবং এটা পরিক্ষিত। পূর্ব যুগ হতে বুযুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে এই আমল প্রচলিত হয়ে আসছে।

কারো বাড়ী বা ঘরে কোন জ্বীন-পরীর বদ আছর থাকলে ঘরের দরজা সমূহের উপরে পাক পাঞ্জাতনের নাম লাগিয়ে দিলে নামের বরকতে উহা দূরিভূত হয়ে যায়।

নিম্নে তার নমুনা দেওয়া হল-

لى خمسة اطفى بها : حرالوباء الحاطمة

المصطفى والمرتضى : وابنا هما والفاطمة

লি খামসাতুন উত্‌ফি বেহা,

হার্‌রাল ওবাইল হাতেমা।

আল মুসতফা ওয়াল মুরতদা

ওয়াবনা হুমা ওয়াল ফাতেমা।

অর্থঃ আমার সহায় আছেন পাঁচজন তাদের দয়ায় আমি নিভাই মহামারীর দাব দাহ। (তাঁরা) মুসতফা, মুরতদা ও তাঁদের দুশাহজাদা আর ফাতেমা আলাইহিমাস সালাম।

(টীকা- আমলে রেযা ও শময়ে শবেস্তানে রেযা)

পাক পাঞ্জাতন বলার বৈধতাঃ

পাক পাঞ্জাতন অর্থ পাঁচজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব। ইহা দ্বারা হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বুঝানো হয়। এই পাঁচজনের শানে আয়াতে

তাতহীর-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهرا

নাযিল হয়েছে।

তাফসীরে ইবনে জরীরে মধ্যে বর্ণিত আছে যে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هذه الاية فى خمسة فى وفى على وحسن وحسين وفاطمة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন এই আয়াত পাঁচজন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার ব্যাপারে এবং হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর শানে।

(টীকা- তাফসীরে ইবনে জরীর ২য় খন্ড, ৫ পৃঃ)

যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক এই পাঁচজন সম্পর্কে خمسة তথা পাঁচ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাহলে এটা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এই পাঁচজনকে পাক পাঞ্জাতন বলা হবে এবং বলাটাই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত।

এছাড়া আয়াতে মুবাহালার মধ্যে (যার বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ বাকী চার জনকে নিয়ে নাজরান খ্রীষ্টানের মোকাবিলায় বের হয়েছেন। সুতরাং পাক পাঞ্জাতন বলা এবং বর্ণনা করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নবীরই সুন্নত। ইহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব।

আর অন্য মাযহাব ওয়ালারা এইটা মেনে নিক বা না নিক এতে কোন কিছু আসে যায় না। এই পাক পাঞ্জাতন বলার বৈধতার পিছনে এ ব্যাপারে বিশিষ্ট কলম সম্রাট আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওআইসি ভাওয়ালপুর পাকিস্তান এর স্বতন্ত্র ফতোয়ার কিতাব রয়েছে। এই কিতাবের নাম "পাঞ্জাতন পাক কেহনে কা ছবুত" এই কিতাবে তিনি মজবুত দলীল দ্বারা পাকপাঞ্জাতন বলা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই বইয়ের মধ্যে আমার পক্ষ থেকে অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদীসের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোই এই মাসআলার ব্যাপারে যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আল্লাহ সকলকে পাক পাঞ্জাতনের সওয়াব ও বরকত হাসিলের তওফিক নসীব করুন। আমীন।

পাক পাঞ্জাতনের পবিত্র নামে ফাতেহা শরীফ ঃ

আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদীকে সৃষ্টি করে ময়ূররূপে সিদ্‌রাতুল ইয়াক্বিন নামে চার ডাল বিশিষ্ট একটি গাছে বসিয়ে রাখেন। উক্ত ময়ূর ৭০ হাজার বছর আল্লাহ পাকের তসবিহ জপতে থাকেন। একদিন সেই ময়ূরের সামনে আল্লাহ পাক হায়া-শরমের একটি আয়না রেখে দেন। উক্ত আয়নাতে নিজের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি অবলোকন করে ময়ূররূপী নুরে মুহাম্মদী আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে পাঁচটি সিজদা করে শোকরিয়া আদায় করেন। এ সময়ে ময়ূরের সারা শরীর ঘর্মে অর্থাৎ ঘামে ভিজে যায়। সেই ঘর্ম দ্বারাই সব সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত ময়ূররূপী নুরে মুহাম্মদীর মাথায় তাজ, কানে দুল ও গলায় একটি হার ছিল। মাথায় তাজ হলেন হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), গলার হার খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), আর কানের দুল হলেন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) । এরাই পাক পাঞ্জাতন এবং নুরে মুহাম্মদী ময়ূররূপী থাকা অবস্থায় যে পাঁচটি সেজদা করেছিলেন এ সিজদা থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তা মেরাজ রজনীতে আল্লাহ দান করেছিলেন। যে সাধনার সাফল্য লাভ করেছে, সে এদের হাতে বাইয়াত বা বিক্রি হতে পারলেই মানবতার আসল উৎকর্ষে হাত করা যাবে বলে এঁদের পর আর কোন নবীর দরকার থাকে নাই। যে কেউ এঁদের দ্বারস্থ হবেন তাকেই তাঁরা নিজ সন্তানের মতো পবিত্র করে নেবেন। তবে প্রশ্নঃ এঁরা কোথায় আছেন? আল্লাহর অপূর্ব রহমত এই যে, মানবীয় আত্মবিকাশের জন্য আল্লাহর দিকে ঐকান্তিকভাবে কেউ হেদায়েত কামনা করলেই নিশ্চয়ই আল্লাহ এঁদের কারো সাথে মোলাকাত করিয়ে দেবেন। যে মুসলমানের পাক পাঞ্জাতন ও আহলে বায়াতের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম নেই, তার কলেমার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই। রহস্যময় বাণীর সমষ্টি "কুরআন"। যার ভিত্তিমুলে গতিময়তা দানকারী শক্তিরূপে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ফাতেমা বতুল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এখানেই দ্বীন ইসলামের ঈমান। এই ঈমানের মুমিন মুসলমান। কুরআন আর আহলে বাইত একে অপরকে ছাড়বে না। এটা যাঁরা জেনেছেন এবং মেনেছেন তারা মুমিন, যারা বিশ্বাস করেছেন তারা মুসলমান। যারা জানতে চাননি তারা নির্বোধ আর যারা অবিশ্বাস ও বিরোধীতা করেছে তারা কাফির, মুশরিক।

ফাতেহা শরীফ ঃ

কোন কিছু শিরনী, হালুয়া, মিঠাই, মন্ডা বা সামান্যতম যা যোগাড় করা সম্ভব অত্যন্ত পাক সাফ পবিত্র অবস্থায় নিবেদন করা। দুই রাকাত নফল নামাজ পাঁচবার সূরা ইখলাস (ঐচ্ছিক) দিয়ে পড়ে পাক পাঞ্জাতনকে বখশে দেবেন। তারপরঃ

১) এস্তেগফারঃ১১বার।
২) ইসমে আযম শরীফঃ ১১বার
৩) ইসমে আযম শরীফঃ ইয়া শায়খ আবদুল কাদির জিলানী শাই আন লিল্লাহঃ১১বার।
৪) সুরা কাফেরুনঃ ৩বার
৫) সূরা এখলাসঃ ৩বার
৬) সুরা ফালাকঃ ৩বার
৭) সুরা নাসঃ ৩বার
৮) সূরা ফাতেহাঃ৩বার
৯) ইসমে আযম শরীফঃ১১বার
১০) দরূদ শরীফঃ১১বার

অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও অশ্রুসজল নয়নে মহান পরওয়ারদিগারে আলম জাল্লাজালালুহুর দরবারে আকদসে নিবেদন করা..... ভুল, ত্রুটি বেয়াদবি, অন্যমনষ্কতার জন্য কান্নাকাটি করে মাফ চাওয়া আর ভিখ মাঙগা যেন নিবেদন তোহ্‌ফা যা অত্যন্ত তুচ্ছ, না কাবেল এ নযর, না কাবেল-এ-কবুল এই অকিঞ্চিতকর জিনিসটুকু ও তেলাওয়াত ইত্যাদি যা পড়া হল তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহনের জন্য কান্নাকাটি করা। অতঃপর এই ক্ষুদ্রতম খেদমতটুকু কবুলিয়াতের জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকা। ইহার পাঠ হাযীরীকরণ বিতরণ, তবরুক গ্রহণের সওয়াব ইত্যাদি সরওয়ার এ কায়েনাত রসূল মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), শের-এ-খোদা, এমামায়নুল হুসাইন হযরত সৈয়্যদেনা হাসান মুজতবা, শহীদ-এ-আযম সৈয়্যদেনা হুসাইন, মা খাতুনে-এ-আতহার সৈয়্যদাতুন নেসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর আল আওলাদ, শাহেনশাহে বাগদাদ পীরান-এ-পীর দস্তগীর বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), খসুসান পাক পাঞ্জাতনের পবিত্র রূহ পাকে এর সওয়াব বখশিশ করে দেন, আমীন।

দশম অধ্যায়ের বাকি অংশ

কোরআনের আলোকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ফযায়েল

অষ্টদশ আয়াতে নিয়ামত ঃ

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নিয়ামত সমতুল্য অনুসরণীয় আদর্শ ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

অর্থাৎ- অতঃপর তোমাদের নিকট নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
(সুরা তাকাসুর, আয়াত-৮, পারা-৩০)

খাছায়েছে আলবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, এখানে نعيم থেকে আমরা আহলে বাইতই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আহলে বাইত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নেয়ামত স্বরূপ। কেননা আহলে বাইতের মূল হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড় নেয়ামত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আহলে বাইতই উম্মতে মুহাম্মদী তথা সৃষ্টির জন্য নেয়ামত। ঐ নেয়ামতকে উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে কিনা অথবা এই নেয়ামতের মানহানি করেছে কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
(টীকা- আননছচুলজলী, আহছানুল ইনতিখাব)

আহলে বাইতের মধ্যে যেহেতু সৈয়্যদা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অন্তর্ভূক্ত সেহেতু তাঁর সম্মান ও মর্যাদা উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যথাযথভাবে করেছেন কিনা (?) সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব, আমাদের উচিৎ সৈয়্যদা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যথাযথ অনুসরণ মান্যকরণ, তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও ভারবাসা বৃদ্ধি করণ। যাতে আল্লাহর কাছে সে সম্পর্কে সদুত্তর দিতে পারি।

উনবিংশ আয়াতে নিসবতঃ

ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বংশ বিস্তার ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

(সূরা ফোরকান, আয়াত-৫৪, পারা-১৯)

অর্থাৎ তিনি ঐ মাবুদ যিনি পানি হতে ইনসান সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এদের মধ্যে আত্মীয় ও শ্বাশুড় সাব্যস্থ করেন অর্থাৎ বংশবিস্তার করেন।
অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুহাম্মদ বিন সিরীন হাদীস বর্ণনা করেন যে, এখানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মধ্যে শ্বাশুড় ও জামাতার আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই বংশের একই পরিবারের মধ্যে কাউকে শ্বশুর আর কাউকে জামাতা বানিয়েছেন। আর তা হয়েছে হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে।
(টীকা- ফাযায়েলে আহলে বাইত ৬৬ -৬৭ পৃঃ, আহসানুল ইনতিখাব-১৩২ পৃঃ)
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর আত্মীয়তার বন্ধন কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তজ্জন্য আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর আত্মীয়তার কথা স্মরণ করেছেন।

বিংশ আয়াতে রেফাকতঃ
আহলে বাইত তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রশংসা ঃ
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا على سررمتقبلين

(সূরা আল হাজর, আয়াত নং ৪৭, পারা-১৪)
অর্থাৎ আমি তাদের অন্তর হতে হিংসা-বিদ্বেষ, দুশমনি ইত্যাদি খারাপ-মন্দ চরিত্রগুলি বের করে দিয়েছি।
এমতাবস্থায় তারা পরস্পরে মুহব্বত এবং বন্ধুত্বের আসনে আসীন হয়ে পূর্ণ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে আছেন।
অত্র আয়াতের তাফসীরে হযরত যায়েদ বিন আবী যায়েদ হতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন, এখানে আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইত রসূল (দঃ) এর প্রশংসা করেছেন।
(টীকা- আহছানুলা ইনতিখাব-১৩২ পৃঃ)
আহলে বাইতগণ পুতঃপবিত্র। তাঁরা মানবীয় দুশক্রুটি মুক্ত। যা আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে হয়ে থাকে।

একবিংশ আয়তে সেরাত ঃ
আহলে বাইত তথা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু হেদায়তের আলোকবর্তিকা ঃ
আল্লাহু তায়ালা এরশাদ করেন,

إهد نا الصراط المستقيم

(সূরা ফাতেহা, আয়াত ৫, পারা-১)
অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক পথে চালাও।
এই আয়াতের তাফসীরে মুসলিম বিন হায়্যান হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ছিরাতুল মুস্তাক্বীম দ্বারা আহলে বাইতই উদ্দেশ্য। কেননা আহলে বাইতই হল ইসলামের সঠিক রূপরেখা। আর আহলে বাইতকে যারা মান্য করেন তারাই হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে সাব্যস্থা সুতরাং অত্র আয়াতে আহলে বাইতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই হল মুক্তির পথ। এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন যে, আমার আহলে বাইত হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) কিশতীর ন্যায়।
আরো বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন যে, আমি তোমাদেরকে ২টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যা আকড়িয়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তন্মধ্যে একটি হলো কিতাবুল্লাহ আর অপরটি হলো সুন্নতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
(টীকা-তাফসীরে সালবী, মুয়ালেমুত তানযীল)

দ্বাদবিংশ আয়াতে নূরঃ
ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী বংশ ঃ
আল্লাহু তায়ালা বলেন,

الله نور السموت والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الز جاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مبركة زيتو نه لا شرقية ولا غربيه يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار نور على نور

يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله لامثال للناس والله بكل شئ عليم-

(সূরা নূর, আয়াত ৩৫, পারা-১৮)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ আসমান ও জমীনকে হক এবং হেদায়তের আলো দানকারী অথবা আসমানকে ফেরেশতাদের দ্বারা আর জমিনকে আম্বিয়া কেরাম বিশেষতঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইতে আতহার ও আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে আলোদানকারী। ঐ নূরের উপমা হলো একটি তাক। যেখানে একটি চেরাগ আছে। ঐ চেরাগটি একটি কাঁচের ফানুসের মধ্যে আছে। তখন ঐ ফানুসকে একটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দেখা যায়। ঐ ফানুসটি প্রজ্জলিত হয় বরকত ওয়ালা বৃক্ষের زيت তৈল দ্বারা। ঐ বৃক্ষটি পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। অর্থাৎ তার পাতা ঝরে না গরমী ও শীত মৌসুমের কারণে। তার মধ্যে কোন ক্ষতি পৌছে না বরং স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল থাকে। ইহার অবস্থা এই যে, তার তৈল এমন পরিস্কার এবং পাতলা যে, আগুনে স্পর্শ ব্যতীত নিজে নিজে প্রজ্জলিত হওয়ার উপক্রম হয়। আলোর উপরে আলো। এই আলোর দিকে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান হেদায়াত করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আকৃতির বর্ণনা করেন। এখানে نورعلى نور এর তাফসীরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরানী বংশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব ইহা দ্বারা আহলে বাইতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে একটি নূরানী বংশ তা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই মর্মে ইমাম গাজ্জালী, ইমাম বাকের ও ইমাম হাসন বসরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

(টীকা- আহসানুল ইনতিখাব)

ত্রিশতম অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি সালামী

বিনতে নবী ওয়া মাদরে হাসনাইন, আস্-সালাম

১। দুনিয়াকী শরহ, দ্বী কী এবারত হেঁ ফাতেমা
দ্ববাছায়ে মাঁআনেও সুরত হে ফাতেমা।

২। রঙ্গে বাহারে বাগে রেসালত হেঁ ফাতেমা
সর সশমায়ে রিয়াজে বেলায়ত হেঁ ফাতেমা।

৩। উমিদে গাহে হাশ্‌রো কিয়ামত হেঁ ফাতেমা
দুনিয়ামে ওজেহ্ আঁয়ায়ে রহমত হেঁ ফাতেমা।

৪। রূহে রওয়ানে পাঞ্জাতন ওয়া জানে মুস্তফা
আলে আবাহ কী দুসরী আয়াত হেঁ ফাতেমা।

৫। খাইরুন নেছা বতুল খেতাবে আয়ায়ী শরফ
যহরা লক্বব রসূল কী ইত্‌রত হেঁ ফাতেমা।

৬। হাসেল কসেহে উনকে সেওয়া নিসবতে রসূল
নক্বদে মতায়ে আহাদে নবুয়ত হেঁ ফাতেমা।

৭। মাআছুমীয়ত পেজীন কী হেঁ রূহানীও কো নাজ
ওয়াল্লাহ্ ইয়সী ছাহেবে ইসমত হেঁ ফাতেমা।

৮। আলে নবী কী আয্‌মত কায়েম উনহীসে হেঁ
সাআদত কী যমানা মে ইয্‌যত হেঁ ফাতেমা।

৯। দ্বীন কিস্‌ লিয়ে উনপর নেসার হোঁ
ঈমান কী আসল দ্বীন কি হুজ্জত হেঁ ফাতেমা।

১০। রাহে খোদাকী আউর মনাযেল কা জিকির কিয়া
যব ওয়াকেফে রূমুজে হাকীকত হেঁ ফাতেমা।

১১। দুনিয়াকী ওয়াসেতে হে সবক সিরতে বতুল
সরমায়া দারে সবরো ক্বণায়াত হেঁ ফাতেমা

১২। তাজে হে রূহ নামছে উনকী খোদা গাঁওয়া
আফকর বাহারে গুলশানে ফিত্‌রত হেঁ ফাতেমা

১৩। আয় আবরূয়ে গুলশানে কাউনাইন আস্‌-সালাম
বিন্‌তে নবীওঁ মাদরে হাসনাইন আস্‌-সালাম।

মেরী মওলা! জনাবেঃ ফাতেমা কা ওয়াসেতা তুজকো
মেরী উম্মী দকাদামন গুলে মক্বসুদসে বরদে।

গ্রন্থ অধ্যায়

তথ্য সূত্রঃ গ্রন্থাবলী

তাফসীরে দূরূরে মনসুর কৃত ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ূতী
তাফসীরে কবীর কৃত- ফখরুদ্দীন রাজী
তাফসীরে হোসাইনী- ২য়- কৃত- মোল্লা হোসাইন কাশেফী
তাফসীরে কাশশাফ ৪র্থ-কৃত- আল্লামা যমখশরী
খাযায়েনুন ঈরফান ২য়- কৃত- আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী
তাফসীর ইবনে আরবী-কৃত-মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী
তাফসীরে খাযেন-কৃত- ইমাম খাযেন
তাফসীরে রুহুল বয়ান- ৬ষ্ঠ- কৃত ইসমাঈল হক্কী
তাফসীরে মুদারেক- কৃত- ইমাম মুদারেক
তাফসীরে নসফী-কৃত আবুল বরকাত নসফী
তাফসীরে সানবী কৃত- ইমাম সালুভী
তাফসীরে মুযহেরী-কৃত সানাউল্লাহ পানিপথী
তাফসীরে মাআরেফে কোরআন-কৃত-মুফতি শফি দেওবন্দী
তাফসীরাতে আহমদিয়া-কৃত- শেখ আহমদ মোল্লা জীবন
তাফসীরে দূরূরে মনসুর কৃত ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ূতী
বুখারী শরীফ-কৃত- মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী
মুসলিম শরীফ কৃত মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুসাইরী
তিলমিযী শরীফ কৃত- আবু ঈসা তিরমিজী
মসনদে আহমদ ১ম খন্ড- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
সহীহে ইবনে হাব্বান-কৃত-ইমাম ইবনে হাব্বান
রওজাতুশ শোহাদা কৃত মোল্লা হোসাইন কাশেফী
আলে রসূল কৃত পীর সৈয়্যদ খিজির হোসাইন চিশ্‌তী
আর রওজুল ফায়েক কৃত শেখ সুয়াইব খরীফিশী মৃত্যু-৮১০ হিঃ
নাজাহাতুল মাজালেস কৃত আব্দুর রহমান সফুরী
এস্‌কাবুর রাগেবীন
মুসতাদারাক হাকেম ১ম, ২য়
আস্‌সাওয়ায়েকুল মুহরেকা-কৃত-ইবনে হাজর হায়তমী
যখায়েরুল উক্‌বা কৃত ইমাম তবরী
মসনদে ফাতেমা-কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী
আশ-শরফুল মুয়াইয়েদ-কৃত- আল্লামা ইউসুফ বিন ঈসমাঈল নিবহানী
মজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রসূল-কৃত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রঃ)
খুতবায়ে মুহররম-কৃত-মুফতি জালাল উদ্দীন আমজদী-ভারত
ইস্তিয়াব হাশিয়ায়ে বুখারী
মাদারেজুন নবুয়ত কৃত- আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
সফিনায়ে নূহ- কৃত-মুফতি শফি উকাড়বী
দলায়েলুন নবুয়ত কৃত- বায়হাকী
আবু নূয়াইম ১ম খন্ড-কৃত-আবু নূয়াইম ইস্পহানী
ফুসুলুল মুহিম্মাহ্‌- কৃত-
জামেউল মুজেজাত- কৃত- ৬ষ্ঠ খন্ড
সীরাতুস্‌ সাহাবীয়াত
তারিখে কারবালা- কৃত- আমিন আলকাদেরী
কানজুল উম্মাল
কিমিয়ায়ে সাআদত-কৃত- আল্লামা গাযযালী
শেফা শরীফ-কৃত কাজী আয়াজ

বায়হাকী কৃত- আবু বকর
খাছায়েছে কোবরা-কৃত- ইমাম সুয়ুতী
সিরাতে ফাতেমা- কৃত- আলম ফখরী
আর রেয়াজন নজরা ২য়- কৃত- ইমাম তবরী
রওজুল আফকার
হাকে কারবালা-কৃত-ইফতেখার হোসাইন
দারে কুতনী-কৃত- ইমাম দারে কুতনী
বয্যার-কৃত- ইমাম বয্যার
ফয়জুল কদীর-কৃত- ইমাম মনাভী
বাছায়েরে যাবিত তামিজ-কৃত- মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী
রুহুল মা'নী ২য় খন্ড- কৃত আল্লামা মাহমুদ আলূসী
মুসান্নেফে আবি শাইবা-কৃত-আবু শাইদ
তবরাণী-কৃত- ইমাত তবরানী
যুরকানী-কৃত আব্দুল বাকী যুরকানী
কাউসারুল খায়রাত-কৃত আশরফ সিয়ালভী
মাওয়াহেবে লদুনিয়া-কৃত- আল্লামা কস্তুলানী
আশিয়াতুল লুমাত-কৃত-ইমাম আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
শহীদ ইবনে শহীদ কৃত-মাওলানা সায়েম চিশতী
মজমাউয জাওয়ায়েদ কৃত-হাফেজ নুরুদ্দীন আলী আলহায়সমী ৯ম খন্ড
মিশকাত শরীফ-কৃত ইমাম শেখ ওয়ালী উদ্দীন
নূরুল আবছার-কৃত- আল্লামা শবেলঞ্জী
রওয়ায়েহুল মোস্তফা-কৃত- সদরুদ্দীন আহমদ আল বরদুমানী
বায়হাকী-২য়- কৃত- আবু বকর বায়হাকী
ফয়জুল কদীর ৫ম খন্ড- কৃত- আল্লামা মনাভী
শোয়াবুল ঈমান- কৃত- আবু বকর বায়হাকী
আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ১ম খন্ড- কৃত- ইবনে কাসীর
শরহে নহজুল বালাগাত-কৃত ইবনে আবিল হাদিদ
ওফাউল ওফা-কৃত-ইমাম সামাহুদী
জযবুল কুলুব-কৃত- শেখ মুহাক্কেক দেহলভী
নাফহাতুল কোরবে ওয়াল এত্তেসাল-কৃত আল্লামা হুমবী
রেসালাতুন ফি তাহকীকিন রাবেতা-কৃত- মাঃ খালেদ বাগদাদী
মাআরেজুন নবুয়ত ৩য় খন্ড-কৃত মোল্লা মুঈন কাশেফী
ফতোয়ায়ে তাতরহানীয়া-কৃত আসেম বিন আলা আল আনসারী আদদেহলভী
ফযায়েলে শুকর ওয়াস সিয়াম-কৃত- মাওলানা রমজান আলী হানফী, ভারত
রহমত কাদরয়া-কৃত বযমে কাদেরীয়া তাহেরীয়া
আল আমন ওয়াল উলা-কৃত- আলা হযরত
বরকাতে আনোয়ার
ফতওয়ায়ে রেজভীয়া ৭ম খন্ড- কৃত আলা হযরত
সচ্ছেহী হেকায়াত-কৃত আবুননূর বশীর
হজ্জতে তাহেরী
তবকাতে ইবনে সাদ-কৃত ইবনে সাদ
হিলিয়াতুল আউলিয়া-কৃত আবু নঈম ইস্পাহানী
আলামুন নেসা- কৃত ওমর রেযা কাহহালা
সুনানে কোবরা ৪র্থ খন্ড-কৃত- বায়হাকী
আহছানুল ইনতিখাব
আননচ্ছুল জলী
ফাযায়েলে আহলে বাইত
মসুয়ালোমুত তানযীল
জুলফ ওয়া জনিযর-কৃত- আল্লামা এরশাদুল কাদেরী, আমলে রেযা
শময়ে শবেস্তানে রেযা

লেখক সমাচার

অবতারণা : মদিনাতুল আউলিয়া তথা আউলিয়ার শহর চট্টগ্রাম। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের লীলাভূমি চট্টগ্রাম। এ চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিক, মুনাযেরে আহলে সুন্নত, ফক্বীহে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ মান্দাজিল্লুহুল আলী।

শুভ জন্মক্ষণ : তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বাহুলী গ্রামে চিকন কাজী পাড়ায় ১৯৫৮ সালে ৮ ফেব্রুয়ারী জুমাবার সুবহে সাদিকের সময় শুভাগমন করেন। তিনি মাযহাবে হানাফী, আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের অনুসারী।

বংশধারা : হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর দিল্লীর এক দরবেশ কামাল উদ্দীন (শেকন বা চিকন কাজী) হযরত শাহচাঁদ আউলিয়া (রাঃ) এর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পটিয়ার বাহুলী গ্রামে বসবাস শুরু করলে বংশ পরম্পরায় কাজী মুহাম্মদ আব্দুল লতিফের তিনি দ্বিতীয় সন্তান এবং গাউসুল আযম শাহ সৈয়াদ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রাঃ) এর পূর্ব পুরুষ সৈয়াদ হামিদ উদ্দীন গৌড়ী (রাঃ) এর বংশ পরম্পরায় চন্দনাইশ কাঞ্চন নগর নিবাসী আল্লামা সৈয়াদ মুহাম্মদ শাহ অলি উল্লাহ (রাঃ) এর জ্যেষ্ঠপুত্র আল্লামা সৈয়াদ মুহাম্মদ আবদুল করিম (রাঃ) এর কন্যা আলহাজ্ব রফিয়া খাতুন তাঁর মহিয়সী আম্মা।

শিক্ষার্জন : তিনি বাল্য বয়সে তৎকালীন চট্টলার ঐতিহ্যবাহী শাহচাঁন্দ আউলিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৭৫ সালে দাখিল (১ম বিভাগে ১৯তম স্ট্যান্ড), ১৯৭৭ সালে আলিম (১ম বিভাগে ১৫তম স্ট্যান্ড) ও ১৯৭৯ সালে ফাযিলে (১ম বিভাগে কৃতিত্বপূর্ণ) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে এশিয়ার বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া হতে ১৯৮১ সালে কামিল হাদিস, ১৯৮৩ সালে ফিক্বহ, ২০০০ সালে তাফসীর (প্রাইভেট) পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ : ১৯৮২ সালে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় প্রভাষক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পেয়ে এবং জামেয়ায় ফিক্বহ বিভাগ মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হলে ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ কৃতিত্বের সাথে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

খতিবের দায়িত্ব পালন : তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার অন্তর্গত বার আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ মোহছেন আউলিয়া (রঃ) এর নামে প্রতিষ্ঠিত 'মোহছেন আউলিয়া জামে মসজিদে' দীর্ঘদিন যাবৎ খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ত্বরীকতে দীক্ষা গ্রহণ : তিনি ১৯৭৬ সালে সিলসিলায়ে ক্বাদেরীয়া আলীয়া সিরিকোটিয়ার প্রাণপুরুষ গাউছে যমান, মুর্শেদে বরহক্ব, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকৃত হুজুর কেবলা হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়াদ মুহাম্মদ তৈয়াব শাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর হাতে বায়াত গ্রহন করেন।

হাদিসে বিশেষ সনদলাভ : প্রাতিষ্ঠানিক সনদের পাশাপাশি হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ১৯৯৮ সালে মদিনা শরীফে রওজার পাশে আল্লামা শায়খ যাকারিয়া আল মুরগীনানী আল মাদানী, ১৯৯৯ সালে মদীনা শরীফে রওজাপাকের সামনে আল্লামা সৈয়াদ ইব্রাহীম আল-খলিফা আল-হোসাইনি ও ২০০১ সালে মক্কা শরীফে মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ সৈয়াদ মুহাম্মদ বিন আলভী মালেকী (দামাত বারকাতুহুমুল আলীয়া) 'বিশেষ সনদ' প্রদান করেন।

ফতোয়াদানে পারদর্শীতা : তিনি ১৯৮৩ সালে ফিক্বহ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের পর দ্বীন-মাযহাব, আকায়েদ, শরীয়ত-তরীকৃত বিষয়ক অসংখ্য ফতোয়া ফরায়েজ প্রদানসহ আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া শরীয়া বোর্ডের স্থায়ী সদস্য এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার 'দারুল ইফতা' হতে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

পবিত্র হজ্জব্রত পালন : তিনি পবিত্র হজ্বে বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্যে প্রথম বার ১৯৯৮ সালে, দ্বিতীয় বার ১৯৯৯ সালে, তৃতীয় বার ২০০১ সালে ও চতুর্থ বার ২০০৩ সালে হজ্জব্রত পালন করেন।

যিয়ারত : তিনি পাকিস্তানের চৌহর শরীফে খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রাঃ), সিরিকোট শরীফে খাজা শায়খ সৈয়াদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রাঃ) ও খাজা শায়খ সৈয়াদ মুহাম্মদ তৈয়াব শাহ (রাঃ), লাহোরে হযরত দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী (রাঃ) ও আল্লামা ডঃ ইকবাল (রাঃ) এবং ভারতে আজমীর শরীফে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) এর ৬ বার যিয়ারতের মাধ্যমে বিশেষ ফয়েজ লাভে ধন্য হন।

সাহিত্যজগতে অবদান : তাঁর প্রকাশিতব্য কিতাবের মধ্যে গাউসুল বারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী, গাউসুল মুনয়িম ফী শরহে সহীহিল মুসলিম, হাদায়েকে গাউসিয়া (আরবী-উর্দু কবিতাবলী), আল-আতায়াল গাউসিয়া ফিল্ ফাতাওয়া ওয়াশ-শরীয়াহ, খুতাবুল গাউসিয়া (জুমা ও ঈদের খুতবা) প্রমুখ প্রনিধানযোগ্য, আর প্রকাশিত কিতাবের মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শানে গাউসুল আযম মাহবুবে সুবহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সৈয়াদা ফাতেমা বতুল বিনতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম (জীবনী গ্রন্থ) স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাংগঠনিক অবদান : তিনি দরূদ শরীফ প্রচার সংস্থা বাংলাদেশের উপদেষ্টা, আল-ইমাম আহমদ রযা ওয়াশ শায়খ তৈয়াব শাহ রিচার্স একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চট্টগ্রাম মেট্রোপল স্কলারশীপ পরীক্ষা কমিটির স্থায়ী সদস্য, গাউসিয়া হজ্ব গ্রুপ বাংলাদেশের মুয়াল্লেমুল হুজ্জাজ, গাউসিয়া একাডেমী এন্ড পাবলিশার্স'র প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

ইতিকথা : বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আল্লামা শায়খ মুফতী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ (মান্দাজিল্লুহুল আলি) একজন সুবক্তা, মুনাজের, সুলেখক, আরবী সাহিত্যিক ও মুফতিয়ে আহলে সুন্নত হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। ফতোয়া-ফরায়েয প্রদানে তাঁর সিদ্ধহস্ত বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন! আমিন। বেহুরমাতি গাউসুল আযম দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

Pdf
Created By
Mohammad
Albi Reza

WhatsApp: +8801839545196

FaceBook: www.fb.com/AlbiRezaBD